প্রায় প্রতি সপ্তাহের 'বেস্ট সেলার' প্রাপ্ত অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র

ফ্রান্সিস সমগ্র

অনিল ভৌমিক

চিচেন ইতজার রহস্য পাথরের ফুলদানি স্বর্ণখনির রহস্য হীরক সিন্দুকের সন্ধানে

ফ্রান্সিস সমগ্র (৬)

অনিল ভৌমিক

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা

চিচেন ইতজায় ফ্রান্সিস

চিচেন ইতজায় ফ্রান্সিস

একটা নিঃসঙ্গ জাহাজ চলেছে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে। জাহাজটা স্পেনীয় জলদস্যুদলের জাহাজ।

সূর্য অস্ত গেছে বেশ কিছুক্ষণ। এখন অন্ধকার রাত্রি। আকাশে উজ্জ্বল তারার ভিড়। অমাবস্যার কাছাকাছি। কাজেই অন্ধকার চারদিক।

জলদস্যুদের মধ্যে আলস্য। আলফান্‌সো এই জলদস্যুদের দলে ভিড়তে বাধ্য হয়েছে। আলফান্‌সো একটা পোর্তুগিজ জাহাজে চড়ে যাচ্ছিল দক্ষিণদিকের কোনও দেশের দিকে। ওর যাওয়াটা উদ্দেশ্যহীন। দেশে থাকতে ও ছিল খুবই গরিব চর্মকার। হাড়ভাঙা খাটুনি। কিন্তু রোজগারে সংসার চলে না। তাই আলফান্‌সো অনেক ভেবে ঠিক করল সুদূর দক্ষিণ দিকে এমন কিছু দেশ আছে যেখানে সোনা দিয়ে তৈরি সাঁকো আছে। সে দেশের সর্বত্র সোনার ছড়াছড়ি। লোকমুখে শোনা এই স্বর্ণসাম্রাজ্যের কাহিনী কতটা সত্য ও জানে না। কিন্তু এই সোনার হাতছানিতে ও দেশ ঘরবাড়ি ছেড়ে দক্ষিণমুখো যাচ্ছে এমন একটা জাহাজে উঠে বসল। যে করেই হোক সেই স্বর্ণসাম্রাজ্যে পৌঁছতে হবে।

আলফান্‌সো জাহাজের ডেকে শুয়ে ছিল। অন্ধকার নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে ও নিজের ভবিষ্যতের কথাই ভাবছিল।

হঠাৎ কানে এল মাস্তুলের ওপর বসে থাকা নজরদারের চিৎকার, "সাবধান জলদস্যুদের জাহাজ, সাবধান, সবাই তৈরি হও।"

জাহাজে সাড়া পড়ে গেল। সবাই ছুটল নীচের অস্ত্রঘরের দিকে। তরোয়াল হাতে ওরা দল বেঁধে ডেকে উঠে এল। জলদস্যুদের জাহাজটা তখনই আলফান্‌সোদের জাহাজের গায়ে এসে ধাক্কা দিল। খোলা তরোয়াল হাতে চিৎকার করতে করতে জলদস্যুরা আলফান্‌সোদের জাহাজের ডেকে উঠে আসতে লাগল। শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। জলদস্যুরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। ওদের মনে দয়ামায়ার স্থান নেই। নির্মম নৃশংস ওরা।

তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দ, আহতদের আর্তনাদ গোঙানির শব্দে জাহাজ ভরে উঠল।

আলফান্‌সোও তরোয়াল নিয়ে লড়াই করছিল এক জলদস্যুর সঙ্গে। হঠাৎ ওই জলদস্যু ওর তরোয়ালে নিজের তরোয়ালটার এত জোরে ঘা মারল যে আলফান্‌সোর তরোয়ালটা হাত থেকে ছিটকে গেল। অন্ধকারেও আলফান্‌সো দেখল জলদস্যুটা দাঁত বের করে হাসছে। নিরস্ত্র আলফান্‌সোর মাথা লক্ষ্য করে তরোয়ালটা চালাল জলদস্যুটা। আলফান্‌সো দ্রুত মাথা নিচু করল। তরোয়ালের

কোপ পড়ল বাঁ কাঁধে। আলফান্সো বাঁ কাঁধে ডান হাত চাপা দিয়ে বসে পড়ল। জলদস্যুটা অবশ্য ততক্ষণে আলফান্সোদের এক নাবিকের তরোয়ালের ঘায়ে ডেকে ছিটকে পড়েছে। আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না।

আলফান্সো আস্তে-আস্তে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে নিজেদের কেবিনঘরে ফিরে এল। ততক্ষণে লড়াই থেমে গেছে। দু'পক্ষেরই আহতদের আর্তনাদে গোঙানিতে চারদিক ভরে উঠেছে।

আলফান্সোদের জাহাজের যাত্রী নাবিকরা লড়াইয়ে হেরে গেল।

জলদস্যুরা আহত যাত্রীদের নাবিকদের রেলিঙের ওপর দিয়ে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। ওরা নিজেদের দলের মৃত লোকদেরও জলে ছুঁড়ে ফেলল।

পূবদিকের আকাশে কমলা রঙ ছড়াল। কিছুক্ষণ পরেই সূর্য উঠল। ভোরের নিস্তেজ রোদ ছড়ালো সমুদ্রের জলে জাহাজে।

এবার জলদস্যুদের দলপতি আলফান্সোদের জাহাজে উঠে এল। মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ। বেশ তেল চক্চকে। মোম দিয়ে গোঁফের ডগা ছুঁচলো করা। গায়ে দামি কাপড়ের জোব্বামতো। কোমরে চামড়ার মোটা বল্টের মতো একটা জিনিস। তাতে তরোয়াল ঝুলছে। তরোয়ালের বাঁট হাতির দাঁতের।

এসেই হুকুম দিল, "এই জাহাজে যারা বেঁচে আছে তাদের আমার কাছে নিয়ে এসো।" জলদস্যুরা খুঁজে খুঁজে জীবিত ও আহত মিলিয়ে প্রায় তিরিশজনকে দস্যুদলপতির সামনে নিয়ে এল। তার মধ্যে আলফান্সোও ছিল। জলদস্যুপতি বলল, "তোমাদের আর হত্যা করা হবে না। আহতদের চিকিৎসা করে সুস্থ করা হবে। আমার দলে এখন বড় লোকাভাব। তোমরা আমার দলে আসবে। আমার আদেশমতো চলবে। ডাকাতি করে লুঠপাট করে যা পাব তার ভাগ তোমরাও পাবে।"

এসময় আলফান্সোদের জাহাজের ক্যাপ্টেন এগিয়ে এল। বলল, "আমরা যদি তোমার দলে যোগ না দিই?"

"তাহলে সবাইকে মরতে হবে।" জলদস্যুসর্দার বলল।

"আমরা মরব তবু জলদস্যুতা করব না।" ক্যাপ্টেন বলল।

"দস্যুসর্দার হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, "মিছিমিছি কেন মরতে যাবে। তার চাইতে আমার দলে এলে সবকিছু পাবে আবার নগদ অর্থও পাবে।"

"না, আমরা তোমার দলে যাব না।" ক্যাপ্টেন বলল।

"তাহলে তো তোমাদের এখন মেরে ফেলতে হয়। খুব বাজে কাজ। আমি এসব নরহত্যা-টত্যা একেবারেই পছন্দ করি না। কিন্তু উপায় নেই। কখনও লোকের ঔদ্ধত্য দেখলে হত্যা করতেই হয়।" একটু থেমে দস্যুসর্দার বলল, "এবার তোমরা কে কে আমার দলে আসতে চাও হাত তুলে দাঁড়াও।" অনেকেই হাত তুলে জলদস্যুদের সর্দারের দিকে এগিয়ে গেল। তাদের মধ্যে আহত আলফান্সোও আছে। ও বেশ ভেবেই দস্যুদলে যোগ দিতে রাজি হল। বাড়ি

ফিরলে তো সেই অভাব, অনটন, উপবাস। তার চেয়ে জলদস্যুদের দলে যাওয়া অনেক ভাল। খেতে পরতে পাবে। লুটের মালের বিক্রির ভাগের অর্থ পাবে। বেশ সুখেই দিন কাটবে।

দেখা গেল আলফান্সোদের প্রায় অর্ধেক জাহাজি দস্যুদলে ঢুকল।

দস্যুসর্দার বলল, "সামনে যে বন্দর পড়বে সেখানে এই জাহাজের সব মালপত্র বিক্রি করা হবে। অবশ্যই জলের দামে। আমাদের খুব তাড়াতাড়ি অর্থের প্রয়োজন। তারপর অর্থ ভাগ বাঁটোয়ারা হবে। আমাদের সময় কম।"

এবার জলদস্যুসর্দার জলদস্যুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "যাও, এই জাহাজে যা পাও লুঠ করে আমাদের জাহাজে নিয়ে যাও।"

জলদস্যুরা আলফান্সোদের জাহাজে তল্লাশি শুরু করল। পেল প্রচুর ভেড়ার চামড়া, আয়না, আলকাতরা। সব মাথায় করে নিয়ে ওদের জলদস্যুদের জাহাজে নিয়ে গেল। যারা জলদস্যুদের দলে যাবে বলে হাত তুলেছিল তারা সবাই ওই জাহাজে চলে গেল। আলফান্সোও গেল। জলদস্যুদের জাহাজ আস্তে আস্তে সরে গেল। তারপর সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে চলল দক্ষিণমুখো।

লুঠ হয়ে যাওয়া জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজ চালককে উত্তর দিকে জাহাজ চালাতে বলল।

জলদস্যুদের জাহাজে আলফান্সোর নতুন জীবন শুরু হল। জলদস্যুদের খুব নিয়ম মেনে চলতে হয়। এদিক ওদিক হলে চাবুক মারা হয়। কখনও বা একেবারে মেরে ফেলা হয়। তাই সবাই সর্দারের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। দিন আট দশের মধ্যেই আলফান্সো সুস্থ হল। ওর চিকিৎসা করল জলদস্যুদলের বৈদ্য। কয়েকদিন পরে আলফান্সোদের জাহাজ থেকে দেখা গেল একটা জাহাজ আসছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যাত্রিবাহী জাহাজ। জাহাজের মাথায় উড়ছে ফরাসি দেশের পতাকা। আলফান্সোদের জাহাজ ছুটল ওই জাহাজের দিকে। ততক্ষণে আলফান্সোদের জাহাজের মাথা থেকে নরওয়ে দেশের পতাকা নামিয়ে জলদস্যুদের মড়ার খুলি আর মানুষের হাড় আঁকা কালো পতাকা তুলে দেওয়া হল। যাত্রীবাহী জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে চিৎকার আর কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। নির্মম জলদস্যুদের হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে সব সোনাদানার, হীরে-জহরতের গয়নাগাঁটি ওদের দিয়ে দিতে হবে। না দিতে চাইলে তরোয়ালের ঘায়ে মরতে হবে।

তখন দুপুর। সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যাত্রীবাহী জাহাজটার চালক জাহাজের গতি বাড়িয়ে দিল। কিন্তু জলদস্যুদের জাহাজচালক অনেক অভিজ্ঞ ওস্তাদ। ও ওদের জাহাজটা বড় করে একটা পাক খাইয়ে যাত্রীবাহী জাহাজটার সামনে চলে এল। জাহাজটা নিয়ে এল যাত্রিবাহী জাহাজটার গায়ে। দলে দলে জলদস্যুরা খোলা তরোয়াল হাতে উঠে পড়তে লাগল যাত্রিবাহী জাহাজটাতে। শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। যাত্রীবাহী জাহাজের প্রহরীরা যা লড়তে লাগল। যাত্রীরা তত দক্ষ নয় তরোয়াল চালনায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রিবাহী জাহাজের যাত্রীরা হার স্বীকার করল।

জলদস্যুরা আহত সঙ্গীদের নিজেদের জাহাজে নিয়ে গেল। উভয়পক্ষেরই যারা লড়াইতে মারা গেল তাদের সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হল।

এবার জীবিত যাত্রীদের ডেকে দাঁড় করানো হল। একপাশে মহিলা যাত্রীরা। অন্যদিকে পুরুষ যাত্রীরা।

সেই জাহাজে জলদস্যুসর্দার উঠে এল। হো হো করে কিছুক্ষণ হাসল। তারপর বলল, "এইসব লড়াইটড়াই বাঁচা-মরা আমার একেবারেই ভাল লাগে না।" আবার হাসল। বলল, "সবচেয়ে ভাল হয় তোমাদের কাছে মূল্যবান যা কিছু আছে আমাদের দিয়ে দাও। তাহলেই মরে যাওয়া বা ঘায়েল হয়ে যাওয়া কোনওটাই হয় না।"

"যদি আমরা সেসব না দিই?" একজন যাত্রী বলল। দস্যুসর্দার যাত্রীদের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল,—"কথাটা কে বলল, কে বলল?"

যাত্রীটি এগিয়ে এল। বলল—"আমি বলেছি।" দস্যুসর্দার হাসতে লাগল। হাসতে হাসতেই বলল,—"তোরা কে আছিস, এটাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেল।" দুজন জলদস্যু ছুটে এল। যাত্রীকে চেপে ডেকে শুইয়ে দিল। তারপর একজন দু'পা আর একজন দু'হাত ধরে দোলাতে লাগল। তারপর রেলিঙ ডিঙিয়ে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলল।

যাত্রীরা আর কেউ কোনও কথা বলল না। সর্দার হেসে বলল—"আমি এরকমই। আমার কথা অমান্য করলে হয় তরোয়ালের ঘায়ে মৃত্যু, নয়তো সমুদ্রশয্যা। যাক্‌গে, মহিলা যাত্রীদের বলছি আমার লোক তোমাদের কাছে একটা বড় রুমাল নিয়ে যাচ্ছে। সব গয়নাগাঁটি খুলে ওই রুমালে ফেলে দাও।"

মহিলাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করল না। দু'জন জলদস্যু মহিলা যাত্রীদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দু'জনে একটা বড় নকশা আঁকা রুমাল মহিলা যাত্রীদের সামনে নিয়ে এল। মহিলারা বুঝল এই জলদস্যুদের সর্দার ওদের যে কোন সময়ে মেরে ফেলতে পারে। তারা কেউ কোন কথা বলল না। হাত গলা কানের মূল্যবান অলঙ্কার খুলে রুমালে ফেলে দিতে লাগল। সর্দার জোরে হেসে উঠে বলল, "দ্যাখো কেমন নিঃশব্দে সবকিছু ঘটে যাচ্ছে। আমি ঠিক এটাই চাই।" দস্যুসর্দার নিজের জাহাজে চলে গেল।

জলদস্যুরা পুরুষ যাত্রীদের কাছ থেকে গিনি আংটি সব নিল।

এবার জলদস্যুরা হানা দিল কেবিনঘরগুলোতে। যে যা পেল নিল। মূল্যবান সবই সর্দারের কাছে জমা দিতে হবে। কিন্তু শৌখিন পোশাক টোশাক সর্দার নেয় না। এগুলো দস্যুদলের প্রাপ্য।

বিকেল নাগাদ জলদস্যুদের জাহাজ ওই তল্লাট ছেড়ে চলে গেল। জাহাজের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আলফান্‌সো সব দেখল। আলফান্‌সো তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। কাজেই সঙ্গীরা ওকে লড়াই করতে ডাকেনি।

আলফান্‌সো সম্পূর্ণ সুস্থ হল। শুধু বাঁ হাতের জোরটা আগের মতো রইল না। মৃত্যুর কালো দরজা থেকে ফিরে এসেছে আলফান্‌সো। এতেই খুশি ও।

তারপর কত জাহাজ লুঠ দেখল। শুধু দেখল না, সর্দারের হুকুমে তাতে অংশও নিতে হল। আত্মরক্ষার জন্যে নরহত্যাও করতে হল। লুঠের ভাগ পায়। খাদ্য পায়। কখনও কোন বন্দরে ওদের জাহাজ ভেড়ে। জাহাজের মাথায় সেই দেশেরই পতাকা ওড়ে। ওরা যে জলদস্যু, জাহাজটা যে জলদস্যুদের এটা অনেকেই বোঝে না। সাধারণ যাত্রীবাহী জাহাজ মনে করে। ওরা বন্দর শহরে নামে। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে পেটভরে খায়, পোশাক কেনে, বন্দর শহরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মুক্ত জীবনের স্বাদ পায়। এভাবেই আলফান্সোর দিন কাটছিল।

এক গভীর রাতে সমুদ্রে ঝড় উঠল। প্রচণ্ড জোরে ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল আলফান্সোদের জাহাজের ওপর। রাতের আকাশ যেন ফালা ফালা হয়ে যেতে লাগল বিদ্যুৎ রেখায়। সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি।

আলফান্সোরা জাহাজের মাস্তুলের পালের দড়িদড়া টেনে ধরে জাহাজটা ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে লাগল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। মাস্তুলটা প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে পড়ল। জাহাজটা মাঝামাঝি ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল। আলফান্সো বুঝল ভাঙা জাহাজে থাকলে জাহাজের নিচে চাপা পড়ে যাবে। তখনই বিদ্যুতের আলোয় একঝলক দেখল সমুদ্রতীরের গাছগাছালি। তাই ডুবন্ত জাহাজ থেকে ও উত্তাল সমুদ্রের বিরাট বিরাট ঢেউয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আবার বিদ্যুৎ চমকালো। সাঁতরাতে সাঁতরাতে দেখল তীরে বনজঙ্গল। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আলফান্সো সাঁতরাতে লাগল। ওই বিরাট বিরাট ঢেউয়ের মধ্যে সাঁতরানো অসম্ভব। ওরই মধ্যে আলফান্সো শরীর ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

ঝোড়ো হাওয়ার দাপট কমল। বৃষ্টিও কমল। আলফান্সো দেখল তীর খুব দূরে নয়। ও প্রাণপণে সাঁতার কেটে তীরের দিকে চলল। কিছুটা সাঁতরে যেতেই পায়ের নীচে বেলেমাটি ঠেকল। আলফান্সো আনন্দে মাটিতে পা রেখে লাফিয়ে উঠল। চলল তীরের মাটির দিকে। তীরে উঠে মুখ হাঁ করে হাঁপাতে হাঁপাতে আলফান্সো মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। আর হাঁটার শক্তি নেই। শুয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল। দেখল ঝড় থেমেছে। বৃষ্টি আর নেই। আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তারা জ্বলছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

পুব আকাশে লালচে রং ফুটে উঠল। সূর্য উঠল। ভোরের রোদে চারদিক দেখা যাচ্ছে। আলফান্সো মাথা ঘুরিয়ে দেখল; ওর মাথার কাছে একজন জলদস্যু উবু হয়ে পড়ে আছে। আলফান্সো বেশ কষ্টে উঠে এগিয়ে গেল। দস্যুবন্ধুকে ধরে তুলল। বন্ধুটি আলফান্সোকে চোখ খুলে দেখল। তারপর হাসল। উঠে বসল।

আলফান্সো বলল, "এখানে শুয়ে থেকে কী হবে?'চলো খাবার-টাবার পাওয়া যায় কিনা দেখি।" বন্ধুটি উঠে দাঁড়াল। চলল ঢালু তীরের মাটির দিকে। আলফান্সো চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। অন্য কোনও জলদস্যুকে দেখতে পেল না। ওখানে উঠে দেখল জঙ্গল সামনে। জনবসতি দেখল না। হয়তো জঙ্গল পার হতে পারলে লোকালয় পাওয়া যাবে।

দু'জনে জঙ্গলে ঢুকল। খুব ঘন বন নয়। ছাড়া ছাড়া গাছপালা। তারই মধ্যে দিয়ে দু'জন চলল। কিছুদূর যাওয়ার পরই বনজঙ্গল শেষ। একটা জলা জায়গা। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা টিলা। হয়তো ওখানে মানুষের বসতি আছে। এই ভেবে আলফান্সো জলদস্যু বন্ধুকে বলল, "ওই টিলাটা লক্ষ্য করে চলো। দেখা যাক লোকজনের বসতি পাওয়া যায় কিনা।"

দু'জনে জলা জায়গাটায় নামল। জল তেমন বেশি নয়। নিচটা কেমন যেন পেছল পেছল। ওরা পা দিয়ে জল ঠেলে ঠেলে চলল।

হঠাৎ বন্ধুটি বলে উঠল, পায়ে কী যেন লেগেছে। আলফান্সো নিচু হয়ে দেখল দুটো আঙ্গুলের মতো মোটা জোঁক। বন্ধুটির পা কামড়ে ধরে আছে। রক্ত বেরোচ্ছে। আলফান্সো চিৎকার করে বলল, "পালাও।" দু'জনে ছুটে চলল জলাভূমিটা পার হতে। বন্ধুটি পারল না। প্রচুর রক্তক্ষরণের জন্যে বন্দুটির শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ও পিছল মাটিতে ছুটতে পারল না। পা পিছলে পড়ে গেল। আলফান্সো তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। ও বুঝতেও পারে নি যে বন্ধুটি পা পিছলে পড়ে গেছে।

জলাভূমির পরেই পাথুরে ডাঙা। আলফান্সো ডাঙায় উঠে নিশ্চিন্ত হল। ভয়ে ও তখন কাঁপছে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল বন্ধুটি জলায় পড়ে আছে। আলফান্সো তখন মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে হঠাৎ ওর বাঁ পায়ের গোড়ালিটা সুড়সুড় করে উঠল। আলফান্সো তাকিয়ে দেখল একটা একবিঘত লম্বা জোঁক গোড়ালিতে কামড় বসাবার চেষ্টা করছে। আলফান্সো এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। বারকয়েক পা ছুঁড়ে জোঁকটাকে ফেলবার চেষ্টা করল। জোঁক লেগে রইল। তখনও কামড় বসাতে পারেনি। আলফান্সো একটা পাথরের বড় টুকরো তুলে নিল মাটি থেকে। তারপর জোঁকটার মাথায় পাথরটা ঠুকতে লাগল। কয়েকবার ঠোকার পরও জোঁকটা খসে পড়ল না। আলফান্সো আবার ঠুকতে লাগল। ওর গোড়ালির ওই জায়গাটা ছেঁচে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। গোড়ালি ব্যথায় টনটন করতে লাগল। একটা জোরে ঘা মারতে জোঁকটা খসে পড়ল। আলফান্সো সঙ্গে সঙ্গে এই জায়গা ছেড়ে দ্রুত ছুটল। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়।

আলফান্সো মাটিতে শুয়ে পড়ল। চোখ বুঁজে বিশ্রাম করল কিছুক্ষণ।

তখন বেলা হয়েছে। আলফান্সো উঠে দাঁড়াল। খাদ্য চাই, আশ্রয় চাই। ও টিলাটার দিকে চলল। টিলাটার কাছাকাছি পৌঁছে দেখল টিলাটার নিচে একটা বাড়ি। বাড়িটার থামগুলো কাঠের তৈরি। দেওয়ালগুলো চুনাপাথরের, চাল খড়ের। বাড়ির দেওয়ালে নানারকমের কারুকাজ—গাছ, ফুল, লতাপাতা আঁকা। বাড়ির লোকেরা আলফান্সোকে কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগল। একজনকে বাড়ির মালিক বলে আলফান্সোর মনে হল। মালিক আলফান্সোর দিকে এগিয়ে এল। তলতেক ভাষায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? এখানে কী করে এলে?" আলফান্সো সেই কথা কিছুই বুঝল না। ও স্পেনীয় ভাষায় বলল—"এই জায়গাটার নাম কী?" লোকটিও কিছুই বুঝল না। আলফান্সো আকার ইঙ্গিতে

বোঝাল জায়গাটার নাম কি? লোকটা আন্দাজে বুঝল। বলল, "তুলাম।" চারপাশের আরও কয়েকটা বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে এল। আলফান্‌সোকে প্রায় ঘিরে ধরল। আলফান্‌সো ভাবল বলে জাহাজডুবি হয়ে ও এখানে এসেছে। সঙ্গের বন্ধু জোঁকের কামড়ে মারা গেছে। আমার পোশাক এখনও ভিজে। খিদেও পেয়েছে। আলফান্‌সো হাত পা নেড়ে মুখের চোখের ভঙ্গি করে এসব বোঝাতে চাইল। দেখল কিছু লোক মোটামুটি বুঝেছে। ওরা কয়েকজন ছুটে নিজেদের বাড়িতে গেল। একটু পরেই ওরা গতরাতের বাড়তি খাবার নিয়ে এল চিনেমাটির পাত্রে। একজন একটা জলের পাত্রে ভরা জল নিয়ে এল। দু'জন ঝোলা জোব্বা নিয়ে এল। প্যান্টের মতো পোশাকও নিয়ে এল।

আলফান্‌সো এতক্ষণ পরে হাসল। লোকেরাও হাসল। ও আগে পোশাক পাল্টাল। ভেজা পোশাকে এতক্ষণ থাকতে হয়েছে। জলেভেজা শরীরে কাঁপুনি ধরল। ভেজা পোশাক এতক্ষণ পরে ছাড়তে পেরে আলফান্‌সো যেন প্রাণ ফিরে পেল।

এবার খাওয়া। আলফান্‌সো খাবারের বড় পাত্রটা নিল। তারপর খিদের জ্বালায় না থেমে একনাগাড়ে খেতে লাগল। একটুক্ষণের মধ্যেই সব খাবার শেষ। ওকে ঘিরে থাকা লোকজন খুশি হল। আলফান্‌সো হাসল। ইঙ্গিতে বোঝাল ও একটু শুয়ে বিশ্রাম নিতে চায়। যার বাড়িতে আলফান্‌সো প্রথম গিয়েছিল সেই লোকটি এগিয়ে এল। হাতের ইঙ্গিতে বাড়িতে ঢুকতে বলল। আলফান্‌সো বাড়িটার ভেতরে একটা ঘরে ঢুকলো। ঘরটা বেশ বড়। একপাশে বিছানামতো পাতা। লোকটা ওই বিছানা দেখাল। আলফান্‌সো হেসে লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিছানাটায় শুয়ে পড়ল। বাইরে লোকজন যে যার নিজের নিজের বাড়িতে চলে গেল। আলফান্‌সো অল্পক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কয়েকদিন তুলামে থেকে আলফান্‌সো রওনা হলো চিচেন ইতজা নগরের দিকে। পথে এদেশের লোকদের খেতখামার দেখল। মেজ ম্যাওইর খেত, তুলোর খেতও আছে। পুরুষদের পোশাক জোব্বার মতো। কোমরে মোটা কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। মেয়েরা পরে নানা রঙিন সুতোয় কাজ করা পোশাক।

বেশ কয়েকদিন হেঁটে আলফান্‌সো চিচেন ইতজা নগরে এসে পৌঁছল।

এই ঘটনার প্রায় পনেরো বছর পরের কাহিনী।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে। বাতাস বেগবান। পালগুলো ফুলে উঠেছে। ঢেউ ভেঙে ফ্রান্সিসদের জাহাজ বেশ দ্রুতগতিতেই চলেছে। ভাইকিংরা শুয়ে, বসে, গল্প করে সময় কাটাচ্ছে।

সেদিন বিকেলের দিকে নজরদার পেড্রো মাস্তুলের মাথায় নিজের জায়গায় বসেছিল। হঠাৎ দেখল দক্ষিণদিক থেকে গভীর কালো মেঘ মাঝ আকাশের দিকে উঠে আসছে। পেড্রো চিৎকার করে বলল, "ভাইসব, ফ্রান্সিসকে ডাকো। প্রচণ্ড ঝড় আসছে।" ভাইকিংরা সব উঠে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকালো। সত্যিই আকাশ মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। তখনই পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকারে ঢেকে গেল সবকিছু। শাঙ্কো ছুটল ফ্রান্সিসকে ডাকতে।

ফ্রান্সিস ডেকে উঠে এল। আকাশের অবস্থা দেখেই বুঝল ঝড় আসছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, "ভাইসব, ঝড় আসছে। সবাই তৈরি হও।" ভাইকিংরা পাল গুটিয়ে ফেলল। পালের দড়ি টেনে ধরে সবাই তৈরি হল। পেড্রো মাস্তুলের মাথা থেকে নেমে এল। মাস্তুলের গায়ে জড়ানো দড়িদড়া ধরল কিছু ভাইকিং।

সমুদ্রের বুক অন্ধকার করে প্রচণ্ড হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসদের জাহাজের ওপর। শুরু হল মেঘের গর্জন। বিদ্যুতের তীব্র আঁকাবাঁকা আলো আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি।

ভাইকিংরা ঝোড়ো বাতাসে কাত হয়ে যাওয়া জাহাজ দড়ি ধরে টেনে সোজা করতে লাগল। বিরাট বিরাট ঢেউ ডেকের ওপর আছড়ে পড়তে লাগল।

ভাইকিংরা আধঘণ্টা ধরে ঝড়ের সঙ্গে লড়ে জাহাজ ডুবতে দিল না।

হাওয়ার তীব্রতা কমে গেল। আকাশ পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। তারা উঠল।

যেন জলে স্নান করে উঠেছে ভাইকিংরা। ডেকের এখানে ওখানে ওরা শুয়ে রইল। তখনও হাঁপাচ্ছে সবাই।

গায়ে জলে ভেজা পোশাক নিয়ে ফ্রান্সিস জাহাজ চালক ফ্লেজারের কাছে এল। বলল, "জাহাজ কোনদিকে চালাচ্ছ?"

"উত্তরমুখো চালাব ভেবেছিলাম কিন্তু ঝড়ের ধাক্কায় কোথায় ছিটকে এসেছে বুঝতে পারছি না।" ফ্লেজার বলল।

"তা হলে কি সমুদ্রে আমরা দিক হারালাম?" ফ্রান্সিস বলল।

"তাই তো মনে হচ্ছে। তাই ভাবছি হুইল আর ঘোরাবো না। জাহাজ যেদিকে যায় যাক।" ফ্লেজার বলল।

"অগত্যা। উপায় কী?" ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, "আমাদের জাহাজের দিক ভুল হয়নি তো?"

"হ্যাঁ, তাই হয়েছে।" ফ্রান্সিস বলল। ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। ফ্রান্সিস বলল, "ধৈর্য হারিও না। আমরা ঝড়ে জলে তো ডুবে মরিনি। বেঁচে আছি। নিশ্চয়ই কোথাও-না কোথাও গিয়ে জাহাজ তীরে ভিড়বে।"

জাহাজ চলল। পেড্রো মাস্তুলের মাথায় বসে চারদিকে নজর রাখতে লাগল। কিন্তু ডাঙার দেখা নেই। ভাইকিং বন্ধুদের মনে সেই আনন্দ উচ্ছ্বাস নেই। সকলেরই ভাবনা—এ আমরা কোথায় চলেছি? কোনওদিন কি কোনও সমুদ্রতীরে পৌঁছতে পারব? না কি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জাহাজেই মারা যাব? মারিয়া ফ্রান্সিসকে বলল, "সবাই কেমন মনমরা হয়ে গেছে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাব কী করে?"

"নিশ্চয়ই উদ্ধার পাব। মনকে শক্ত করো। হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই।" ফ্রান্সিস বলল।

"সবাই তো আর তোমার মতো নয়।" মারিয়া বলল।

সাতদিন কেটে গেল। ডাঙার দেখা নেই। ভাইকিংরা ভীষণ মুষড়ে পড়ল।

সেদিন খুব ভোরে নজরদার পেড্রো দূরে ডাঙামতো দেখল। কিন্তু পরক্ষণেই তা কুয়াশায় ঢেকে গেল। পেড্রো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কুয়াশা সরে যেতেই সকালের রোদে দেখল সমুদ্রতীরের বালিয়াড়ি, গাছপালা। পেড্রো গলা চড়িয়ে বলল, "ভাইসব, ডাঙা। ডাঙা দেখা যাচ্ছে।"

ভাইকিংরা ডেকে উঠে এল। রেলিং ধরে দাঁড়াল। দেখল সমুদ্রতীরে গাছগাছালি। সবাই ধ্বনি তুলল, ও-হো-হো। ফ্রান্সিস, মারিয়া, হ্যারিও ডেকে উঠে এল। সমুদ্রতীর দেখল। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?"

"তাই ভাবছি।" ফ্রান্সিস বলল।

"তা হলে আজ রাতেই নৌকোয় চড়ে তীরভূমিতে চলো। দেখা যাক লোকজনের দেখা পাই কি না। জিজ্ঞেস করে তা হলে জানা যাবে কোথায় এলাম।" হ্যারি বলল।

"বেশ চলো।" ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন রাতে ফ্রান্সিস, শাঙ্কো আর হ্যারি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল।

রাত গভীর হতে ওরা তৈরি হয়ে জাহাজের হালের কাছে এল। ফ্রান্সিস, হ্যারি কোনও অস্ত্র নেয়নি। শুধু শাঙ্কো নিয়েছে জামার তলায় রাখা ছোরাটা।

হালে বাঁধা দড়িদড়া ধরে তিনজন ওদের একটা ছোট নৌকোয় নেমে দাঁড়াল। তারপর ফ্রান্সিস নেমে আসতে ওরা নৌকোয় বসল। ফ্রান্সিস দড়িটা হাতে নিল। তারপর নৌকো খুলে দাঁড় বাইতে লাগল। নৌকো চলল তীরভূমির দিকে। চারদিক নিকষ কালো। কোথাও জ্যোৎস্নার চিহ্নমাত্র নেই। শুধু আকাশে জ্বলছে লক্ষ লক্ষ তারা। ওই তারাগুলির ক্ষীণ আলোয় যা কিছু দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের জল ছুঁয়ে হাওয়া বইছে। তাতেই যা একটু ঠান্ডা লাগছে। সমুদ্র শান্ত। নৌকো চলল।

নৌকো তীরের কাছাকাছি এল। অন্ধকারে ফ্রান্সিস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল তীরভূমির দিকে। ঢালে বালিয়াড়ি। কিন্তু যতটা সম্ভব দেখতে পাচ্ছে তাতে কোথাও কোনও বাড়িঘর দেখতে পেল না।

একটা ধাক্কা খেয়ে নৌকোটা তীরে লাগল।

তিনজনে নেমে এল। শাঙ্কো নৌকোটা তীরে অনেকটা তুলে রাখল যাতে জোয়ারে ভেসে না যায়।

বালিয়াড়ি পেরিয়ে তীরে উঠে দেখল একটা রাস্তা চলে গেছে। ফ্রান্সিস বলল, "হ্যারি, মনে হচ্ছে এখানে লোকজনের যাতায়াত আছে।"

"হ্যাঁ, সেটা বোঝা যাচ্ছে। মনে হয় ধারেকাছে জনবসতি আছে। চলো, দেখা যাক।" হ্যারি বলল।

অন্ধকারে আন্দাজেই ওরা চলল এই রাস্তা ধরে। সমুদ্রের জোরালো হাওয়ায় রাস্তার ধুলো উড়ছে। ওরা তার মধ্যে দিয়েই চলল।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর প্রথমেই একটা পাথরের বাড়ি দেখল। তারপরেই দেখল সারি সারি ঘরদোর। সবই অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "চলো, সামনের ওই বাড়িটায় যাই। একটা বড় বাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়ালো। কাঠের মোটা থাম চুনাপাথর আর চালে শুকনো ঘাস দিয়ে বাড়িটা তৈরি।

ফ্রান্সিস এগিয়ে গিয়ে দরজায় আঙুল দিয়ে ঠকঠক শব্দ করল। ভেতরে কোনও সাড়া নেই। আবার ফ্রান্সিস ঠকঠক করল। ভেতর থেকে কারও কথা শোনা গেল। কথাটা ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না। ওরা দাঁড়িয়ে রইল।

দরজা খোলার শব্দ হল। এক বৃদ্ধ মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিসদের দেখে বেশ অবাকই হলেন। এই বিদেশি পোশাকপরা লোকগুলো এখানে এল কী করে? বৃদ্ধ বলল, "তোমরা কী চাও?" ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না।

হ্যারি বুকে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "আমরা ভাইকিং।" বৃদ্ধটি শুধু ভাইকিং শব্দটা বুঝলেন। তখনই ঘরের ভেতর থেকে এক যুবক এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। ভাইকিং কথাটা সে শুনল। বুঝল এই নবাগতরা ভাইকিং। গায়ে তো বিদেশী পোশাক। তবু যুবকটির সন্দেহ গেল না। এত রাতে এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে কী জন্য? এরা নিশ্চয়ই মায়াপানদের পাঠানো গুপ্তচর। যুবকটি আর দাঁড়াল না। আস্তে-আস্তে রাস্তায় নামল। চলল পুবমুখো। একটু যেতেই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। এবার হ্যারি মাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বোঝাল জায়গার নাম কি? বৃদ্ধটি ইঙ্গিত বুঝলেন। বললেন, "তুলাম, তুলাম।" বুকে হাত দিয়ে বললেন, "য়ুকাতান, য়ুকাতান।" তার মানে এরা য়ুকাতান জাতি। বৃদ্ধটি এবার দু'হাত আড়াআড়ি রেখে বোঝালেন, যুদ্ধ, লড়াই। হ্যারি বুঝল সেটা। ফ্রান্সিসকে বলল, "ফ্রান্সিস এরা হচ্ছে য়ুকাতান জাতি। এদের লড়াই চলছে মায়াপান উপজাতিদের সঙ্গে।"

বৃদ্ধটি আর কোনও কথা না বলে ঘরে ঢুকে গেলেন। ফ্রান্সিস হঠাৎ বুঝতে পারল, সামনে বিপদ। যুবকটি আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেল ঠিকই। কিন্তু ওদের চোখের আড়ালে যুবকটি নিশ্চয়ই ছুটে গেছে য়ুকাতান যোদ্ধাদের খবর দিতে যে, আমরা মায়াপানদের গুপ্তচর। ফ্রান্সিস বলে উঠল, "হ্যারি, শাঙ্কো, জাহাজের দিকে ছোটো।"

তিনজনেই লাফিয়ে রাস্তায় নামল। তারপর সমুদ্রতীরের দিকে ছুটল।

তখন অন্ধকার কেটে গেছে। পূব আকাশ কুয়াশা ঢাকা। লাল রঙের আভা।

তিনজন ছুটছে তখন। হঠাৎ শুনল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। পেছনে তাকিয়ে দেখল—দুটো ঘোড়া ছুটিয়ে দু'জন যোদ্ধা আসছে। হাতে বর্শা। গায়ে মোটা কাপড়ের পোশাক। পোশাকে লাল-নীল রঙের সুতোর কাজ করা।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ছুটে লাভ নেই। উলটে আমাদের ওপর লোকেদের সন্দেহ বাড়বে। হয়তো বর্শা ছুঁড়ে আমাদের হত্যা করতে পারে।"

তিনজনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। অশ্বারোহী দু'জন সৈন্য ফ্রান্সিসদের কাছে এসে থামল। যোদ্ধা দু'জন নামল। বর্শা হাতে এগিয়ে এল। ওদের নিজেদের ভাষায় কী জিজ্ঞেস করল। ভাইকিং কথাটা শুনে ফ্রান্সিস বুঝল। ও মাথা ওঠানামা করলো। যোদ্ধা দু'জন আরও কিছু জিজ্ঞেস করল। ফ্রান্সিস তার কিছুই বুঝল না।

এবার একজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের পুবদিকে আঙুল তুলে দেখাল। ইঙ্গিতে বলল, ওইদিকে ওদের পেছন পেছন যেতে। ফ্রান্সিস কিছুই না বোঝার ভান করল। এক যোদ্ধা তার হাতের বর্শার ফলাটা দিয়ে ফ্রান্সিসকে খোঁচা দিল। ফ্রান্সিস বুঝল—বর্শার ফলাটা ওর পিঠ কেটে দিয়েছে। নিশ্চয়ই রক্ত বেরোচ্ছে। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস বেশি চটে গেলে হয়তো বর্শা বুকে ঢুকিয়ে দেবে। তার চাইতে ওরা যেভাবে চাইছে আমরা সেইভাবেই চলব।" যোদ্ধাদের ইঙ্গিতে ফ্রান্সিস পুবমুখো হাঁটতে শুরু করলো। ওর পেছনে পেছনে হ্যারি আর শাঙ্কোও চলল।

ওরা তিনজন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। তখন সকাল। দু'পাশের বাড়িঘর থেকে লোকজন কাজে বেরিয়ে পড়েছে। তারা অবাক হয়ে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। বাজারের কাছে ভিড় বাড়ল। যোদ্ধা দু'জন ঘোড়া থেকে নামল। এই ভিড়ের মধ্যে বন্দিরা পালিয়ে যেতে পারে। ঘোড়ার সামনের দিকে ফ্রান্সিসদের আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা ঘোড়াদুটোর সামনে এলো। যোদ্ধাদের একজন হাঁটতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা হাঁটতে লাগল। সামনে একজন যোদ্ধা লাগাম ধরে একটা ঘোড়াকে নিয়ে চলল। পেছনে আর একজন ঘোড়ার লাগাম ধরে চলল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সকলে একটা লম্বাটে ঘরের কাছে এল। সামনে বিরাট প্রান্তর। সবুজ ঘাসে ঢাকা। লম্বাটে ঘর দেখে ফ্রান্সিস বুঝল কয়েদঘর। আবার বন্দিদশা।

লম্বাটে ঘরটার কাছে এসে দাঁড়াল সবাই। ফ্রান্সিস দেখল, ঘরের দরজাটা লোহার। দরজায় বড় তালা ঝুলছে। দরজার বাইরে বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে দু'জন পাহারাদার। কোমরে তরোয়াল। তাদেরই একজনকে একজন যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে কী বলল। পাহারাদার তালা খুলল লম্বা চাবি দিয়ে।

ফ্রান্সিসদের প্রায় টেনে ঘরে ঢোকানো হল। যোদ্ধাদের একজন পাহারাদারদের কী বলল। তারপর ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল।

লম্বাটে ঘরটার একদিকে এই কয়েদঘর। ফ্রান্সিসদের ঢোকানো হল। ফ্রান্সিসরা দেখল চার-পাঁচজন বন্দি রয়েছে। কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ বসে আছে। দু'জন শুয়ে আছে। মেঝেটা পাথরের, তার ওপর শুকনো ঘাসপাতা ছড়ানো। এটাই বিছানা।

আগে যে বন্দিরা জেগে ছিল তারা বেশ অবাক চোখে ফ্রান্সিসদের দিকে চেয়ে রইল। ফ্রান্সিসরা বসে পড়ল।

শাঙ্কো শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, "ফ্রান্সিস, মাত্র দু'জন যোদ্ধা ছিল—লড়াইয়ে নামলেও ওরা হেরে যেত।"

" তা হয়তো যেত। কিন্তু তারপর? বাইরে তাকিয়ে দ্যাখো প্রান্তরের শেষে লম্বা ঘরগুলো। ওটা সৈন্যনিবাস। তাদের কাছে নিশ্চয়ই খবর পৌঁছত। আমরা সমুদ্রতীরে পৌঁছে জাহাজ চালাবার আগেই ওরা ঘোড়ায় চেপে সমুদ্রতীরে পৌঁছত। আমাদের জাহাজ দখল করত। এক অসম লড়াইয়ে আমাদের প্রাণ দিতে হত। তার চেয়ে এটাই ভাল হল। এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবই। কিন্তু তার জন্য সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হবে। হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। ফ্রান্সিসের ওপর শাঙ্কোর অগাধ বিশ্বাস। ফ্রান্সিস একটা উপায় বের করবেই।

দুপুরে কয়েদঘরের দরজা খোলা হল। দু-তিনজন সৈন্য ঢুকল। একজনের হাতে কাঠের বেশ বড় রেকাবি। অন্যজনের হাতে একটা বেশ বড় হাঁড়ি। আর একজনের হাতে গোল গোল পাতা। সে পাতাগুলো ফ্রান্সিসদের সামনে পেতে দিতে লাগল। পাতায় দেওয়া হল নানা সবজি, আলুর ঝোল। আর গোল গোল করে কাটা কাটা রুটি। সবাই খেতে লাগল। দু'জন প্রহরী দরজায় দাঁড়িয়ে রইল।

ফ্রান্সিসদের খাওয়া শেষ হল। সবাই ঘরের কোণায় রাখা মাটির জালা থেকে জল তুলে খেল।

ফ্রান্সিস শুকনো ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। হ্যারি, শাঙ্কো বসে রইল। ফ্রান্সিস চোখে আড়াআড়িভাবে হাত রেখে শুয়ে রইল। ও গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল, কীভাবে এই কয়েদঘর থেকে পালাবে। কিন্তু কোনও পরিকল্পনাই কাজে লাগবে বলে ওর মনে হল না। ও অন্য উপায় ভাবতে লাগল।

রাত কাটল। মুক্তির কোনও আশা দেখছে না ফ্রান্সিস। সকালের খাবার নিয়ে সৈন্যরা কয়েদঘরে ঢুকল। বন্দিদের খাওয়া চলছে, তখন গোঁফদাড়িওয়ালা একজন ঢুকল। সৈন্যরা, প্রহরীরা মাথা ঝুঁকিয়ে সেই লোকটিকে সম্মান জানাল। বোঝা গেল ওই লোকটি সেনাপতি।

সেনাপতি তলতেক ভাষায় কী সব বলে গেল, ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না। শুধু একটা কথা বুঝল, রাজা তুতজ! ওই দেশীয় বন্দিরা জলটল খেয়ে দরজার কাছে সারি দিয়ে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসরাও গিয়ে সারিতে দাঁড়াল। সেনাপতি দেখল কিন্তু কোনও কথা বলল না।

ঘর থেকে বন্দিরা বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসরাও ওদের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এল। সবাই সারি দিয়ে হেঁটে চলল একটা বেশ বড় পাথর বাঁধান বাড়ির দিকে। পেছনে সেনাপতি। সঙ্গে চার-পাঁচজন সৈন্য। সবাই সেই বাড়িটায় ঢুকল। ঘরটা অন্ধকার-অন্ধকার। ফ্রান্সিস কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। অন্ধকার ভাবটা অল্পক্ষণের মধ্যেই চোখে সয়ে গেল। ফ্রান্সিস দেখল একটা পাথরের সিংহাসনে রাজা তুতজ বসে আছে। সিংহাসনের গায়ে নানা জায়গায় মণিমাণিক্য গাঁথা। রাজার দু'পাশে দুটো কাঠের আসনে বসে আছে দুই বৃদ্ধ। বোঝা গেল মন্ত্রী ও অমাত্য।

রাজা তুতজ বয়স্ক লোক। ঢোলা হাতা জামা পরে আছে। পোশাকে সুতোর কারুকাজ। মাথায় কাপড়ের টুপিমতো। পাকানো গোঁফ।

সেনাপতি মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে তলতেক ভাষায় একনাগাড়ে কী বলে গেল। রাজা তুতজ ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। কিছু বলল। ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না। এবার আসনে বসা অমাত্যটি ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল, "তোমরা কে? এখানে এসেছ কেন?"

ফ্রান্সিস আশ্বস্ত হল, যাক, ভাঙা ভাঙা বললেও একজন স্পেনীয় ভাষা জানা লোক পাওয়া গেছে।

"আমরা জাতিতে ভাইকিং। বিভিন্ন দেশে, দ্বীপে আমরা ঘুরে বেড়াই আমাদের জাহাজ নিয়ে। গুপ্তধনের কথা শুনলে তা উদ্ধার করি। সেই গুপ্তধনের মালিককে তা দিয়ে দিই। একটা স্বর্ণমুদ্রাও আমরা নিই না।" হ্যারি বলল।

অমাত্য হ্যারির কথাগুলি রাজা তুতজকে বলল। রাজা আবার কী বলল। সেটা অমাত্য বলল—"দেশের পশ্চিমদিকে মায়পানদের রাজ্য—শত্রু—তোমরা গুপ্তচর।"

ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল, "এটা মিথ্যে। আমরা কারও গুপ্তচর নই।" রাজা তুতজের কথা এবার অমাত্য স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করে দিতে লাগল।

রাজা তুতজ বলল, 'বলছিলে তোমরা গুপ্তধন উদ্ধার করেছ। পারবে রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন ভাণ্ডার উদ্ধার করতে?"

ফ্রান্সিস বলল, "সেই গুপ্তধন কোথায় আছে বলুন। আমরা যা দেখতে চাই, যেখানে যেতে চাই তার অনুমতি দিন আমরা রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন উদ্ধার করব।"

"বৃথা চেষ্টা। পারবে না। অবশ্য মায়াপানদের দেশের চিচেন ইতজাতেও রাজা হুনাকমিনের ধনসম্পদ লুকানো আছে।" রাজা তুতজ বলল।

"এখানকার গুপ্তধনই আমরা খুঁজব। এখানে কোথায় আছে সেটা?" ফ্রান্সিস বলল।

"সঠিক কেউ বলতে পারবে না। তবে এখানকার মন্দিরে কোথাও আছে—এটাই আমাদের বিশ্বাস।" রাজা তুতজ বলল।

"ঠিক আছে। আমাদের মুক্তি দিন। আমরা গুপ্তধন খুঁজব।"

"বেশ, তোমাদের মুক্তি দেওয়া হল। সেনাপতি তোমাদের কাল সৈন্যাবাসে থাকতে দেবেন।" রাজা তুতজ বললেন।

এবার রাজা তুতজ হেসে উঠল। ফ্রান্সিস এবার লক্ষ্য করল রাজা তুতজের কুতকুতে চোখ। চোখের চাউনিটাও অত্যন্ত ক্ষুরধার। চোখমুখ দেখে বোঝা দায় লোকটা মনে মনে ঠিক কী চাইছে? রাজা তুতজ হাসি থামিয়ে বলল, "তোমরা ফিরে এসে বলো—গুপ্তধনের কোনও হদিস পেলে কি না।"

"নিশ্চয়ই বলব।" ফ্রান্সিস বলল।

"তবে মন্দিরের গর্ভগৃহটা বড় ছোট। একটু বড় হলে ভাল হত।"

ফ্রান্সিস কোনও কথা বলল না, রাজা তুতজ আবার হেসে উঠল।

ফ্রান্সিস বুঝল না রাজা তুতজ বারবার হেসে উঠছে কেন? লোকটার কি অন্য মতলব আছে?

ফ্রান্সিসরা সভাগৃহের বাইরে এল। একজন সৈন্য এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের ইশারায় পেছনে পেছনে হাঁটতে বলল। ফ্রান্সিসরা সৈন্যটার পেছনে পেছনে চলল। বিস্তৃত প্রান্তর পার হয়ে লম্বা ঘরগুলোর সামনে এল। সৈন্যটি একটা ঘরের দরজা খুলে ওদের ঢুকতে বলল। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। ঘরটার মেঝেয় ঘাসপাতা দড়ি দিয়ে বাঁধা বিছানা। তাতে সুতোর কাজ করা চাদর পাতা। সৈন্যটি ইঙ্গিতে বিছানাটা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। ফ্রান্সিসরা বিছানায় বসল। আরও দু'জন সৈন্যকে দেখল শুয়ে আছে। ফ্রান্সিসও শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে ভাবতে লাগল—ব্যাপারটা কি এত সহজ? মন্দিরের গর্ভগৃহে গুপ্তধন আছে এটা যদি সকলের জানাই থাকবে তা হলে এতদিনেও তা উদ্ধার করা হল না কেন? এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গোপনীয় কিছু আছে। যাক গে, কালকে গর্ভগৃহ দেখলেই বোঝা যাবে কোনও কিছু ওদের কাছে গোপন করা হয়েছে কি না। ওদিকে আর এক চিন্তা মারিয়া আর বন্ধুরা। ওরা বোধ হয় চিন্তায় পড়েছে—ফ্রান্সিসদের ফিরে আসতে দেরি হচ্ছে কেন?

পরদিন সকালের খাবার ওরা খেয়ে উঠেছে তখন। দু'জন সৈন্য বর্শা হাতে ওদের কাছে এল। তলতেক ভাষায় কী বলল। হ্যারি বারবার বলল, "মন্দির, মন্দির। সৈন্যটি মাথা ওঠানামা করল। তারপর ঘরের বাইরে আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস, হ্যারি আর শাঙ্কো ঘরের বাইরে এল।

দু'জন সৈন্য হাতে বর্শা নিয়ে প্রান্তরে নামল। ওদের একজনের হাতে একটা নেভানো মশাল।

ফ্রান্সিসরা ওদের পেছনে পেছনে চলল। ফ্রান্সিস তখনও ভেবে চলেছে এসবের পেছনে রাজা তুতজের কোনও অসৎ ইচ্ছা আছে কি না। ওদের বিপদে ফেলাই রাজা তুতজের ইচ্ছে কি না।

কিছু দূরে একটা টিলা দেখা গেল, তারই নীচে মন্দিরটা। তিনকোনা মন্দির। মন্দিরের সামনে থাক থাক সিঁড়ি উঠে গেছে। দু'পাশে পাথরের দেওয়াল। মন্দিরটা পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

সবাই সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। সৈন্য দু'জন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিসদের আসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। দু'পাশের চুনাপাথরের দেওয়ালে পাথর কুঁদে পাখি ফুল লতাপাতার নকশা। সব রঙিন। এই পিরামিড-মন্দিরে অতীতের মৃত রাজাদের সমাধি দেওয়া হয়। এখানে সেই মৃত রাজাদের পুজো হয়।

সৈন্য দু'জন এবার সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। একটু নামতেই অন্ধকারের মধ্যে ওরা এসে পড়ল। সৈন্যটা চকমকি ঠুকে মশাল জ্বালল। মশালের কাঁপা কাঁপা আলোয় সিঁড়ি দেখা যেতে লাগল।

সবাই নেমে চলল। বেশ কিছুক্ষণ পরে সিঁড়ি শেষ হল। সামনে পাথরের দরজা। খোলা। সকলে দরজা পার হল। আবার ছোট ছোট সিঁড়ি।। আরও নীচে নামল সবাই। একটা চৌকোনো ঘরে এসে সিঁড়িটা শেষ হল। ফ্রান্সিসরা অসহ্য গরমে ঘামতে লাগল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি জামা খুলে ফেলল। শাঙ্কো জামা খুলল না। জামা খুললে ছোরাটা লুকিয়ে রাখা যাবে না।

চৌকোনো ঘরটা দেখিয়ে সৈন্যদের একজন ইঙ্গিত করল ঘরটায় নামতে। ঘরটার মেঝেয় বাসি ফুলপাতা ছড়ানো। ফ্রান্সিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশটা দেখল। কোথাও কোনও ফাঁকফোকর নেই। মেঝেটা তেলতেলে। মশালের আলোয় পড়ে চকচক করছে। ফ্রান্সিস এর কোনও কারণ বুঝল না।

হ্যারি মেঝেয় নামেনি। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্রান্সিস হঠাৎ ওপরের দিকে তাকাল। মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছে পাথরের ছাদ। চোখ নামাতে গিয়ে দেখল মশাল হাতে সৈন্যটি হাসছে। ফ্রান্সিস ভাবল, সৈন্যটি হাসছে কেন?

তখনই ওই সৈন্যটি হাতের মশাল ঘরটার মেঝেয় ছুঁড়ে দিল। দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। ধোঁয়া উঠল। আগুন ছড়াতে লাগল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে চিৎকার করে বলল, "শাঙ্কো, উঠে পড়ো সিঁড়িতে।" সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই ধোঁয়া কেটে গিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। সৈন্য দু'জন এবার হ্যারিকে বর্শা দিয়ে খোঁচা দিয়ে ইঙ্গিত করল আগুন-জ্বলা মেঝেতে নামতে। ফ্রান্সিস এক ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই সৈন্যটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৈন্যটি বর্শা ছোড়ার অবকাশ পেল না। ফ্রান্সিস ওকে এক জোর ধাক্কা দিল। সৈন্যটি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে মেঝের আগুনে পড়ে গেল। আর্তনাদ করে উঠল। অন্য সৈন্যটি শাঙ্কোর দিকে বর্শা ছুঁড়ল। শাঙ্কো জামার তলা থেকে ছোরাটা বার করে সৈন্যটির বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। শূন্যে পাক খেয়ে ছোরাটা সৈন্যটির বুকে বিঁধে গেল। সৈন্যটি দু'হাতে ছোরাটা টেনে বার করল। ছোরাটা সিঁড়ির ওপর রেখে সৈন্যটি সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কো এক ছুটে গিয়ে ছোরাটা তুলে নিল।

ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল, "হ্যারি, শাঙ্কো, ওপরের দিকে চলো, জলদি।"

তিনজনে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। কিছুটা উঠেই দেখল সব অন্ধকার। মেঝেয় জ্বালা আগুনের আলো এতদূর এসে পৌঁছয়নি। অন্ধকারেই ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। অন্ধকারে হ্যারি কয়েকবার পা ফসকে সিঁড়ির ওপর পড়ে গেল। ফ্রান্সিস অন্ধকারেই হ্যারিকে তুলে দাঁড় করাল। তারপর আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

ওরা যখন মন্দিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তখন বিকেল। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে বলল, "হ্যারি, শাঙ্কো ওই জঙ্গলটার দিকে ছোটো।"

বেশ কিছু দূরে একটা জঙ্গল শুরু হয়েছে। তিনজনে সেদিকে ছুটল। কিছুটা গিয়ে ফ্রান্সিস বলল, "এখানে আমাদের থাকা চলবে না। একটা সৈন্যকে মেরেছি, আর একটাকে আহত করেছি। রাজা তুতজ আমাদের ধরতে পারলে

মেরে ফেলবে। কাজেই ওই বনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢুকে পড়তে হবে। তারপর দেখা যাক বনের শেষে কী আছে।''

তিনজনে ছুটছে। মুখ হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে। হ্যারির শরীর বরাবরই দুর্বল। ও বেশ পিছিয়ে পড়ছে। ফ্রান্সিস একটু পিছিয়ে পড়ে হ্যারিকে উৎসাহ দিচ্ছে। কখনও গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ছুটছে।

ওরা জঙ্গলটায় ঢুকে পড়ল। কয়েকটা গাছগাছালি পার হয়ে হ্যারি দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা গাছের কাণ্ডে ভর রেখে দাঁড়াল। ভীষণ হাঁফাতে লাগল। ফ্রান্সিস, শাঙ্কো হ্যারির কাছে এল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছুটা সবুজ ঘাসের জমির ওপর বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। হ্যারি আর শাঙ্কো সেখানে বসে পড়ল। তিনজনেই হাঁপাতে লাগল।

ফ্রান্সিস বলল, ''শাঙ্কো, বনের আড়াল থেকে দেখে এসো তো রাজা তুতজের সৈন্য আমাদের খোঁজে এদিকে আসছে কি না।'' শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। আস্তে-আস্তে বনের শেষ দুটো গাছের আড়ালে দাঁড়াল। দেখল দূরে লোকজন নিজেদের কাজ করছে। ছোট ছোট দোকানে কেনাকাটা করছে। ধারেকাছে কোথাও কোনও সৈন্য নেই।

শাঙ্কো ফিরে আসবে বলে পা বাড়িয়েছে তখনই দেখল চার-পাঁচজন সৈন্য বর্শা হাতে জঙ্গলের দিকে ছুটে আসছে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় বর্শার ধারালো মুখগুলো চকচক করছে।

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়াল। ছুটে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল, ''ফ্রান্সিস, চার-পাঁচজন সৈন্য ছুটে আসছে এই বনের দিকে।''

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। বলল, ''বনটা বোধহয় গভীর বন। গাছের গুঁড়ির জটলার মধ্যে দিয়ে ছুটতে হবে। কাজেই জোরে ছুটতে পারব না। কিন্তু এখানে থাকা নিরাপদ নয়। ছোটো।''

তিনজনে আবার ছুটতে লাগল। কিছুটা যেতেই গভীর বন শুরু হল। গাছের গুঁড়িতে শেকড়বাকড়ের মধ্যে দিয়ে ছোটা অসম্ভব। তবু যতটা দ্রুত সম্ভব ওরা চলল। অন্ধকার বনের তলে কোথাও কোথাও রোদের টুকরো দেখা যাচ্ছে। সারাদিন স্নান-খাওয়া নেই, তারপর অতটা ছুটে আসা। ওরা ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে হ্যারি আর চলতেই পারছিল না।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, ''আর যাব না এখন। আমরা এখন সৈন্যদের নাগালের বাইরে।''

ওরা ওখানেই বসে পড়ল। হাঁফাতে লাগল। ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল ওরা। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। এ-গাছের মাথা ও-গাছের মাথা দেখতে লাগল। প্রায় অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তার মধ্যেই ও দেখল, ডানদিককার গাছটার মাথায় বেশ কিছু হলুদ রঙের পাকা ফল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল। সেই গাছটার কাণ্ড বেয়ে বেয়ে গাছটায় উঠল। ডালপালার মধ্যে দিয়ে আস্তে-আস্তে গাছটার মাথায় উঠে গেল। ডালপালার মধ্যে দিয়ে বেশ কিছু পাকা ফল

ঝুলছে। শাঙ্কো কোমর থেকে ছোরাটা বার করল। তারপর ডালটার গোড়াটায় ছোরার কয়েকটা ঘা মারল। ডাল কেটে গেল। এদিকে ওদিকে আরও পাকা ফল। কী গাছ কী ফল কিছুই বুঝল না। ওখানে বসেই একটা পাকা ফলে কামড় বসাল। আশ্চর্য! কী মিষ্টি! কী স্বাদ! শাঙ্কো ফলটা খেতে খেতে অন্য ফলগুলো নিয়ে নেমে এল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ফল ছিঁড়ে নিয়ে খেতে লাগল। খুব সুস্বাদু ফল। শাঙ্কো বলল, "গাছে উঠছি। আরও কিছু ফল নিয়ে আসছি।" শাঙ্কো আবার গাছে উঠল। কয়েকটা ফলসহ গাছের ডাল কেটে নিয়ে নীচে নেমে এল। সবাই ফল খেতে লাগল। খিদেটা কিছুটা মিটল।

এবারে বন থেকে বেরোন। ফ্রান্সিস বলল, "চলো, আমরা উত্তরদিকে লক্ষ্য করে যেতে থাকি। দেখা যাক বনের বাইরে যেতে পারি কি না।"

আবার অন্ধকারে চলা শুরু হল। জল তেষ্টায় ওরা তখন কাহিল। কিছু দূর যেতেই একটা ডোবামতো পেল। অন্ধকারে বোঝাই গেল না—ওই ডোবার জল কেমন। তখন আর সেসব ভাববার সময় নেই। ইচ্ছেও নেই। তিনজনেই আঁজলাভরে জল তুলে খেতে লাগল। শুকনো জিভে মুখে যেন এতক্ষণে সাড় এল। ফ্রান্সিস উবু হয়ে বসে মাথাটা জলে ডোবাল, জল খেল। তারপর ঘাড়ে মাথায় জল ছেটালো। হ্যারি আর শাঙ্কোও তাই করল। এতক্ষণে শরীরটা যেন ঠাণ্ডা হল।

তারপর আবার চলা।

অন্ধকারে সাবধানে গাছের শেকড়বাকড়ে পা ফেলতে হচ্ছে। কাজেই চলার গতি কমে আসছে।

হঠাৎ ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছনে শুকনো ডালপালা ভাঙার শব্দ। ফ্রান্সিস হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে শব্দটা থেমে গেল। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস শব্দটা আমিও শুনেছি। নিশ্চয়ই কেউ আমাদের অনুসরণ করছে।" ফ্রান্সিসরা আবার হাঁটতে লাগল। পেছনে আবার শব্দ। শুকনো ডালপাতা ভাঙার শব্দ। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কো ছোরাটা কোমর থেকে খুলে হাতে নিল। আবার চলল ওরা। আবার শব্দ।

এবার শব্দটা অনেক কাছে। ফ্রান্সিস হঠাৎ পেছনদিকে ঘুরে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল, "কে আমাদের অনুসরণ করছ! সাহস থাকে আমাদের সামনে এসো।"

পেছনের অন্ধকার থেকে কার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আমি আলফান্সো, স্পেনীয়, আমি আপনাদের কোনও ক্ষতি করব না। আপনাদের বন্ধুত্ব চাই।"

"সামনে এসো।" ফ্রান্সিস বলল। পেছনের অন্ধকার গাছগাছালির আড়াল থেকে আলফান্সো বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের সামনে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে মোটামুটি দেখা গেল মুখে গোঁফদাড়ি ভর্তি এক বয়স্ক লোক। মাথার কাঁচাপাকা চুল বড় বড়, এলোমেলো, ঘাড় ছাপিয়ে নেমে এসেছে।

"নাম তো শুনলাম আলফান্সো। আমাদের অনুসরণ করছ কেন?" ফ্রান্সিস বলল।

আলফান্‌সো বলল, "সে অনেক কাহিনী আমার জীবনের। আপনারা যখন ছুটে এসে বনে ঢুকলেন তখন থেকেই আপনাদের পেছন পেছন আসছি। আপনারা স্পেনীয় ভাষায় কথা বলছিলেন। শুনে এত ভাল লাগল। আঃ, কতদিন মাতৃভাষা শুনিনি—বলিওনি। আপনাদের পরিচয় জানতে ইচ্ছে করছে।"

হ্যারি বলল, "আমরা জাতিতে ভাইকিং। তবে নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া আমরা পোর্তুগিজ স্পেনীয় ভাষা জানি।" তারপর হ্যারি আস্তে-আস্তে নিজেদের দেশে দ্বীপে ঘুরে বেড়ানো গুপ্তধন আবিষ্কার সংক্ষেপে বলে গেল। আলফান্‌সো বলে উঠল, আপনারা রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবেন?"

"সব না জেনে, না বুঝে বলি কী করে?" ফ্রান্সিস বলল।

"আমরা এই বনের উত্তরপ্রান্তে এসে গেছি। আর কিছুক্ষণ হাঁটলে বনের শেষে এক বড় প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছব। আগে সেখানে চলুন। ওখানে খাবার জোগাড় করব। খেয়েটেয়ে সব বলব।"

ফ্রান্সিসরা আর কিছু বলল না। নীরবে হাঁটতে লাগল।

সত্যিই আধঘণ্টার মধ্যে ওরা বনের শেষে এসে উপস্থিত হল।

অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ঘাসে ঢাকা প্রায় অন্ধকার প্রান্তরটা দেখা গেল। আলফান্‌সো বলল, "চলুন, আমার এক পরিচিত বুড়িমার বাড়ি আছে। সেখানে আশ্রয়, খাওয়া দুটোই জুটবে।"

ওরা প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে উত্তরমুখো চলল। ততক্ষণে আকাশের অন্ধকার কেটে গেছে। পুবদিকের আকাশ লালচে হয়েছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

একটু পরেই সূর্য উঠল। ফ্রান্সিস সেদিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগল। মনে মনে ভাবল, কী সুন্দর সূর্যোদয়। সমুদ্রে সূর্যোদয় তো কত দেখেছে। এক উন্মুখ প্রান্তরের পরে এরকম সূর্যোদয় কোনওদিন দেখেনি। মারিয়া এই দৃশ্য দেখলে খুশিতে নেচে উঠত। মারিয়া আর বন্ধুরা জাহাজে রয়েছে। এ-কথা ভাবতেই ফ্রান্সিসের মন খারাপ হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফ্রান্সিস হাঁটতে লাগল। ওসব ভাবতে গেলে মন দুর্বল হয়ে পড়বে।

ঘাসে ঢাকা প্রান্তর শেষ হল। কিছু ঘরবাড়ি দেখা গেল। সকালের উজ্জ্বল রোদ পড়েছে বাড়িঘরে। গাছগাছালিতে বিস্তৃত প্রান্তরে বাড়িগুলি চুনাপাথর আর কাঠে তৈরি। একটা ছোট রাস্তায় ওরা ঢুকল। কয়েকটা বাড়ির পরে একটা বেশ পুরনো বাড়ির সামনে এল ওরা। আলফান্‌সো বাড়িটার দরজায় কয়েকবার ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে কে যেন সাড়া দিল। কী বলল, ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না। বাড়ির দরজা খুলে গেল। দেখা গেল এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে। তিনি এগিয়ে এসে আল্‌ফানসোকে জড়িয়ে ধরলেন। আলফান্‌সো কী বলে উঠল, বৃদ্ধা ফোকলা দাঁতে হাসলেন। কী যেন বললেন, আল্‌ফানসো ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে কী বলল। বৃদ্ধা চোখমুখ কুঁচকে হেসে উঠলেন। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করলেন। সবাই বাড়িটাতে ঢুকল।

সামনের ঘরটাতে ঢোকবার জন্য বৃদ্ধা ইঙ্গিত করলেন। সবাই ঘরটায় ঢুকল। দেখল মেঝের শুকনো ঘাস বুনে বুনে বিছানামতো করা হয়েছে, সেটা পাতা। ঢাকা কাপড়টায় নানা রঙের লতাপাতা সেলাই করে তোলা। সবাই বসল। আলফান্সো বলল, "মজার ব্যাপার শুনুন। এই বৃদ্ধার একটি ছেলে যৌবনে মারা গিয়েছিল। আমার নাক চোখ মুখ ঠিক তার মৃত ছেলের মতো, বৃদ্ধা বলেছিল। তাই আমাকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসে। শুধু থাকা-খাওয়া নয় আমাকে অর্থ সাহায্যও করে। এদিকে কোনও কারণে এলে এই বৃদ্ধা মার কাছে আমাকে আসতেই হয়। বৃদ্ধা মা আমাকে কত যত্ন আত্তি করে। নিজের ছেলের মতো ভালবাসে।"

গতকাল খাওয়া জোটেনি। জলও খেতে পারেনি। রাত কেটেছে নিদ্রাহীন। ফ্রান্সিসরা বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। হ্যারি বরাবরই দুর্বল। ও এত ধকল সইতে পারল না। না খেয়েই অসহ্য ক্লান্তিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস, শাঙ্কো হ্যারিকে আর ডাকল না। ঘুমোক।

একটু বেলায় বৃদ্ধা এলেন। আলফান্সোকে ডাকলেন। ওদের চিনেমাটির থালায় গোল চাকা চাকা রুটি, শাকসবজির ঝোল খেতে দিলেন। শাঙ্কো হ্যারিকে ডাকল, "হ্যারি, ওঠো খেয়ে নাও।" হ্যারি উঠে বসল।

ওরা চারজন খেয়ে নিল। খাওয়া দাওয়া সেরে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চোখ বুজল। নানা ভাবনা মাথায়। জাহাজে মারিয়া কেমন আছে, বন্ধুরা কেমন আছে। আমরা তো পালাতে গিয়ে এখানে এসে পড়লাম!

বিকেল নাগাদ সকলের ঘুম ভাঙল। ফ্রান্সিস শুয়ে থেকেই আলফান্সোকে বলল, "তুমি তো স্পেন দেশের লোক। তুমি এখানে এলে কী করে?"

তখন আলফান্সো ওর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলল। তারপর বলতে লাগল, "আমি তুলাম নগরে এসে পৌঁছেছিলাম। সেখানে বেশ কিছুদিন ছিলাম। তার মধ্যে তলতেক ভাষাটা শিখে নিয়েছিলাম। আমার ঢোলা জামাটার হাঁটু অবধি ঝুল ছিল। কোমরের তলায় তরোয়ালটা ঝুলিয়ে রাখতাম। জাহাজে কালো রং করা হয়। এক ধরনের ফল জলে সেদ্ধ করে এই রং পাওয়া যায়। আমি সেটা দিয়েই তরোয়ালটা রং করলাম। এখানকার লোকেরা জীবনে কখনও তরোয়াল দেখেনি। আমিও রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ তরোয়ালটার ওপর ঝুঁকে মাথা নোয়াতাম। বিড়বিড় করে কিছু বলতাম। আবার হাঁটতে থাকতাম। লোকেরা ধরে নিল তরোয়ালটা কোনও দেবমূর্তি।। একটা পবিত্র জিনিস।

"দিন আমার ভালই কাটছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ভাল রইল না। রাজা তুতজ আমাকে রাজসভায় ডেকে পাঠাল।

"গেলাম রাজসভায়। রাজা তুতজ খুব হেসেটেসে বলল, 'তোমরা বিদেশী। আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।' আমি চুপ করে রইলাম আরও কী বলে শোনার জন্য। রাজা তুতজ বলল 'রাজা হুনাকমিনের নাম শুনেছ?"

"শুনেছি। এখানে এসে।" আমি বললাম।

"এখানকার মন্দিরের গর্ভগৃহে তার ধনসম্পত্তি গোপনে রাখা আছে এটা শুনেছ?" রাজা তুতজ বলল।

"শুনেছি, তবে পরিষ্কার বুঝিনি।" আমি বললাম।

"এখন সব বুঝবে ওই গর্ভগৃহে গুপ্তধন খুঁজতে গেলে।" রাজা তুতজ বলল।

"কিন্তু মাননীয় রাজা, একটা কথা বুঝতে পারছি না। যদি আপনারা জানেনই যে ওই গর্ভগৃহে গুপ্তধন আছে তবে তার খোঁজ করেননি কেন?"

"আমার লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে কিন্তু পায়নি।"

"তবে আমি কী করে পারব?" আমি বললাম।

"বললাম তো, তোমরা বিদেশী, খুব বুদ্ধি তোমাদের'। রাজা তুতুজ বলল।

"বেশ দেখি গর্ভগৃহে নেমে।" আমি বললাম।

"পরের দিন নামলাম গর্ভগৃহে।"

ফ্রান্সিস হেসে বলল, "তারপর গর্ভগৃহের মেঝেয় সঙ্গের পাহারাদার মশাল ছুঁড়ে ফেলল। আগুন জ্বলে উঠল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমাদেরও নামতে বলেছিল?" আলফান্‌সো বলল।

"হ্যাঁ, পাহারাদার সৈন্য দু'জনকে কাবু করে আমরা পালিয়ে এসেছি।" ফ্রান্সিস বলল।

"ঠিক, ঠিক। আমিও তাই করে এখানে পালিয়ে এসেছি।" আলফান্‌সো বলল।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সত্যিই কি অতীতের বীর রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন ওখানে আছে?"

"না। তুলামের মন্দিরে নেই। আছে চিচেন ইতজার মন্দিরে।" আলফান্‌সো বলল।

"সেটা তুমি কী করে বুঝলে?" ফ্রান্সিস বলল।

একটু চুপ করে থেকে আলফান্‌সো বলল, "তোমাদের এসব বলে কী হবে। তোমরা কি পারবে হুনাকমিনের গুপ্তভাণ্ডার খুঁজে বের করতে?" ফ্রান্সিস হাসল। বলল, "তুমি আগে সমস্ত ব্যাপারটা বলো। সব দেখি, শুনি, তবেই বুঝতে পারব সেই গুপ্তধন উদ্ধার করা যাবে কি না।"

"সব বলছি। কিন্তু তার আগে আমাকে কথা দাও যে হুনাকমিনের গুপ্তধন উদ্ধার হলে আমাকে ভাগ দিতে হবে।" আলফান্‌সো বলল।

"আগে উদ্ধার তো হোক।" হ্যারি বলল।

"না। আমি তার আগেই বাটোয়ারা চাই। আমি অর্ধেক নেব।" আলফান্‌সো বলল।

"অর্ধেক কেন? সবটাই নিও।" ফ্রান্সিস বলল।

আলফান্‌সো লাফিয়ে উঠলো, "অ্যাঁ! ঠিক তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবার তুমি এই ব্যাপারে যা যা জানো বলো।" ফ্রান্সিস বলল।

"তোমাদের তো বলেছি আমি জলদস্যুদের জাহাজে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তারপর এই দেশে আসা। এই দেশে এসে আমি কী করলাম সেটা বলি। কীভাবে নকশাটা পেলাম সে-কথাও বলি।" একটু থেমে আলফান্‌সো বলতে লাগল, "এখানে তুলাম বন্দরশহরে এলাম। বেশ মনোযোগ দিয়ে এখানকার তলতেক ভাষা আরও ভাল করে শিখলাম। তারপরে রাজা তুতজ আমাকে লোভ দেখিয়ে গর্ভগৃহে পাঠাল। আমি পালালাম। চললাম চিচেন ইতজার দিকে। যাওয়ার পথে এই কোবানগরে এলাম। বুড়িমাকে পেলাম। বেশ আদরযত্নে মাস কয়েক রইলাম।"

আলফান্‌সো একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "এখানকার ইতিহাস জানলাম। এই দেশটার পুবদিকে বাস করে মায়াপানরা। পশ্চিমদিকে চিচেন ইতজা। রাজা হুনাকমিনের সঙ্গে মায়পানদের যুদ্ধ হয়েছিল। মায়পানরা হেরে যায়। হুনাকমিন চিচেন ইতজার মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কী সুন্দর মন্দির। ওখানে গেলে দেখতে পাবেন।" আলফান্‌সো থামল।

"আলফান্‌সো কোনও একটা গোপন কিছু তুমি জান। সেটা বলো।" হ্যারি বলল।

"হ্যাঁ, এবার সেটাই বলব। এই কোবা থেকে আমাকে পালাতে হল। এখানকার গোষ্ঠীপতি আমাকে ডেকে পাঠাল। গোষ্ঠীপতি জিজ্ঞেস করল, "শুনেছি তুমি বিদেশী। এখানে এসেছ কেন?"

"ভাগ্যক্রমে। জলদস্যুদের জাহাজ থেকে পালিয়ে আমি এখানে এসেছি। আবার ভাগ্যক্রমে এখানে আহার, বাসস্থান পেয়েছি।' আমি বললাম।

"উঁহু, তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তুমি চিচেন ইতজার রাজা পাকানের গুপ্তচর।" গোষ্ঠীপতি বলল।

"আমি তলতেক ভাষাটা মোটামুটি শিখেছি। তাই আপনাকে বলছি, আপনিই ভেবে দেখুন, গুপ্তচরবৃত্তি আমি কেন করতে যাব। আমি বিদেশী। আপনাদের এই দেশে হঠাৎই এসেছি।" আমি বললাম।

"বাজে কথা বলছ।" গোষ্ঠীপতি দু'জন পাহারাদারকে ইঙ্গিতে ডাকল। ওরা আমার দু'হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলল। বুঝলাম, হাজার চেষ্টা করেও গোষ্ঠীপতির সন্দেহ আমি দূর করতে পারব না। তাই দুর্ভাগ্য মেনে নিলাম।

"পাহারাদার দু'জন আমাকে একটা তালা লাগানো ঘরের সামনে নিয়ে এল। তালা খুলে আমাকে ওরা ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিল।

"আমার বন্দীজীবন শুরু হল। আমি পালাবার ছক কষতে লাগলাম। ও-ঘরে আরও দু-তিনজন বন্দী ছিল। জঘন্য খাবার খেতে দিত। বমি উঠে আসে। মনে পড়ল বুড়িমার কথা। কী সুস্বাদু খাবার খেতে পেয়েছি। শুকনো ঘাসের নরম বিছানায় শুয়েছি। ঘুমিয়েছি।" আলফান্‌সো থামল।

ফ্রান্সিস বলল, "তারপর? তুমি পালাতে পারলে?"

"হ্যাঁ। আমি লক্ষ্য করলাম যে দু'জন পাহারাদার খাবার নিয়ে আসে। হাতে বর্শা থাকে না, ওদের পেছনে থাকে দু'জন। দু'জনের হাতেই কাঠের বর্শা। লোহার ছুঁচলো মুখ। আমি অন্য বন্দিদের বললাম, শোনো, আমি পাহারাদারদের বলব যে আজ একটু রাতে আমরা খাব।" বন্দিদের একজন বলল, কেন?

"আমি পালাবার ছক কষে ফেলেছি। আমরা সবাই পালাব।" আমি বললাম।

রাত হল। আমি একজন পাহারাদারকে ডাকলাম। ও এল। বললাম, "আজ একটু রাতে খাব আমরা।"

"কেন?" পাহারাদার বলল।

"আমাদের খিদে নেই।" কথাটা বলে আমি বন্দিদের দিকে তাকালাম, ওরাও বলে উঠল, 'আমরাও পরে খাব।'

"বেশ।" পাহারাদার চলে গেল।

রাত বাড়ল।

"এবার পাহারাদাররা খাবার নিয়ে এল। দরজা খোলা হল। দু'জন বড় কাঠের পাত্রে সবজি, ঝোল নিয়ে এল। অন্যজনের হাতে রুটি রাখা কাঠের বড় রেকাবি। দরজার কাছ থেকে একজন পাহারাদার এগিয়ে এল। বর্শাটা পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম। সবজি ঝোলের বড় কাঠের পাত্রটা তুলে নিয়ে দরজায় দাঁড়ানো একজন পাহারাদারের মাথায় ঢেলে দিলাম। পাহারাদার দু'হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে মেঝেয় বসে পড়ল। অন্য পাহারাদার কিছু বোঝার আগেই আমি খোলা দরজা দিয়ে দ্রুত ছুটে বাইরে চলে এলাম। অন্ধকারে দৌড় দিলাম প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে। পেছনে শুনলাম পাহারাদারদের চ্যাঁচামেচি। আমি ততক্ষণে ধরাছোঁয়ার বাইরে। অন্য বন্দিরাও ততক্ষণে পালিয়ে গেছে।

আলফান্সো থামল। তারপর আবার বলতে লাগল, "বুড়িমার এই বাড়িতে কয়েকদিন আত্মগোপন করে রইলাম। তারপর একদিন ভোরে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চললাম চিচেন ইতজার উদ্দেশ্যে। বড় সড়ক এড়িয়ে জংলা জায়গা দিয়ে চললাম। দিনটা সেদিন একটু মেঘলা ছিল। কাজেই হাঁটতে কষ্ট হয়নি।

"সন্ধের সময় চিচেন ইতজা পৌঁছলাম। শরীর ক্ষুধাতৃষ্ণা আর ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়ছে। দুপুরে একটা গ্রামের বাড়িতে চারটে মাংসের বড়া খেয়েছিলাম। তাতে খিদে মেটেনি, বরং বেড়ে গেছে।

"খুঁজতে খুঁজতে একটা ছোট সরাইখানা পেলাম। এখন এখানেই আশ্রয় নিতে হবে। সরাইখানার মালিক আমাকে দেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। বেশ কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে মাথা একটু ঝুঁকিয়ে বলল, "কী খাবেন বলুন?"

"মাংস রুটি। এক্ষুনি চাই।" আমি বললাম।

"এক্ষুণি দেওয়া হবে। আপনি পেছনের ঘরে একটু বিশ্রাম নিন।" আমি পেছনের ঘরে ঢুকলাম। দেখি একটা মোটা মোমবাতি জ্বলছে। মেঝেয় কাঠের

পাটাতনে বসলাম। বসে থাকতে পারলাম না। শুয়ে পড়লাম। সরাইখানার একটি অল্পবয়সী ছেলে একটা কাঠের পাত্রে জল নিয়ে এল। আমাকে দিল। আমি উঠে বসে সেই কাঠের পাত্রের সব জল খেয়ে ফেললাম। মুখ-গলার শুকনো ভাবটা কাটলো। তখন বুঝ ম—আমার কী জলতেষ্টা না পেয়েছিল! পাত্রটা ফিরিয়ে দিলাম। ছেলেটি চলে গেল। আমি আবার শুয়ে পড়লাম।

"কিছুক্ষণ পরে ছেলেটি আমাকে গরম গরম রুটি আর মাংস দিয়ে গেল। আমি উঠে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পর পর আরও একপাত্র মাংস-রুটি নিয়ে জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।

"ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। পাখির ডাক শুনলাম। উঠে বসলাম। শরীরের আর ক্লান্তভাব নেই।" আলফান্‌সো থামল।

"তারপর?"

"তারপর আমি ওই সরাইখানাতেই রইলাম। বেশ কিছুদিন। ঘুরে ঘুরে নগরটা দেখলাম। বেশ সাজানো-গোছানো শহর। অনেক ফুলের বাগান। রাস্তায় লোকজনের বেশ ভিড়। দোকানে দোকানে কাচ ঢাকা আলো। পথে দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে করে চিচেন ইতজা মন্দিরের সামনে এলাম। মন্দিরের চারপাশে জলে ঘেরা। একেবারে সামনেই সিঁড়ি। সোজা উঠে গেছে মন্দিরের প্রায় মাথা পর্যন্ত। একটা সাঁকো মতো পার হয়ে মন্দিরের চত্বরে উঠতে হয়। সাঁকো পার হয়ে মন্দিরের চত্বরে এলাম। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। মন্দিরের প্রায় মাথার কাছাকাছি এসে সিঁড়িটা নীচে নেমে গেছে। মন্দিরের মাথায় একটা বড় একটা ছোট ঘরমতো। চারদিকে তাকিয়ে দেখে বুঝলাম ওই দুটো ছোট ঘরে ওঠার মতো সিঁড়ি নেই। ওখানে কেউ উঠতে পারবে না। তা হলে কি ওখানে ওঠা যায় না? এবার ঢাল সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলাম, চুনাপাথরে তৈরি দেওয়ালে ফুল, পাখি কুঁদে কুঁদে তোলা। নীচে নেমেই যাচ্ছি যেন এই সিঁড়ির শেষ নেই। ততক্ষণে চারদিকে অন্ধকার জমা হয়ে গেছে। কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। সিঁড়িগুলোতে আন্দাজে পা ফেলতে হচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। মশালের আলো ছাড়া এখানে কিছুই দেখা যাবে না, আমি ফিরে দাঁড়ালাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। কালকে আবার আসব। একটা মশাল ভাল করে তেলে ভিজিয়ে আনতে হবে।"

"তা হলে পরদিনও গিয়েছিলে?" ফ্রান্সিস বলল।

"হ্যাঁ, মশাল নিয়ে। আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। একটু পরেই সব অন্ধকার। মশাল জ্বালালাম। তিনদিকে পাথুরে দেওয়াল মতো। সিঁড়ি দেখতে দেখতে নামতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখলাম সিঁড়ি শেষ। একটা চৌকোনো ঘর। এবড়োখেবড়ো পাথরের দেওয়াল। চৌকোনো ঘরটার চারদিকে দেখলাম চুনাপাথরের আর বালির নয়টি পুরুষ মূর্তি। বুঝলাম মায়া ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত রাত্রির নয় দেবতার মূর্তি। ঘরের মাঝখানে ফুল, লতাপাতার স্তূপ। বোধ হয় এ দেশবাসিরা দেবতাদের পুজো করেছে?" আলফান্‌সো থামল।

"তুমি ওইটুকুই দেখেছিলে?" হ্যারি বলল।

"শুধু ওইটুকুই নয়। ওই ছোট ঘরটার নীচেই রয়েছে আবার সিঁড়ি। ফুল, পাতা সরাতেই দেখলাম সেই সিঁড়ি। মশাল হাতে নামতে লাগলাম। মশালের আলো খুব কাঁপছে না। বুঝলাম এখানে বেশি বাতাস ঢুকছে না। ফুল, পাতা, সরিয়ে দিয়ে সিঁড়িতে পা রাখলাম। এবারের সিঁড়িগুলো তত বড় নয়। বেশ দেখেশুনে নামতে হচ্ছিল। নামতে লাগলাম। খুব সাবধানে নামতে হচ্ছিল বলে চলার গতি কমে গিয়েছিল।" আলফান্‌সো থামল।

শুধু ফ্রান্সিস বলল, "তারপর?" আর সবাই চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে আলফান্‌সো বলতে লাগল, "পরে দেখি আগের মতোই চৌকোনো একটা ঘর। তবে খুব ছোট। মেঝেয় রাখা একটা কফিন মতো। কফিনের ঢাকনা আর খুললাম না। বুঝলাম ওই কফিনে রয়েছে মিশরের মমির মতো কোনও রাজার মমি। হতে পারে সেই রাজা হুনাকমিন। মশালটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে দেখলাম। এবড়োখেবড়ো পাথুরে দেওয়াল। চুনাপাথর মেশানো। এখানেই কি রাজা হুনাকমিন তাঁর ধনসম্পদ সব গুপ্তভাবে রেখে গেছেন? বারকয়েক চারদিক দেখে নিয়ে সিঁড়ির কাছে এলাম। একটু অপেক্ষা করলাম। তারপর আস্তে-আস্তে ওপরে উঠতে লাগলাম। নয় দেবতার ঘরটাও খুব ভাল করে দেখলাম। সেই চুনাপাথর মেশান এবড়োখেবড়ো দেওয়াল। বুঝলাম— এখানে রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন নেই। মানুষের হাতে তৈরি এই গুহায় সকলেই আসতে পারে। কাজেই দীর্ঘকাল ধরে মানুষ এখানে পুজো দিতে এসেছে। রাজা হুনাককেও শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে। এখানকার গোপনীয়তা কিছু নেই। এখানে রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন থাকলে বহু আগেই তা আবিষ্কার হয়ে যেত। তাই আমার কেমন বিশ্বাস হল রাজা হুনাকমিনের ধনসম্পদ অন্য কোথাও গোপনে রাখা হয়েছে। এই গর্ভগৃহে নয়। এখনও মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। অন্য কোথাও যা দেখবার তা দেখলাম। তারপর আমি আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম।" আলফান্‌সো থামল।

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস, কী ভাবছ?" ফ্রান্সিস হেসে বলল, "রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন উদ্ধার।"

"আপনি পারবেন?" আলফান্‌সো একটু অবাক হয়ে বলল।

"সেটা ঠিক এক্ষুনি বলতে পারছি না। চিচেন ইতজায় যাই, সব দেখি, শুনি, জানি, তখনই বলতে পারব এটা সম্ভব কি না। অর্থাৎ রাজা হুনাকমিনের গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করা যাবে কি না।"

"অসম্ভব। পারবেন না!" আলফান্‌সো বলল।

"বললাম তো, সব আগে দেখিটেখি, তারপর বলা যাবে অসম্ভব না সম্ভব!" ফ্রান্সিস বলল।

"বেশ, চলুন, সব জানুন, দেখুন।" আলফান্‌সো বলল।

তখন সন্ধে হয়ে গেছে। আলফান্সোর বুড়িমা একটা কাঠের বড় রেকাবি নিয়ে ঘরে ঢুকল। রেকাবিতে রাখা বড় বড় মাংসের পিঠে। ফ্রান্সিসরা খুব খুশি। পিঠে তুলে নিয়ে খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে ফ্রান্সিস বল , "চলো, কোবা নগরটা কেমন দেখে আসি। আলফান্সোই আমাদের দেখাবে সব।"

ওরা তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চলল নগর দেখতে। ছোট নগর। লোকজনের খুব ভিড় নেই।

আলফান্সো বলল, "চলো, আগে মন্দিরটা দেখি।"

আলফান্সোর নির্দেশমতো চলল ওরা। বড় সড়কের ধারেই দেখল মন্দিরটা। খুবই ছোট মন্দির। দুটো সিঁড়ি সোজা ওপর দিকে উঠে গেছে। মাথায় একটা ছোট ঘরমতো।

ফ্রান্সিসরা ঘুরে ঘুরে দেখল। তখন তো রাত। মশালের আলোয় যতটুকু দেখবার দেখল।

ওরা যখন ফিরে আসছে, তখন একটা ঘটনা ঘটল। আলফান্সো একটু পিছিয়ে পড়েছিল। দুটো লোক ওর দু'পাশে এসে দাঁড়াল। আলফান্সোও দাঁড়িয়ে পড়ল। অল্প আলোয় আলফান্সো দেখেই চিনল, সাইল, সঙ্গের লোকটা একটা গুণ্ডা। অর্থ পেলে সব করতে রাজি। আলফান্সো বলল, "কী চাও তোমরা?"

সাইল একটু হেসে বলল, "চিচেন ইতজার এক সরাইখানায় একটা বয়স্ক লোক এসেছিল। তোমাকে একটা নকশা দিয়েছিল।"

"নকশা-টকশা কিছু না, চিচেন ইতজার মন্দিরের হাতে আঁকা ছবি।" আমি বললাম।

"ঠিক আছে। যদি ওটা নকশা না হয় তা হলে আমাকে দিয়ে দাও।" সাইল বলল।

"দিতে তো পারতাম। কিন্তু আমার কাছে তো ওটা নেই।" আলফান্সো বলল।

"কোথায় আছে নকশাটা?" সাইল বলল।

"সেই সরাইখানার মালিকের কাছে রেখে এসেছি। কী আর হবে ওই ছবি দিয়ে।" আলফান্সো বলল।

"তুমি মিথ্যে কথা বলছ। ওই সরাইখানায় আমরা গিয়েছিলাম।" সরাইখানার মালিক বলল, "আমি ওই ছবির ব্যাপারে কিছুই জানি না।"

"ও মিথ্যে বলেছে।" আলফান্সো বলল।

"বেশ, কাল সকালে চিচেন ইতজা চলো। সেই সরাইখানায় আমরা কালকে যাব। তুমিই মিথ্যে বলছ না সরাইখানার মালিক মিথ্যে বলেছে সেটা বোঝা যাবে।" সাইল বলল।

"চলো, দেখা যাক।" আলফান্সো বলল।

"এখন নয়, কাল সকালে যাব আমরা।" সাইল বলল।

"আচ্ছা, আমি এখন তা হলে আমার আস্তানায় যাই।" আলফান্সো বলল।

"না, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে।" গুণ্ডাটা বলল।

"কোথায়?" আলফান্সো বলল।

"গেলেই দেখতে পাবে। তুমি আজ রাতের মতো আমাদের বন্দি হিসেবে থাকবে। কালকে আমাদের সঙ্গে চিচেন ইতজায় যাবে।"

গুণ্ডাটা শেষে বলল, "আমাদের কথামতো না চললে শেষ করে দেব।"

"বেশ আমি যাব।" আলফান্সো বলল।

সাইল আর গুণ্ডাটার সঙ্গে আলফান্সো চলল।

ওদিকে বেশ কিছুটা গিয়ে শাঙ্কো বলে উঠল, "আলফান্সো কোথায়?"

ফ্রান্সিস আর হ্যারি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। আলফান্সো নেই। ওরা রাস্তায় এদিকে ওদিকে ঘুরে এল। না। আলফান্সো নেই।

ফ্রান্সিস বলল, "আলফান্সো অনেকদিন এ-দেশে আছে। এই কোবা নগরও ওর খুবই পরিচিত। আমরা হারিয়ে গেলে বিপদ ছিল।"

"আমার মনে হয় আলফান্সো বুড়িমার আস্তানায় চলে গেছে। চলো, আমরাও ওখানে যাই।" হ্যারি বলল।

চারদিকে তাকাতে-তাকাতে ফ্রান্সিস বলল, "বুড়িমার বাড়িটা যে কোথায় আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না।"

হ্যারি বলল, "আমার মনে আছে। সামনের মোড়টার বাঁদিকের রাস্তাটা ধরে যেতে হবে। দেখতে থাকো কোনও বড় একটা ডুমুর গাছ পাও কি না। ওই ডুমুর গাছের গায়েই বুড়িমার বাড়ি।"

"ডুমুর গাছ তো অনেক জায়গাতেই থাকতে পারে।" শাঙ্কো বলল।

"তা পারে। কিন্তু এতদূর ঘুরে এলাম, একটাও ডুমুর গাছ দেখিনি।" হ্যারি বলল।

"ঠিক আছে। ওই রাস্তা ধরেই চলো। দেখা যাক, ডুমুর গাছ পাই কি না।" ফ্রান্সিস বলল।

ওরা বাঁ দিকের রাস্তাটাই ধরল। বেশ কিছুটা যেতেই বাঁ দিকে একটা বড় ডুমুর গাছ দেখা গেল। হ্যারি হেসে বলল, "দ্যাখো, ডুমুর গাছটার গায়েই বুড়িমার বাড়ি।"

শাঙ্কো গিয়ে দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে গেল। বুড়িমা দাঁড়িয়ে আছেন। বুড়িমা ফোকলা মুখে হেসে বললেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য রেঁধেছি। তোমরা বাইরে কোথাও খাবে না।"

তলতেক ভাষা। ফ্রান্সিস ঠিক বুঝল না। হ্যারি কিছুটা আন্দাজ করে মাথা নাড়ল। বুড়িমা এটাকে সম্মতি ধরে নিয়ে হাসতে লাগলেন।

ফ্রান্সিসরা এসে বিছানায় বসল। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল, "বিপদ আসছে। আলফান্সো আমাদের সঙ্গে নেই। বুড়িমা ফ্রান্সিসদের সবাইকে দেখতে দেখতে বললেন, "আমার ছেলে কই?"

হ্যারি হাতের ইঙ্গিতে বোঝাল আলফান্‌সো আসছে। বৃদ্ধা আর কিছু বললেন না। চলে গেলেন।

রাত হল। খাওয়ার সময় হল। আলফান্‌সো তখনও ফিরল না। আলফান্‌সোর বুড়িমা ঘর-বার করতে লাগলেন।

হ্যারি হাতের, চোখের ইঙ্গিতে বোঝাতে লাগল আল্‌ফানসো আসবে। বুড়িমা ইঙ্গিতটা বুঝলেন। কিন্তু আর একটু রাত বাড়তেই বুড়িমার কান্না শুরু হল।

ফ্রান্সিস বলল, "এখন তো সরাইখানাও খোলা পাব না। আজকে রাতের মতো খাওয়া জুটবে না, শুয়ে পড়ো।" বুড়িমার ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না চলতেই লাগল।

ফ্রান্সিসরা ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বুড়ির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার একঘেয়ে শব্দ আর খালি পেট। ঘুম আর আসবে না।

ওদিকে সাইল আর গুণ্ডাটা আলফান্‌সোকে একটা বাড়িতে নিয়ে এল। পাথর আর কাঠের ভাঙাচোরা বাড়ি। বাইরের ঘরটায় ওরা ঢুকল। শুকনো ঘাসে তৈরি বিছানা। ওরা বসল বিছানায়।

সাইল বলল, "আলফান্‌সো, আমি সবই দেখেছি। সেই নকশাটা পেয়ে তুমি খুশিতে আত্মহারা। আমি ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। বুড়োর সব কথা শুনিনি। কিন্তু যেটুকু শুনেছি তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটা কোনও গুপ্তধনের নকশা।"

"ঠিক আছে। তুমি তো বললে বিশ্বাস করবে না। ছবি আঁকা কাগজটা দেখে কিছু বুঝলে কি না সেটা ভেবে দ্যাখো। ওটা চিচেন ইতজার ছবি ছাড়া কিছুই না।"

গুণ্ডাটা উঠে দাঁড়াল। বলল, "সাইল, চল, খেয়ে আসি। ভীষণ খিদে পেয়েছে।" তিনজনে ঘরে তালা দিয়ে খেতে বেরোল।

রাস্তায় যেতে যেতে আলফান্‌সো একটা উপায় ভাবল। সেইমতো করলও। ও একপাশে ছিল। অন্যপাশে গুণ্ডাটা আর সাইল। আলফান্‌সো হঠাৎ বসে পড়ল। গুণ্ডাটা আর সাইল নিচু হয়ে দেখতে গেল কী হয়েছে। আলফান্‌সো সঙ্গে-সঙ্গে দু'জনকে জোরে ধাক্কা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দু'জনে দু'পাশে ছিটকে পড়ল। আলফান্‌সো দ্রুতবেগে ডান দিকের অন্ধকার গলিটায় ঢুকে পড়ল। সাইল আর গুণ্ডাটার "ধর, ধর" চিৎকার শুনতে পেল। আলফান্‌সো এবার অন্য একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। পেছনে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। ও ছুটল বুড়িমার বাড়ির দিকে।

ফ্রান্সিসের বারেবারে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। হঠাৎ শুনল দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ। ফ্রান্সিস দ্রুত বিছানায় উঠে বসল। আস্তে-আস্তে দরজার কাছে গেল। মৃদুস্বরে বলল, "কে?"

"আমি, আমি আলফান্‌সো।"

ফ্রান্সিস দরজা খুলে দিল। আলফান্‌সো ঘরে ঢুকল। ও হাঁফাচ্ছে। দরজা খোলার শব্দে হ্যারি আর শাঙ্কোর ঘুমও ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস আলফান্‌সোকে

বলল, "ভাই, তুমি আগে তোমার বুড়িমার কাছে যাও। তোমার বুড়িমা এখনও বোধহয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।"

আলফান্সো বাড়ির ভেতরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল, "যাক, বাঁচা গেল। বুড়িমা এবার কান্না বন্ধ করবেন।"

একটু পরেই বুড়িমা ফ্রান্সিসদের ঘরে এলেন। একগাল হেসে বললেন, "তোমরা এখন ঘুমিয়ে পড়বে না! আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

খাওয়াদাওয়ার পর ফ্রান্সিস বলল, "আলফান্সো তোমার কী হয়েছিল?"

"সব ঘটনা না বললে ঠিক বুঝবে না।" আলফান্সো বলল।

"আমারও মনে একটা খট্‌কা আছে। তুমি সব কথা আমাদের বলোনি।"

আলফান্সো বলল, "এবার সব বলছি। বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমি সে সময় চিচেন ইতজায় একটা সরাইখানায় ছিলাম। সেই সময় সাইল নামে একটা লোকও আমার ঠিক পাশেই ঘুমোত। আমাদের দু'জনের মিলটা ভাল হল। সাইলেরও ত্রিসংসারে কেউ নেই। আমারও সেই অবস্থা।" আলফান্সো থামল।

"তারপর?" হ্যারি বলল।

"একদিন গভীর রাতে হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনলাম। সরাইখানার মালিক দরজা খুলে দিল। অন্ধকারে কিছুই দেখেছিলাম না। শুধু গোঙানির শব্দ। সরাইখানার মালিক মোটা মোমবাতিটা জ্বালল। দেখি একজন বয়স্ক লোক। বুক দিয়ে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে মেঝের ওপর দিয়ে আসছে। সারা গায়ে মাথায় ধুলো জমে আছে। পোশাকে রক্তের দাগ। অবাক হয়ে ভাবলাম এই বয়সে লোকটা মারপিট করতে গেছে নাকি।

"মোমের আলোয় দেখলাম, লোকটার বাঁ পা রক্তমাখা। লোকটার গোঙানি চলল। ভাবলাম এর এক্ষুণি চিকিৎসার প্রয়োজন। সরাইখানার মালিক বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে। সাইলও ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। আমি সরাইখানার মালিককে বললাম, "আমি এই জায়গাটা ভাল চিনি না। ধারে কাছে কোথায় একজন বৈদ্যকে পাব?"

"রাস্তায় নেমে ডান দিকে দেখবেন একটা মাঠমতো। ওই মাঠের শেষেই একটা বিরাট গাছ। গাছটার ধারেই একটা বাড়ি। ওখানেই একজন বৈদ্য থাকেন। এই শেষ রাত। আসবে কি?" মালিক বলল।

"দেখা যাক।" এই বলে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটু গিয়েই মাঠ পেলাম। ঝাঁকড়া মাথা বিরাট গাছ। পেছনের বাড়িটায় গিয়ে টোকা দিলাম। ভেতরে কোনও শব্দ নেই। আবার জোরে টোকা দিলাম। ভেতর থেকে কেউ বলল, "কে?"

"খুব বিপদে পড়ে এসেছি। বৈদ্যমশাইকে একটু আসতে বলুন।"

"একটু পরেই দরজা খুলে গেল। এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। মুখে দাড়ি গোঁফ। বললাম, "বড় রাস্তায় যে সরাইখানাটা আছে আপনাকে দয়া করে সেখানে একবার যেতে হবে।"

"কিন্তু এত রাতে—মানে—"

"দয়া করে চলুন। লোকটির বাঁ পা বোধহয় ভেঙে গেছে। শরীরের অনেক জায়গায় আঘাত।" আমি বললাম।

"হুঁ। আসছি।" বৈদ্য বললেন।

ওষুধের থলেটা নিয়ে বৈদ্য অল্পক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এলেন। আমার সঙ্গে চললেন।

"আমরা সরাইখানায় ঢুকলাম। বৈদ্য ভীষণ আহত লোকটির কাছে বসলেন। পায়ের দিকের পোশাকটা কিছুটা তুললেন। মোমবাতির আলোয় দেখা গেল, পাটা মুচড়ে গেছে। তখনও রক্ত পড়ছে, তবে অল্প। বৈদ্য লোকটির পরনের ঢোলা হাতা জামা তুলে দেখলেন। লোকটির গোঙানি তখনও থামেনি। বৈদ্য ওর চোখ বুক কোমর দেখলেন। আমাকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। মৃদু স্বরে বললেন, "বোধ হয় কোনও উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গেছে। একটা পা ভেঙে গেছে। অন্য পা-টা মচকে গেছে। দাঁড়াতে পারবে না। মাথার পেছনেও ভীষণ লেগেছে। কী চিকিৎসা করব বলুন। এ বাঁচবে না।" আমি বললাম, 'তবু আপনি যতটা করার করুন।'

"বেশ।" বৈদ্য কাপড়ের পোঁটলা থেকে ওষুধ বের করলেন। দুটো ছোট বোয়ামও বের করলেন। বোয়াম থেকে কী একটা কালো রঙের জিনিস তুলে দু'হাতের তেলো দিয়ে চেপে চেপে দুটো বড়ি করলেন। আমার হাতে দিলেন। বললেন, "দুটোই খাইয়ে দিন।" লোকটির দুই চোয়াল চেপে ধরে বললাম, "ওষুধটা খেয়ে নিন।" লোকটি খেল। বৈদ্য একটা কাপড়ের টুকরো চাইলেন। সরাইখানার মালিক এনে দিলেন। বৈদ্য আহত লোকটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্ত মুছে দিলেন। তারপর বললেন, 'অল্প জল দিন।' মালিক কাঠের গ্লাসে জল নিয়ে এলেন। বৈদ্য ঝোলা থেকে একমুঠো হলুদের গুঁড়ো বার করলেন। একটু একটু করে মিশিয়ে একটা লেই করলেন। ভাঙা কাটা জায়গাগুলোতে আস্তে-আস্তে লাগিয়ে দিলেন। লোকটি এবার নড়েচড়ে উঠল। একটু পরেই তার গোঙানি বন্ধ হল। বৈদ্য আরও ওষুধ আমাকে দিলেন। পরে খাওয়াতে হবে। লাগাতে হবে।

"বৈদ্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি কোমরের ফেট্টি থেকে কিছু অর্থ বের করে বৈদ্যকে দিলাম। বৈদ্য চলে গেলেন। আমি লোকটার পাশে বসে রইলাম। বৈদ্য বলে গেছেন বাঁচার কোনও আশা নেই। তবু মরার সময় যাতে যন্ত্রণা না ভোগ করতে হয় তার জন্যই বৈদ্যকে ডেকে এনেছিলাম।

'সাইল এতক্ষণে উঠে আমার কাছে এল। বলল, 'মিছিমিছি এত কিছু করছেন কেন? এ তো বাঁচবে না।'

"তবু চেষ্টা করা। দেখি।"

"বাইরে পাখির ডাক শুনলাম। ভোর হয়েছে। আমি বসে বসেই একটু ঘুমিয়ে নিলাম। ঘুম ভেঙে দেখি লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। স্থির দৃষ্টিতে। একটু চমকে উঠলাম। বললাম, 'এখন কেমন আছেন?'

"লোকটি ভাঙা গলায় বলল, 'একটু ভাল।' তারপর ভাঙা ভাঙা বলতে লাগল, 'আপনি—আমার জন্য এত করছেন—।' বাধা দিয়ে বললাম, 'এটুকু মানুষ হিসেবে আমার করা উচিত। নইলে, একটা জানোয়ারের সঙ্গে আমার তফাৎ কোথায়?' লোকটি আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করল।

"লোকটিকে সকালের খাবার খাওয়ালাম। ওষুধও খাওয়ালাম। দুপুরেও খাওয়ালাম।

"সন্ধের দিকে মনে হল লোকটি গায়ে একটু জোর পেয়েছে। পাশ ফিরে শুল।

"পরের দিন দুপুরে লোকটির জ্বর এল। সাইলকে বললাম, 'সাইল, তুমি এর পাশে বোসো। আমি বৈদ্যর কাছে যাচ্ছি।'

বৈদ্যকে পেলাম না। কোনও রোগীর বাড়িতে গেছেন।

"সন্ধের দিকে জ্বর বাড়ল। আমি সাইলকে বসিয়ে রেখে বৈদ্যর কাছে গেলাম। জ্বর শুনে বৈদ্য বললেন, 'লক্ষণটা ভাল নয়। তবু আমার সাধ্যমতো করছি।' একটা ওষুধ তৈরি করে দিলেন। তিনটি বড়ি।

ফিরে এসে লোকটিকে একটা বড়ি খাওয়ালাম।

সন্ধের পর জ্বর বোধ হয় একটু কমল।"

"আমি আবার কোমরে ফেট্টি থেকে চেপে চেপে একটু কাপড় ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে কপালে দিতে লাগলাম। লোকটির বোধ হয় ভাল লাগল। চুপ করে শুয়ে রইল।

"গভীর রাত তখন। সাইলকে বললাম, 'তুমি ভাই লোকটির কপালে আমার এই জলেভেজা ন্যাকড়াটা চেপে-চেপে লাগাও। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। দু'রাত টানা ঘুমোতে পারিনি।'

"সাইল লোকটির কাছে বসল। কপালে জলপট্টি দিতে লাগল। আমি একপাশে শুয়ে কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

"যখন ঘুম ভাঙল তখন শেষ রাত। দেখলাম সাইলও লোকটির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। আমি সাইলকে আস্তে ধাক্কা দিয়ে ওর ঘুম ভাঙালাম। পরে ভেবে দেখেছি সাইলের ঘুম না ভাঙানোই উচিত ছিল। সাইল উঠে বসল।

"তখনই দেখি লোকটা কী যেন বলছে। আমি লোকটার মুখের কাছে কান পাতলাম। লোকটা বলছে, ভাই তুমি কে জানি না। কিন্তু আমাকে সুস্থ করে তুলতে যা কষ্ট স্বীকার করেছ তার জন্য আমি তোমার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ রইলাম।"

'ওসব নিয়ে ভাববেন না। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন এটাই আমি চাই।' লোকটি একটু দম নিল। তারপর আস্তে-আস্তে বলতে লাগল, 'আমি তোমাকে রাজা হুনাকমিনের গোপন ধনভাণ্ডারের হদিস দেব।'

'ঠিক বুঝলাম না।' আমি বললাম।

'বলছি সব, তা হলেই বুঝতে পারবে।' একটু দম নিয়ে লোকটি বলতে লাগল রাজা হুনাকমিনের আমলের কথা। 'আমার প্রপিতামহ রাজা হুনাকমিনের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মৃত্যুর আগে রাজা আমার প্রপিতামহকে একটা নকশা দিয়ে যান। আমাদের পারিবারিক গয়নাগাঁটি যে বাক্সটায় থাকত প্রপিতামহ সেই বাক্সে নকশাটা রেখে দিয়েছিলেন। আমার পূর্বপুরুষের হাতে হয়তো নকশাটা পড়েছিল কিন্তু তাঁরা এটার গুরুত্ব দেননি। ধরে নিয়েছিলেন এটা উদ্ভট কিছু।' লোকটি থামল।

'আপনার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। এখন কথা বলবেন না।' আমি বললাম।

'উপায় নেই, এখনই বলতে হবে। মৃত্যু আমার শিয়রে।' একটু থেমে দম নিয়ে লোকটি বলতে লাগল, 'একদিন মা ওই বাক্সটা খুলে কী গয়নাটয়না বোধহয় খুঁজছিলেন। তখন আমি ওখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখনই আমার নজরে পড়ল নকশাটা। বেশ কৌতূহল হল। কী ওটা? আমি মাকে বলে নকশাটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলাম। আশ্চর্য! চিচেন ইতজার একপাশের ছবি। আমি মা'র কাছে নকশাটা চাইলাম।'

"তুই এটা নিয়ে কী করবি? মা বললেন।"

"আমার কাছে রেখে দেব। আমি বললাম।"

"কেন? মা বললেন।"

"জিনিসটা কী পড়ে দেখব। আমি বললাম।"

"এর আগেও তোর বাবা ঠাকুর্দারা এই নকশাটা দেখেছিলেন। তাঁরা কিছুই বুঝতে না পেরে রেখে দিয়েছিলেন। এখন তুই কি বুঝবি এসব?" মা বললেন।

"দেখি না চেষ্টা করে।" আমি বললাম।

"তা হলে নে তোর কাছে রাখ।" মা বললেন। লোকটি থামল। বেশ হাঁফাচ্ছে তখন। 'তারপর থেকে নকশাটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আমি বুঝেছিলাম এই নকশাটা কোনও গুপ্তধনের নকশা। সেই গুপ্তধন রাখা আছে চিচেন ইতজায়। এটাও বুঝলাম এই গুপ্তধন রাজা হুনাকমিনের।

"তারপর?" ফ্রান্সিস বলল।

"আমি নকশাটা মিলিয়ে-মিলিয়ে চিচেন ইতজা মন্দিরের মধ্যে নানাভাবে খুঁজতে লাগলাম।" বয়স্ক লোকটি বলল।

"বুঝতে পারলেন কিছু?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ এটুকু বুঝলাম। চিচেন ইতজার ডানদিনের অংশটা আঁকা হয়েছে এখানে। চিচেন ইতজার দুটো গর্ভগৃহই তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কোথাও নকশার মিল পেলাম না।"

"লোকটি থামল। লোকটি মুখ হাঁ করে জল খেতে চাইল। আমি ঘরের কোণার দিকে রাখা মাটির জালা থেকে কাঠের গ্লাসে জল এনে দিলাম। লোকটি জল খেল।

"তারপর?" আমি বললাম।

"একটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে কাজে নামলাম। কিন্তু যুবকটি আমার সঙ্গে প্রতারণা করল। আমাকে ফেলে দিল। তাই আমার এই দশা। আমি তবু জলের কাছে পড়লাম। সেই যুবকটি ছিটকে পড়ল একেবারে পাথুরে চত্বরে। সঙ্গে-সঙ্গে মারা গেল।" একটু থেমে বলল, "আমি প্রায় হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে এখানে এলাম।"

"নকশাটা কোথায়?" আমি জানতে চাইলাম।

"লোকটি কোনও কথা না বলে কোমরের ফেট্টির দিকে হাত বাড়াল। ফেট্টিটা খুলতে চাইল।

"কিন্তু দুর্বল আঙুলে পারল না খুলতে। আমিই ফেট্টি থেকে টেনে টেনে নকশাটা বের করলাম। লোকটি ক্লান্তস্বরে বলল, "তোমাকেই দিলাম। দ্যাখো চেষ্টা করে যদি রাজা হুনাকমিনের গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারো।" একটু থেমে বয়স্ক লোকটি বলতে লাগল, "নকশাটা আমি আমার ফেট্টি জড়িয়ে রাখলাম। 'এতক্ষণে আমি দেখলাম সাইল আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ও সব দেখেছে, শুনেছে। গুপ্তধনের লোভে ও এখন আমাকে খুন পর্যন্ত করতে পারে। আমি সাবধান হলাম। সাইলকে কখনও দৃষ্টির বাইরে যেতে দিলাম না।'

"বাইরে সূর্য উঠল। পাখপাখালির ডাক শোনা গেল। ভোর হয়েছে। লোকটি কাঁপা-কাঁপা হাতে আমার হাত দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। তারপর মাথাটা এপাশ-ওপাশ করতে-করতে মারা গেল। আমি কেঁদে ফেললাম।"

আলফান্‌সো থামল। সকলেই চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস বলল, "আলফান্‌সো, তোমার নকশাটা একটু দেখতে পারি?"

"তা দেখাচ্ছি। তবে তোমরা তিনজন। জোর করে আমার নকশাটা নিয়ে নিতে পারো।"

ফ্রান্সিস বলল, "আমাদের কি এতটা খারাপ লোক বলে মনে হয়?"

"না, না।" আলফান্‌সো বলল, "আমার কোমরের ফেট্টিতে সেলাই করে রেখেছি। সাবধানে খুলতে হবে।"

শাঙ্কো ওর ছোরাটা বের করল। আলফান্‌সো চমকে উঠল। ফ্রান্সিস হেসে বলল, "আমাদের এখনও বিশ্বাস করতে পারছ না?"

আলফান্‌সো আর কিছু বলল না। শাঙ্কো আলফান্‌সোর কোমরের ফেট্টিটা একটু আলগা করল। দেখল নকশাটা কাপড়ের সঙ্গে সেলাই করা। ও ছোরার মুখ দিয়ে সেলাই করা সুতোটা আস্তে-আস্তে কাটতে লাগল। শাঙ্কো সন্তর্পণে নকশাটা বের করল। ভাঁজ খুলে আস্তে আস্তে মেঝেয় মেলে ধরল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি এগিয়ে এল। নকশাটা দেখল। নকশাটা এরকম—

পাথরের দেওয়াল
নীচে
গর্ভগৃহ
নীচে
গর্ভগৃহ
নীচে
প্রহরীর ঘর

ফুল লতাপাতার মিলে
নৃত্যরত হরিণ
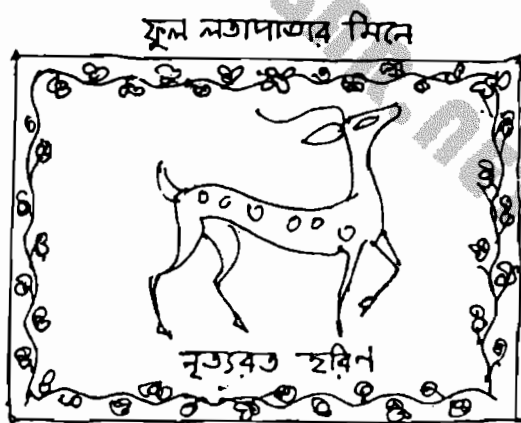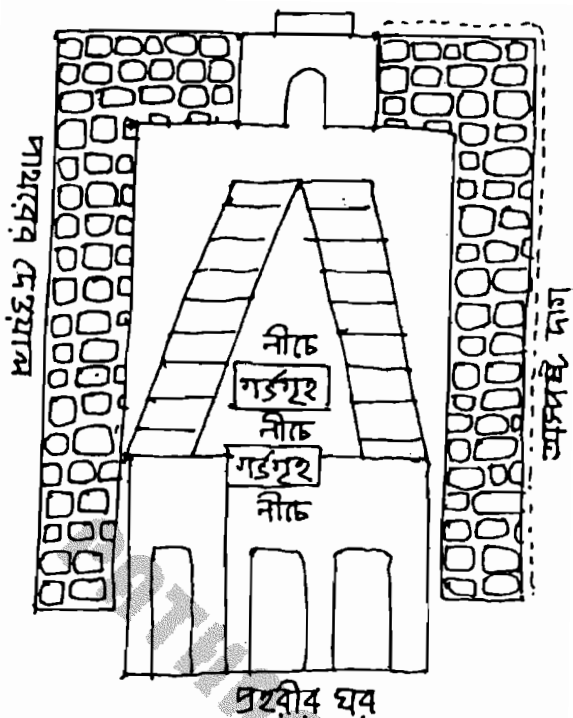
ফ্রান্সিস আর হ্যারি বেশ কিছুক্ষণ ধরে নকশাটা দেখল। তারপর ফ্রান্সিস বলল, "আচ্ছা আলফান্সো, তুমি তো চিচেন ইতজার দুটো গর্ভগৃহ দেখেছ?"

"হ্যাঁ, একটাতে রয়েছে নয়টি দেবমূর্তি। অন্যটায় রাজা হুনাকমিনের কাঠের কফিনের মতো।"

"তা হলে আরও একবার আমরা দেখব। কোন সূত্র পাই কি না দেখি।" ফ্রান্সিস বলল।

"বেশ।" আলফান্সো বলল।

"সেই লোকটি তোমাকে বলেছিল যে আমরা উঠছিলাম। উঠছিলাম মানে কোথায় উঠছিল?" ফ্রান্সিস বলল।

"হয়তো সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিল।" আলফান্সো বলল।

"সিঁড়ি দিয়ে উঠে মাথার দুটো ঘরে যাওয়া যায় না। নকশাটা দ্যাখো"

আলফান্সো নকশাটা ভাল করে দেখল। ঠিক। সিঁড়িটা অনেকটা উঠে নেমে গেছে গর্ভগৃহের দিকে। সিঁড়ির মাথা থেকে ঘর দুটো বেশ দূরে।

"তা হলে ওরা সিঁড়ি কোথায় পেল?" আলফান্সো বলল।

"হুঁ, ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।" হ্যারি বলল।

"যাকগে, আগে চিচেন ইতজা মন্দিরটা দেখি।" ফ্রান্সিস বলল।

"তা হলে ওই দুটো ছোট ঘরেই কি গুপ্তধন রাখা হয়েছে?" আলফান্সো বলল।

"এখনই সেটা বলা যাচ্ছে না। গিয়ে আগে ভাল করে সব দেখি।" ফ্রান্সিস বলল।

"তা হলে কি কালকেই চিচেন ইতজা যাবে?" হ্যারি বলল।

"হ্যাঁ আর দেরি করা চলবে না। বন্ধুরা আমাদের জন্য চিন্তায় পড়বে।" ফ্রান্সিস বলল।

আলফান্সো বুড়িমাকে বলল, "ওরা সকাল-সকাল চিচেন ইতজায় যাবে।"

বুড়িমা সকালের মধ্যেই রুটি সবজির ঝোল রেঁধে দিলেন। এদিকে আলফান্সোকে বুড়িমা কিছুতেই যেতে দেবে না। বুড়িমা কোন কথাই শুনবেন না। ফ্রান্সিস অনেক কথাটথা বলে চেষ্টা করল বুড়িমাকে শান্ত করতে। কিন্তু বুড়িমা নাছোড়বান্দা। সেই থেকে আলফান্সোর হাত ধরে রইলেন। এইবার হ্যারি এগিয়ে এল। বলল, "বুড়িমা, আলফান্সো আমাদের সঙ্গে না গেলে একটা খুব দরকারি কাজ হবে না। আপনি ওকে আটকালে ওর খুব ক্ষতি হবে।" বুড়িমা একটু শান্ত হলেন। আলফান্সোর হাত ছেড়ে দিলেন। হ্যারি বলল, "আপনি কিছু ভাববেন না। দিন চারেকের মধ্যেই আলফান্সোকে নিয়ে আপনার কাছে আসবো।" বুড়িমা আর কোন কথা বললেন না। আলফান্সো তলতেক ভাষায় অনুবাদ করে বুড়িমাকে বুঝিয়ে বলল। বুড়িমা আর কিছু বললেন না। তবে বারবার চোখ মুছতে লাগলেন।

রওনা হতে একটু বেলাই হল। ফ্রান্সিস বলল, "আলফান্সো একটা শস্যটানা গাড়ি পাওয়া যাবে?"

"খোঁজ করতে হবে।" আলফান্সো কয়েকটা বাড়ির দিকে গেল। এক কৃষকের বাড়ির বাইরে একটা ঘোড়ায় টানা শস্যটানার গাড়ি পেল। কৃষকের সঙ্গে কথাটথা বলে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল, "আমি তাকে অর্থ দিয়ে এসেছি। লোকটি একজন গাড়োয়ান দেবে বলেছে।" কিছু পরে একটা শস্যটানা গাড়ি চালিয়ে এক রোগাটে চেহারার গাড়োয়ান এল। ফ্রান্সিস বলল, "রোগাপটকা গাড়োয়ান কি চিচেন ইতজা পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবে?"

"যাক্‌গে, যা পাওয়া গেছে।" ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা গাড়িতে উঠল। গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়িটায় কিছু গমগাছের শুকনো পাতা ছড়ানো ছিল। ফ্রান্সিসরা তার ওপরই বসল।

গাড়ি চলল। একটা ঘোড়া আর কত জোরে গাড়ি টানবে? তাই টিকির-টিকির করে গাড়ি চলল।

দুপুর নাগাদ একটা বর্ধিষ্ণু গ্রামে এসে ওরা পৌঁছল। খিদেয় জলতেষ্টায় বেশ কাতর ফ্রান্সিসরা তখন। গাড়ি থেকে নেমে গ্রামের মধ্যে ঢুকল ওরা। এক বর্ধিষ্ণু কৃষকের বাড়ি পেল ওরা। ফ্রান্সিসদের কথা তো এখানে কেউ বুঝবে না। তাই আলফান্সো এগিয়ে গেল কৃষকের দিকে। ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে কী যেন বলল। কৃষকটি হেসে ফ্রান্সিসদের হাতছানি দিয়ে ডাকল। বাড়ির বাইরের ঘরটায় কৃষকের পিছু-পিছু ওরা ঢুকল। চুন-বালি মিশিয়ে কাঠের কাঠামোয় বাড়িটা তৈরি হয়েছে। ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকল। কাঠের পাটাতন পেতে চৌকি মতো করা। তাতেই বসল ওরা। কৃষকের একজন কাজের লোক দরজায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল, "আলফান্সো লোকটিকে খাবার জল আনতে বলো।"

একটু পরেই একটা বড় চিনেমাটির পাত্রে জল আনল লোকটি। ফ্রান্সিসরা চিনেমাটির বড় গ্লাসে জল খেল। এতক্ষণে তৃষ্ণা মিটল। কৃষক এসে আলফান্সোর সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বলতে লাগল।

কিছু পরে সেই কাজের লোকটি এসে কৃষককে কী বলল। কৃষক আলফান্সোকে কী বলল। আলফান্সো ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনারা ভেতর বাড়িতে খাবেন, না এই ঘরে খাবেন?"

"এখানেই খাব। আর বলো যে, খাবারটা তাড়াতাড়ি দেওয়া হোক।" কৃষক আলফান্সোর কাছে ফ্রান্সিসদের কথা বুঝে নিয়ে হেসে কী বলল। আলফান্সো বলল, "তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা হচ্ছে।"

কিছু পরে ফ্রান্সিসদের চিনেমাটির থালায় খেতে দেওয়া হল। কাটা রুটি, নানা আনাজ দিয়ে তৈরি তরকারি আর মাংস। খিদের জ্বালায় ফ্রান্সিসরা হাপুস-হুপুস খেতে লাগল।

খাওয়াদাওয়া শেষ হল। এবার চিচেন ইতজা যাওয়া। সবাই ঘোড়ায়-টানা গাড়িটায় উঠল। গাড়োয়ান গাড়ি ছাড়ল। মাটির ওপর ছোট ছোট পাথর ফেলে

রাস্তা তৈরি হয়েছে। ঝাঁকুনিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। একসময় হ্যারি বলল, "এর চাইতে হেঁটে গেলে ভাল হত।" প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে গাড়ি চলল।

সন্ধ্যা নাগাদ ওরা চিচেন ইতজা পৌঁছল। চিচেন ইতজা বেশ বড় নগর। রাস্তায় মানুষের ভিড়। দোকানপাটে কাচে ঢাকা আলো জ্বলছে। নগরটা বেশ সরগরম।

গাড়ি থেকে নেমে কেউ আর হাঁটতে পারছে না তখন। ঘাড়ে, কোমরে, পায়ে আড়ষ্ট ভাব। ফ্রান্সিস বলল, "আলফান্‌সো তোমার জানা শোনা কোন্‌ও সরাইখানা আছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন নিয়ে যাচ্ছি।" আলফান্‌সো বলল।

বড় রাস্তাটা ধরে চলল ওরা। কিছু দূর যেতে ডানদিকে সরাইখানাটা পাওয়া গেল। সরাইখানায় বেশ ভিড়। মালিক সামনে একটা কাঠের বাক্স রেখে বসে আছেন। আলফান্‌সো গিয়ে মালিকের সামনে দাঁড়াল। মালিক হেসে কী বলে উঠলেন। আলফান্‌সোও হাসল। দু'জনে কিছুক্ষণ হেসে হেসে নানা কথা বলল। ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না। এবার আলফান্‌সো ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে কী বলল। মালিক কী বললেন। মাথা নাড়লেন। আলফান্‌সো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল, "মালিক বলছে কালকে রাতে এখানে নাকি নাচ-গানের আসর বসবে। দূর দূর জায়গা থেকে মানুষজন এসেছে। সব সরাইখানা ভর্তি। তবে এই মালিকের ভাইয়ের একটা ছোট সরাইখানা আছে। ওটা একটু দূরে। ওখানে জায়গা পাওয়া যাবে।"

"তা হলে ওখানেই চলো।" ফ্রান্সিস বলল।

ওরা আলফান্‌সোর নির্দেশমতো চলল। রাস্তায় বেশ ভিড়। সেই ভিড় ছাড়িয়ে একটা ছোট গলিতে ঢুকল ওরা। কিছুটা যেতেই পেল সেই সরাইখানাটা। ফ্রান্সিস বলল, "আলফান্‌সো, ওই মালিকের ভাইকে জিজ্ঞেস করো তো কিসের উৎসব কালকে?"

আলফান্‌সো সরাইখানায় কাঠের আসনে বসা ভাইকে দেখল। আলফান্‌সো মালিকের ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলল। ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল "ভাই বলছে— চারজনের জায়গা হবে। কালকে পূর্ণিমা। বছরের এই দিনে এখানে নগরের একটু বাইরে কোপান নামের মাঠে এই উৎসব হয়। নাচ, গান, খানা চলে গভীর রাত পর্যন্ত।"

"ভালই হল। কালকের রাতটা আমরা কাজে লাগাতে পারব।" ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল।

"তা হলে কাল রাতেই গুপ্তধনের জন্য চেষ্টা করবে?" হ্যারি বলল।

"হ্যাঁ।" ফ্রান্সিস বলল।

"ঠিক বুঝলাম না।" হ্যারি বলল।

"শোনো, সেই আহত লোকটি বলেছিল, সিঁড়ি থেকে ও আর তার সঙ্গী এক যুবক ছিটকে পড়ছিল। কালকে চিচেন ইতজায় যেতে হবে। সারাদিন

ওখানেই থাকব। সব ভাল করে দেখতে হবে। একটা সূত্র নিশ্চয়ই পাব। সেটা ভেবে নিয়ে কাজে নামতে হবে।" ফ্রান্সিস বলল।

"গুপ্তধন আবিষ্কারের আগে রাজার সঙ্গে কথা বলে তাঁর অনুমতি নেবে না?" হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল, "হ্যারি, এই প্রথম আমি অন্যরকম ভাবছি। গুপ্তধনের হদিস খুঁজতে তো কয়েকদিন যাবে। তার মধ্যে উদ্ধার করা গুপ্তধন রাজাকে না দিয়ে কাকে দেওয়া যায় সেটা ভেবে দেখব।"

"এ তো চুরি হয়ে গেল ফ্রান্সিস।" হ্যারি বলল।

"না। যার খুবই প্রয়োজন তাকে দেব। তা হলে তো চুরির দায় নিতে হবে না।"

"দেখো ভেবে কী করবে।" হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস বলল, "হ্যারি শাঙ্কো চলো চিচেন ইতজা মন্দিরটা দেখে আসি।"

"এই অন্ধকারে?" শাঙ্কো বলল।

"আরে বাবা—প্রাথমিক ভাবে তো কিছু দেখা যাবে। কালকে সকালে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাব।" ফ্রান্সিস বলল।

"—বেশ চলো।" শাঙ্কো বলল।

আলফান্সো মালিককে গিয়ে বলে এল, "আমরা একটু শহর দেখতে বেরোচ্ছি। ফিরতে একটু দেরি হতে পারে। খাবার রাখবেন।"

চারজনে সরাইখানা থেকে বেরোল। বাইরে এসে দেখল, ভিড় অনেকটা কমেছে। চারজন চলল চিচেন ইতজা মন্দিরের দিকে। যেতে যেতে আলফান্সো বলল, "পূর্ণিমা রাতের উৎসবে যোগ দিতে দূরের নগর গ্রাম থেকে অনেক লোক এখানে আসে। সেইজন্যই এত ভিড়।"

চারজনে ইতজা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল। পূর্ণিমার আগের রাত। কাজেই উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চারদিক মোটামুটি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। উঁচু মন্দিরটায় জ্যোৎস্না পড়েছে। চূড়ো, সিঁড়ি, ঘরটা দেখা যাচ্ছে। ঢোকার মুখে দুটো পাশাপাশি ঘর। ঘর দুটোর সামনে দাঁড়িয়ে লোহার ফলা লাগানো বর্শা হাতে দু'জন প্রহরী। ফ্রান্সিস বলল, "আল্‌ফানসো, আমার সঙ্গে এসো।" আলফান্সো এগিয়ে এল। আলফান্সো মারফৎ ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল, "এটাই কি চিচেন ইতজার মন্দির?"

"হ্যাঁ। দেখেই তো বোঝা উচিত। এতবড় মন্দির এখানে কোথাও নেই।" প্রহরী বলল।

"ও। তা আমরা একটু ঘুরে দেখতে পারি?" ফ্রান্সিস বলল।

"না। রাতে কারও ঢোকার হুকুম নেই।" প্রহরী বলল।

"একটু দেখেই চলে আসতাম।" ফ্রান্সিস বলল।

"না।" প্রহরীর মুখে দাড়িগোঁফ। গোঁফ মুচড়ে বলল, "কাল সকালে এসো।"

"বেশ তাই আসব। তবে একটা কথা বলি, লোকে বলে এই মন্দিরে নাকি রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন আছে।"

"লোকে তো কত কথাই বলে।" প্রহরী বলল।

"আগে কি সেই গুপ্তধন খোঁজা হয়নি।" ফ্রান্সিস বলল।

"হয়েছে। আগের দু'জন রাজার মন্ত্রী আর সেনাপতি রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন খুঁজেছিলেন।"

"পায়নি।" ফ্রান্সিস বলল।

"না, না।" প্রহরী মাথা এপাশ ওপাশ করে বলল।

"তাঁরা কোথায় খুঁজেছিলেন?"

"এই মন্দিরেই খুঁজেছিলেন। এতসব জানতে চাইছেন কেন?" প্রহরী বলল।

"আমরা বিদেশী।" ফ্রান্সিস বলল।

"সে তো চেহারা আর পোশাকই বলছে।" প্রহরী বলল।

"দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই আমরা। এমনই সব গুপ্তধন-টুপ্তধনের কথা শুনলে খুঁজিটুজি।" ফ্রান্সিস বলল।

"তা হলে তো রাজার অনুমতি নিতে হবে।" প্রহরী বলল।

"সেসব আমরা করব।" ফ্রান্সিস বলল।

"রাজার অনুমতি নিয়ে এসো। যদি অনুমতি পাও তখন জানতে পারবে আগে কারা কীভাবে গুপ্তধন খুঁজেছিলেন।" প্রহরী বলল।

"তা তো বটেই। আচ্ছা ভাই, তোমাদের অনেক ধন্যবাদ।" ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় ফিরে এল। ফ্রান্সিস শুকনো ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। হ্যারি, শাঙ্কো আর আলফান্সো বসল। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস, আমরা বিদেশী, গুপ্তধন খুঁজে বের করি—এসব ওই প্রহরীদের বলা ঠিক হয়নি।"

ফ্রান্সিস বলল, "হ্যারি, আমি প্রথম থেকেই ভেবে রেখেছি যে, রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন খুঁজে পেলে এখানকার রাজাকে জানাব না। সেই গুপ্তধন আমরা কিছু নেব। বাকিটা কী করব, এখনও ভেবে ঠিক করতে পারিনি। কাজেই প্রহরীরা আমাদের সম্বন্ধে কী ভাবল না ভাবল এ ব্যাপারে আমি বেপরোয়া। কারণ ওই প্রহরীদেরই বন্দি করে আমরা গুপ্তধন খুঁজব। কাজেই ভুল আমি করিনি। বরং একটা কাজের কথা আমরা জানলাম ইতিপূর্বে অতীতের এক রাজা ও এক মন্ত্রী গুপ্তধন খুঁজেছিলেন। তাঁরাও ভেবেছিলেন গুপ্তধন এই মন্দিরেই আছে। কীভাবে তাঁরা গুপ্তধন খুঁজেছিলেন এটা জানা গেল না। তবু কয়েকবার খোঁজা হয়েছে। তার মানে গুপ্তধন সহজে পাওয়া যাবে না। নানাভাবে চেষ্টা করতে হবে। প্রহরীদের সঙ্গে কথা বলে এইটুকু লাভ হল আমাদের।"

"তা হলে এবার গুপ্তধন পেলে তা চুরি করবে?" হ্যারি বলল।

"হ্যাঁ। মণিমাণিক্য সোনাদানা যা পাব সব বিক্রি করব। আর একটু আগেই তো বললাম সেই অর্থ আমরা কীভাবে ভাগ করব।"

"অর্ধেক গুপ্তধন নিয়ে কী করবে তুমি?"

"আমাদের আর্থিক সমস্যা মেটাবো। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের রাজাকে দেব।"

"ঠিক আছে।" হ্যারি বলল। আড়মোড়া ভেঙে শাঙ্কো বলল, "ফ্রান্সিস, ভীষণ খিদে পেয়েছে। ঘুমও পেয়েছে। চলো খাওয়াটা সেরে আসি।"

"বেশ চলো।" ফ্রান্সিস বলল।

পাশের ঘরটা খাবার ঘর। ফ্রান্সিসরা এসে দেখল সরাইখানায় যারা আশ্রয় নিয়েচে তারা অনেকেই খেতে বসেছে। ফ্রান্সিসরা একপাশে বসল। সরাইখানার লোকে ফ্রান্সিসদের সামনে বেশ বড় গোল শুকনো পাতা রেখে গেল। এবার খাবার দেওয়া হতে লাগল। ফ্রান্সিসরা খিদের জ্বালায় গোগ্রাসে খেতে লাগল।

খাওয়াদাওয়া সেরে ফ্রান্সিসরা নিজেদের জায়গায় এল। হ্যারি, শাঙ্কো শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বসে রইল। আলফান্‌সোকে বলল, "আলফান্‌সো, ঘুমিয়ে পড়ো না তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

আলফান্‌সো কিছু বুঝল না। উঠে বসে রইল।

একটু পরে ফ্রান্সিস ডাকল, "আলফান্‌সো।"

—"বলুন।" আলফান্‌সো বলল।

—"আমি তোমার সম্বন্ধে সব কথা জানতে চাই। আমাকে মিথ্যে বলবে না। যা সত্য তাই বলবে।" ফ্রান্সিস বলল।

—"বেশ, কিন্তু কী ব্যাপারে—মানে—" বলতে গিয়ে আলফান্‌সো থেমে গেল।

—"বলছি।" ফ্রান্সিস বলল। তারপর একটু থেমে বলল, "তোমার দেশের বাড়ির অবস্থা কেমন?"

—"অবস্থা বলতে কী বোঝাচ্ছেন?" আলফান্‌সো বলল।

—"আর্থিক অবস্থা। তুমি সব ছেড়েছুড়ে জাহাজে চাকরী নিলে কেন?" ফ্রান্সিস বলল।

—"সে অনেক কথা ফ্রান্সিস।" আলফান্‌সো বলল।

—"শুনুন তাহলে", আলফান্‌সো আস্তে আস্তে বলতে লাগল, "খুব দরিদ্রের ঘরে আমার জন্ম। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়ে ছিলাম। আমার কোনও ভাইবোন ছিল না। আমি আর বাবা থাকতম লিসবন বন্দরের কাছে ঘুপচি ঘরে। বাবা সেই ভোরে উঠে দু'জনের রান্না করত। নিজের ভাগের খাবার খেয়ে চলে যেত আর আমি সারা সকাল সারা দুপুর রাস্তায়, ডকে খেলে বেড়াতাম।" আলফান্‌সো থামল। তারপর বলতে লাগল, "বাবা কাজ করতেন বন্দর এলাকায়। মালপত্র ওঠানো নামানোর কাজ। বড় পরিশ্রমের কাজ। সন্ধ্যের মুখে কাজ থেকে ফিরে এলে বাবার ক্লান্ত মুখখানা দেখতাম। বাবা তখন মড়ার মত শতচ্ছিন্ন বিছানায় শুয়ে থাকত। রাতে আর রান্না হত না। দোকান থেকে একটা বড় রুটি আর ঝোল কিনে আনতাম। তাই খেয়ে রাত কাটত।" আলফান্‌সো একটু চুপ করে থেকে বলল—"এমনিতে আমি দুঃখটুঃখ

খড় একটা গায়ে মাখতাম না। কিন্তু সমবয়সী ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে দেখলে আমার ভীষণ মনখারাপ হয়ে যেত। ধরে নিতাম পড়াশুনা আমার কপালে নেই।" আলফান্সো চুপ করে রইল। তারপর বলতে লাগল, "একদিন বাবা কাজ থেকে ফিরে বললেন,

—"কালকে তোকে স্কুলে ভর্তি করে দেব। কী? পড়াশুনা করবি তো?"

আমি বললাম, "বাবা প্রতি মাসে স্কুলের মাইনে দিতে গেলে তো আমাদের একবেলা উপোস করে থাকতে হবে।"

—"না রে। জাহাজের এক মালিক আমার কাজকর্ম দেখে খুশি হয়ে বেশ কিছু অর্থ আমাকে দিয়েছে। অন্তত বছর কয়েক তোর পড়াশুনা চালাতে পারব। আমি একটু বিশ্রাম করে নিই। তারপর তোকে পণ্ডিত কস্টিল্লোর কাছে নিয়ে যাব।" আলফান্সো থামল। তারপর বলতে লাগল, "সন্ধ্যের একটু পরে বাবা আমাকে নিয়ে কস্টেল্লোর কাছে গেলেন। কস্টেল্লো বললেন, "তোমার ছেলেকে ভর্তি করে নেব। কিন্তু ও তো রাস্তায় রাস্তায় খেলে বেড়ায়, পড়াশোনা করবে কখন?" বাবা আমার দিকে তাকালে। বাবা কিছু বলার আগে আমি বললাম, "স্কুলে ভর্তি হলে আমি আর এভাবে ঘুরে বেড়াব না। সব ছাত্রের মতো আমিও পড়াশোনা করব।" একটু থেমে আলফান্সো বলতে লাগল, "স্কুলে ভর্তি হলাম। খুব মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করলাম। মাস কয়েক পর ক্লাসের পরীক্ষার ফল বেরোল। আমি সেই পরীক্ষায় প্রথম হলাম। বাবা তো আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরে রইলেন। পড়াশোনায় আমার উন্নতি দেখে পণ্ডিত কস্টেল্লো আমাকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন। বছরচারেক পড়তে পেরেছিলাম, হঠাৎ একদিন বাবা মারা গেলেন। আর পড়াশোনা হল না। দু'বেলা খাবারই জোটে না—এই অবস্থা।"

একটু চুপ করে থেকেআলফান্সো বলতে লাগল, "একদিন সকালে আমার জামাটামা বইটই সব পোঁটলা বেঁধে জাহাজঘাটায় এলাম। এ জাহাজে সে জাহাজে কাজ খুঁজতে খুঁজতে একটা জাহাজ পেলাম। সেখানে জাহাজ ধোয়ামোছা রান্নাঘরে কাজে সহায়তা করা এসব কাজের চাকরি পেলাম। সেই জাহাজ দেশ বিদেশের মালপত্র আমদানি রফতানির কাজ করে। কত দেশে ঘুরলাম। তারপরের কথা তো বলেছি।"

ফ্রান্সিস বলল, "আলফান্সো, যেসব পড়ার বই নিয়ে বেরিয়েছিলে সে সব বই আর আছে?"

—"হ্যাঁ, বুক দিয়ে আগলে রেখেছি সেসব বই। জাহাজ যখন দেশে ফিরে আসতো তখন আরও বই কিনতাম। সব আছে।" আলফান্সো বলল।

—"কিন্তু সেসব বই রেখে কী হবে?" ফ্রান্সিস বলল।

—"যদি কখনও সুযোগ পাই, কিছু বেশি অর্থ জমাতে পারি তো দেশে ফিরে একটা স্কুল খুলব বন্দর এলাকায়। স্থানীয় দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করব।" আলফান্সো বলল।

—"পারবে স্কুল চালাতে?" হ্যারি বলল।

—"নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু অর্থাভাব বেশি হলে হাল ছেড়ে দিতে হবে। আমার সেই ভয়। আমি তো ভিখিরি।" আলফান্‌সো বলল।

—"তুমি সব পাবে, অর্থ সাহায্য ভবিষ্যতের জন্যে অর্থ ও নিরাপত্তা মানে কেউ তোমাকে বাধা দেবে না—তুমি নিশ্চিন্তে তোমার খুশিমতো তোমার কাজ করে যাবে।" ফ্রান্সিস বলল।

—"তাহলে তো আমি—মানে—আমি আমার সমস্ত জীবন শিক্ষাদানে ব্যয় করব।" আলফান্‌সো বলল।

—"ঠিক আছে। তুমি প্রয়োজনে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য পাবে। কিন্তু তোমাকে স্কুল করতে হবে তোমার দেশে নয়, এখানে।" ফ্রান্সিস বলল।

—"এখানে!" আলফান্‌সো অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বলল, "হ্যাঁ এখানে তুমি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তোমার মাতৃভাষা স্পেনীয় ভাষা শেখাবে। তলতেক ভাষা তুমি ভালই শিখেছ। সেই ভাষার লিখিত রূপ দেবে। সেই ভাষায় বই লিখবে—কী? পারবে তো?"

আলফান্‌সো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মাথা নিচু। তারপর মাথা তুলল। ফ্রান্সিস দেখল আলফান্‌সোর চোখে জল। আলফান্‌সো কান্নাভেজা গলায় বলল, "ছেলেবেলা থেকেই আমার স্বপ্ন আমি শিক্ষকতা করব। ভাবিনি কোনওদিন সেই স্বপ্ন সার্থক হবে।"

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। বলল, "আলফান্‌সো ঘুমোও। রাত হয়েছে।"

আলফান্‌সো শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম আসছে না। ফ্রান্সিসের সাহায্য পেলে ও সবকিছু করতে পারবে। কিন্তু ফ্রান্সিস কী সাহায্য করবে তা বলেনি। একটু বেশি রাতে আলফান্‌সো ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন একটু সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া সারল ফ্রান্সিসরা। তারপর চলল চিচেন ইত্‌জার মন্দিরে। মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। প্রহরী দু'জন বর্শা হাতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকজন ঢুকছে বেরোচ্ছে অবাধে। প্রহরী দু'জন কাউকে বাধা দিচ্ছে না।

ফ্রান্সিসরাও ঢুকল। সামনেই সিঁড়ি বেয়ে উঠল ওরা। সিঁড়ি অনেকটা উঠে নীচে নেমে গেছে। ফ্রান্সিস সেখানে এসে আলফান্‌সোকে বলল—"তুমি তো নীচের গর্ভগৃহ, নয় রাত্রির দেবতার মূর্তি, রাজা হুনাকমিনের কফিন সবই দেখেছ।"

—"হ্যাঁ, সে সব আমি আপনাদের বলেছি।" আলফান্‌সো বলল।

—"কিন্তু সেসব জায়গায় কোথাও রাজা হুনাকমিনের গুপ্ত ধনসম্পদ গুপ্তভাবে রাখা আছে এমন কিছু লক্ষ্য করো নি?" ফ্রান্সিস বলল।

—"ন্নাঃ! দ্যাখো এত লোকজন প্রতিদিন ওইসব গর্ভগৃহে যাচ্ছে কারও না কারও নজরে নিশ্চয়ই কিছু পড়তো।" আলফান্‌সো বলল।

—"হুঁ।" ফ্রান্সিস সিঁড়িটা যেখানে বাঁক নিয়ে নীচে নেমে গেছে সেখানটায় দাঁড়াল। চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মন্দিরের মাথায় রয়েছে দুটো কুঠুরি। একটা বড় তার ওপর আর একটা ছোট। এখান থেকে এই দুটো কুঠুরির দূরত্ব হবে ন'দশ হাত। কাজেই এখান থেকে ওই কুঠুরি দুটোয় যাওয়া অসম্ভব। কাজেই সেই প্রৌঢ় লোকটি তাদের দু'জনের সিঁড়ি থেকে ছিটকে পড়ার কথা বলেছিল সেই সিঁড়ি এই সিঁড়ি নয়। কিন্তু অন্য কোনও সিঁড়ি ফ্রান্সিসের চোখে পড়ল না। তারা কোন সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল? ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে লাগল। বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেও লাগল। তখনই দেখল মন্দিরের একপাশে চুনাপাথর বালি এসব দিয়ে গাঁথা একটা পাথরের দেওয়াল। দেওয়ালটা উঠে গেছে একবারে মন্দিরের মাথার কাছে। সেই দেওয়াল থেকে দুটো অংশ সোজা বেরিয়ে ওই দুটো কুঠুরির নীচে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওপাশেও একটা দেওয়াল উঠেছে। তারও একটা অংশে গিয়ে মিশেছে কুঠুরি দুটোর নীচে। ফ্রান্সিস বুঝল ওই দুটো বর্ধিত অংশ দুটো কুঠুরি দুটোর ভারসাম্য রক্ষা করছে? কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওই কুঠুরি দুটোয় যাওয়া। মিস্ত্রিরা কী করে অত উঁচুতে উঠে গিয়ে কুঠুরি দুটো তৈরি করেছিল? নিশ্চয়ই কুঠুরিতে যাওয়ার জন্য কোনও উপায় ছিল। ফ্রান্সিস ভাল করে দেখল। দু'পাশ থেকে দুটো পাথরের টানা দেওয়াল। তার ওপরেই ওই দুটো কুঠুরি। তা হলে পাথরের দেওয়ালের মাথা থেকে ওই টানা পর্যন্ত উঠতে হবে। তারপর টানা ধরে যেতে হবে ওই কুঠুরিতে। রাজা হুনাকমিনের ধনসম্পদ কি ওখানেই গোপনে রাখা হয়েছে? কিন্তু ওখানে যাওয়ার কোনও উপায়ই তো নেই।"

ফ্রান্সিস বলল, "হ্যারি, আমি একটু চারদিক ঘুরে দেখছি। তোমরা এখানেই থাকো।"

শাঙ্কো বলল, "না ফ্রান্সিস তোমাকে একা ছাড়ব না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

—"বেশ চলো।" ফ্রান্সিস বলল।

খাওয়ার পরে ফ্রান্সিসরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল। তারপর ফ্রান্সিস সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। মন্দিরটার চারদিক একবার ঘুরে এল। কিন্তু কোনও সিঁড়ি পেল না। অথচ সেই বয়স্ক লোকটি বলেছিল এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে সঙ্গী তাকে ধাক্কা মেরেছিল। ছিটকে পড়ে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে পড়ে যুবকটিও মারা যায়।

ফ্রান্সিস মন্দির থেকে কিছুটা দূরে সরে এল। শাঙ্কোও এল। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে নকশাটা বের করল। মন্দিরের সঙ্গে মেলাতে লাগল। দেখল সবই মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ওরা কীভাবে ওঠবার চেষ্টা করেছিল তার কোনও নির্দেশ নকশাটায় নেই। ফ্রান্সিস নকশা দেখিয়ে শাঙ্কোকে সেই কথা বলল। তারপর নকশাটা শাঙ্কোকে দিয়ে বলল, "দ্যাখো তো, ওপরের কুঠুরিদুটোতে যাওয়ার কোনও নির্দেশ নকশাটায় আছে কি না।"

"হ্যারি থাকলে ভাল হত। ও পারত। আমি অতশত বুঝি না। হ্যারিকে ডেকে আনছি।" শাঙ্কো চলে গেল। ফ্রান্সিস নকশাটা দেখতে লাগল। এখানে লোকজনের ভিড় কম।

হ্যারি এল। নকশাটা হাতে নিল। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ হ্যারি বলে উঠল, "ফ্রান্সিস, দ্যাখো তো এটা কিসের দাগ?"

"দাগ? দেখি তো।" ফ্রান্সিস নকশাটা হাতে নিল। হ্যারি ডান দিকের দেওয়ালের গা ঘেঁষে একটা খুব অস্পষ্ট রেখা দেওয়ালের গায়ে গায়ে ওপরের দিকে উঠে গিয়ে বাঁ দিকে বেঁকে কুঠুরি দুটোয় গিয়ে শেষ হয়েছে।"

হ্যারি বলল, "এই রেখাটার অর্থ বুঝতে পারলে?"

"না।" ফ্রান্সিস ভাবতে ভাবতে বলল।

"এটার অর্থ হল দেওয়াল ধরে ধরে ওপরে উঠতে হবে।"

ফ্রান্সিস বলে উঠল, "হ্যারি, এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। দেওয়ালের পাথর ভেঙে ভেঙে সিঁড়ির মতো করে আস্তে আস্তে উঠে যেতে হবে। শেষে বাঁদিকে গিয়ে ওই কুঠুরি দুটোয় ঢুকতে হবে। আমি নিশ্চিত ওই কুঠুরি দুটোতেই রয়েছে রাজা হুনাকমিনের গুপ্ত ধনভাণ্ডার। ওই বয়স্ক লোকটি এইভাবে বানানো সিঁড়ির কথাই বলেছিল।"

"এবার কী করবে?" শাঙ্কো বলল।

"চলো ডানদিকের দেওয়ালটা ভাল করে দেখা যাক।" ফ্রান্সিস বলল।

দু'জনে ডান দিকের দেওয়ালের কাছে এল। দেখল দেওয়ালের বেশ কিছু উঁচু পর্যন্ত জংলা গাছপালায় ঢাকা। ফ্রান্সিস গাছটাছ সরাল। দেখল—দেওয়ালের গোড়া থেকে বেশ কিছু উঁচু পর্যন্ত এক হাত অন্তর অন্তর ভাঙা খোঁদল। ওই খোঁদলগুলোয় পা রেখে রেখে অনায়াসে ওপরে ওঠা যায়। সিঁড়ির মতো। ওই বয়স্ক লোকটি এই সিঁড়ির কথাই বলেছিল।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল, "শাঙ্কো, সরাইখানার মালিকের কাছ থেকে হাতপাঁচেক শক্ত দড়ি নিয়ে এসো তো।" শাঙ্কো মালিকের কাছে গেল। বেশ লম্বা দড়ি নিয়ে এল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর ছোরাটা দিয়ে দড়িটা দু'টুকরো করল। রেখে দিল।

"কখন যাবে?" হ্যারি বলল।

"সন্ধের পরে। সারারাত সময় পাব। তবু কাজটা দ্রুত করতে হবে।" ফ্রান্সিস বলল।

"ফ্রান্সিস, আগে যেমন গুপ্তধন উদ্ধারের আগে সেই রাজ্যের রাজার সম্মতি নিতে, এবার কিন্তু তা করছ না।" শাঙ্কো বলল।

"উপায় নেই শাঙ্কো। এভাবে বলতে গেলে রাজা আমাদের কয়েদঘরে ঢোকাতে পারে। কাজেই এবার সেসব না করে লুকিয়ে গোপনে গুপ্তধন উদ্ধার করব।"

ফ্রান্সিসরা সকলে সরাইখানায় ফিরে আসছে তখনই দেখল ঘোড়ার গাড়িতে লোকজন শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পায়ে হেঁটেও চলে যাচ্ছে অনেকে। ফ্রান্সিসরা অবাক। একজন লোককে হ্যারি ধরল। বলল—ভাই আপনারা চলে যাচ্ছেন কেন? লোকটি বলল—রাজকুমারের অসুখ। রাজকুমার সম্পূর্ণ সুস্থ হলে তবেই পূর্ণিমা উৎসব হবে।

ফ্রান্সিস হ্যারিদের দিকে তাকিয়ে বলল, পূর্ণিমা উৎসব এখন বিশ বাঁও জলে। কবে রাজকুমার সম্পূর্ণ সুস্থ হবে কে জানে? ততদিন উৎসব বন্ধ।

ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় এল। সরাইখানার মালিক বলল—দেখুন কী কাণ্ড। রাজকুমারের অসুখ করেছে সব উৎসব বন্ধ। হ্যারি বলল—এই পূর্ণিমা উৎসব কতদিন হয়ে আসছে?

—অনেকদিন থেকে। দু'তিনদিন ধরে উৎসবের জায়গা সাজানো হয়। বেশ বড় মঞ্চও হয়। রাজকুমার রাজকুমারীকে নিয়ে রাজরাণী আসেন। সারারাত ধরে গানবাজনা নাচ চলে। দর্শক শ্রোতারা যেন পাগল হয়ে যায়। কী আনন্দ। কী উল্লাস। এখন সব গেল। কবে রাজকুমার সুস্থ হবে। কবে পূর্ণিমা উৎসব হবে সেসব ঝুলে গেল।

সরাইখানাগুলো ফাঁকা হয়ে গেল। কত লোক চলে গেল। এইসময় সরাইখানাগুলো। কত অর্থ লাভ করে। এখন কী হবে কে জানে।

ফ্রান্সিসরা ঘরে এসে টানা বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস পড়তে পড়তে মৃদুস্বরে বলল—'হ্যারি আজকের উৎসবের দিনটাতেই ভেবেছিলাম কাজে নামবো—সব পিছিয়ে গেল।

—দিনটা ভালোই বেছেছিলে। কিন্তু তুমি কি নকশাটার অর্থ বের করতে পেরেছো। হ্যারি বলল।

—প্রায়। এখন নকশার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা। তখনই বুঝবো আমি নকশার অর্থটা ঠিক বুঝেছি কি বুঝিনি। কাজটা শুরু করলেই বুঝবো আমি নকশার নির্দেশ বুঝলাম কি বুঝলাম না।

—তাহলে এখন তুমি কী করবে?

—এই সরাইখানাতেই থাকবো। যতদিন না রাজপুত্র সুস্থ হয় ততদিন।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের কথা শুনছিল। এবার বলল—আচ্ছা ফ্রান্সিস তুমি পূর্ণিমা উৎসবের রাতটাই বেছে নিতে চাইছো কেন?

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—নকশার নির্দেশ অনুযায়ী দেয়ালের পাথর ভাঙতে হবে। কিন্তু সব পাথর একই সময় ভাঙা হবে না। আস্তে আস্তে ভাঙতে হবে। নকশাটা তো এখন বের করা চলবে না। অন্য সময় তোমাকে নকশা থেকে বুঝিয়ে দিতাম মন্দিরের ওপর দিকের ঘর দুটোও দেখতে হবে। ঘর দুটো প্রায় ঝুলে আছে। কাজ শুরু করলেই মনে হয় ভেঙে পড়বে। কাজেই পাথরভাঙা ঘর ভেঙে পড়া এত শব্দ ধারেকাছের লোকজনের কানে যাবেই।

উৎসবের দিন বাড়িতে বড় কেউ থাকবে না। সবাই তখন নাচগানের উৎসবে। কাজেই তখন কারও কিছু কিছু ভাঙাটাঙার কাজ চালানো যাবে। তাই পূর্ণিমা উৎসবের রাতটাকেই বেছেছি। সবদিক থেকে সুবিধাজনক। এখন সমস্ত কাজই পিছিয়ে গেল।

—সাবাস ফ্রান্সিস। সমস্ত ব্যাপারটাই সহজে বুঝিয়ে দিলে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—শাঙ্কো আমার কথাটাতো জানো—শুধু কব্জির জোরে লড়াই হয় না বুদ্ধির জোরও লাগে।

ফ্রান্সিসরা ফিরে আসছে। রাস্তায় দেখল ঘোড়ায়টানা গাড়িতে বোঝাই হয়ে লোকজন নগর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দু'একজন কাঁদছেও। সত্যিই তো অনেক আশা করে এসেছিল—নাচগান দেখবে শুনবে সারারাত আনন্দ করবে ফূর্তি করবে। সব বন্ধ হয়ে গেল। এখন রাজপুত্রের সুস্থ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে থাকা। দূর দূর জায়গা থেকে লোকজন এসেছিল। আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে সবাই ফিরে যাচ্ছে নিজের ঘরবাড়িতে।

ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় দেওয়া ঘাসের বিছানায় আধশোয়া হয়ে কথা বলছিল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এখন তো বেশ কয়েকদিন বেকার হয়ে বসে থাকতে হবে। কিছুই করবার নেই। তারপর বলল—আচ্ছা ফ্রান্সিস রাজপুত্রের চিকিৎসার জন্যে আমরা তো আমাদের চিকিৎসক ভেনকে নিয়ে আসতে পারি। ফ্রান্সিস বলল—সম্ভাবনা নয়। এখন তুলামে গিয়ে জাহাজঘাটায় নোঙর করা আমাদের জাহাজে যেতে হবে। ভেনকে এতটা পথ নিয়ে আসতে হবে। ততদিনে হয়তো রাজপুত্রের অসুখ বেড়ে গেল। অবশ্য দুটো ঘোড়া পেলে আমি দু'একদিনের মধ্যেই ভেনকে নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু ভুলে যেও না হ্যারি—আমরা বিদেশী। রাজা আমাদের বিশ্বাস করবে না। ভেনকে চিকিৎসা করতে দেবে না। কাজেই আমরা আগ বাড়িয়ে কিছু করবো না। আমাদের কোন সমস্যার সৃষ্টি করবো না। হ্যারি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—তুমি ঠিকই বলেছো। আসলে আমি চাইছিলাম রাজকুমারের সুচিকিৎসা হোক রাজকুমার দ্রুত সুস্থ হোক। ভেন সেটা পারবে?

শাঙ্কো বলল—রাজবৈদ্য নিশ্চয়ই আছে। তিনিই চিকিৎসা করুন। রাজা বিদেশী ভেনকে চিকিৎসা করতে অনুমতি দেবে না। কাজেই সে চেষ্টা না করাই ভালো।

ফ্রান্সিসরা এসব কথাবার্তা বলছে তখন সরাইখানার মালিক ঘরে ঢুকল। বলল—রান্না হয়ে গেছে। আপনারা খেতে বসুন। ফ্রান্সিস তড়াক করে উঠে বসল। বলল—হ্যারি ভীষণ খিদে। আর রাত করবো না। খেতে বসো। ফ্রান্সিসরা বসে পড়ল। মালিক আর দুটো মোম জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। পরিচারক এসে ফ্রান্সিসদের সামনে গোল গোল শুকনো পাতা পেতে দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল—কী খাওয়াবে ভাই?

—আজ মাংস হয়েছে।

—বেঁচে থাকুক সরাইওয়ালা। একটু তাড়াতাড়ি দাও। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসের কথা টথা শুনে হ্যারি হাসল। বলল—ফ্রান্সিস তুমি দিনকে দিন পেটুক হচ্ছো।

—ক'দিন আর বাঁচবো। ফ্রান্সিস গম্ভীরমুখে বলল। হ্যারি হো হো করে হেসে উঠল।

সবাইর খাওয়া হল। হাতমুখ ধুয়ে ফ্রান্সিসরা বিছানায় বসল। ওখানে মোটা কাপড় পাতা। ওটাই বিছানা। ওখানেই শোয়া ঘুমোনো।

ফ্রান্সিসরা নিজেদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা বলল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমোবার আগে হ্যারি বলল—বেশ কিছুদিন আমরা জাহাজ ছেড়ে এসেছি। রাজকুমারী আর বন্ধুদের কথা বড় বেশি মনে পড়ছে।

—ওসব নিয়ে ভেবো না। মন দুর্ব্বল হবে। এখন গুপ্ত ধনভাণ্ডার ছাড়া অন্য কিছু ভেবো না। ফ্রান্সিস বলল।

তখন সবে ভোর হয়েছে। হঠাৎ সরাইখানার দরজা ধাক্কা দেবার শব্দ শোনা গেল। ফ্রান্সিস হ্যারি উঠে বসল। আবার দরজায় ধাক্কা। এবার বেশি জোরে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ও মালিকমশাই দেখুন তো কী ব্যাপার। মালিক কাশতে কাশতে এল। আবার ধাক্কা। মালিক গলা চড়িয়ে বলল—যাচ্ছি।

মালিক দরজা খুলল। ঢুকল দুজন। মাইল আর ওর এক সঙ্গী রবার্ট মালিক ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বিড় বিড় করে বলল—এদের একজন রবার্ট। এখানকার কুখ্যাত গুণ্ডা। মানুষ মারতে ওর হাত কাঁপে না। সঙ্গে সাইল। আর এক চীজ। মালিক সরে গেল।

সাইল ফ্রান্সিসদের দিকে এগিয়ে এল। আলফানসো দ্রুত উঠে দাঁড়াল। সাইল বলল—পালাবার চেষ্টা করবে না। আমার বন্ধু—রবার্ট—ছোরা চালাতে ওর মতো এই নগরে আর কেউ নেই। ভয়ে আলফানসোর মুখ শুকিয়ে গেল। ও বলল—তোমরা এসেছো কেন?

সাইল বলল)নকশাটা নিতে এসেছি।

—আমি তো বলেছি সেই সরাইখানার মালিকের কাছে আমি রেখে দিয়েছিলাম। আলফানসো বলল।

—সেই মালিক বলছে কোনরকম নকশা বা ছবি কেউ তাকে দেয় নি। সাইল বলল।

—মালিক মিথ্যে কথা বলছে। আলফানসো বলল।

—ঠিক আছে। এক্ষুণি তুমি আমাদের সঙ্গে চলো। ঐ মালিকের কাছে যাবো। সাইল বলল।

—আমি যাবো না। আলফানসো বললো, সাইল রবার্টকে ইঙ্গিত করল। সাইল কোমর থেকে ছোরা বের করল। ছুটে এসে আলফানসোর গলায় ছোরাটা চেপে ধরল। শাঙ্কো দ্রুত উঠে দাঁড়ালো। এক ঝটকায় তরোয়ালটা

খুলল। রবার্টের বুকের ওপর তরোয়ালটা টেনে নিল। জামাটা দোফালি হয়ে গেল। দেখা গেল বুক কেটে রক্ত বেরুচ্ছে। রবার্ট ঘাবড়ে গেল। দু'তিন পা পিছিয়ে এল। শাঙ্কো সাইলের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার জামাটাও কেটে দেব? সাইল সঙ্গে সঙ্গে দু'পা পিছিয়ে গেল। ওরা কখনও তরোয়াল দেখে নি। চ্যাপ্টানো কালো রঙের লাঠিটা যে এত ধারালো তা ওরা কল্পনাও করেনি। রবার্ট ছোরাটা কোমরে গুঁজল। তারপর দুজনে ছুটে পাললো।

—আলফানসো নকশাটা কোথায় রেখেছো?

—আমি রেখে দিয়েছি। শাঙ্কো বলল।

—ওটা আলফানসোকে দিয়ে দাও। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে নকশাটা বের করে আলফানসোকে দিলে। আলফানসো ওটা কোমরের ফেট্টিতে রেখে দিল। ফ্রান্সিস বলল—আলফানসো, এবার সাইল আর ঐ গুণ্ডাটা তোমাকে ধরলে নকশাটা দিয়ে দেবে।

—বলেন কি। তাহলে তো ওরা—

—জীবনেও গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু আপনাকে তো নকশার নির্দেশ মানতে হবে। আলফানসো বলল।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—আমার কাছে নকশাটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। আমার সব ভাবা হয়ে গেছে। এখন শুধুই কাজে নামা।

—তাহলে আপনি কি নকশা ছাড়াই গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবেন? আলফানসো বলল।

—এখন পর্যন্ত পারবো ভাবছি। তবে কাজে নেমে কিছু কাজ এগিয়ে বুঝতে পারবো গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবো কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আপনার আর নকশাটার দরকার নেই? আলফানসো বলল।

—না। তুমি সাইলদের নকশাটা দিয়ে দিও। তোমাকে একা পেলে ওরা তোমার ক্ষতি করতে পারে। তার আগেই নকশাটা দিয়ে দিও। ফ্রান্সিস বলল।

সকালের খাবার খেতে খেতে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস তাহলে তো এখন আমাদের কিছুই করণীয় নেই।

—না। শুধু শুয়ে বসে সময় কাটানো। রাজকুমারের রোগমুক্তির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসদের একঘেঁয়ে দিন কাটতে লাগল। এরমধ্যে দু'দিন ওরা চিচেন ইতজায় গেল। ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে সব দেখল—সিঁড়ি দিয়ে উঠল নামল। সব দেখেই সে ফিরে এল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—পারবে রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন উদ্ধার করতে?

—অবশ্যই পারবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ফ্রান্সিস দৃঢ়কণ্ঠে বলল।

—কিন্তু নকশাটা যদি আলফানসো জীবন বাঁচাতে ওদের দিয়ে দেয়। তাহলে তুমি কোন অসুবিধেয় পড়বে না?

—এখন পর্যন্ত ভাবছি কোন অসুবিধে হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

বিকেল হলে ফ্রান্সিসরা বেড়াতে বের হয়। নগরে ঘুরে বেড়ায়। রাজপ্রাসাদ দেখে বিখ্যাত রাজউদ্যান দেখে। সন্ধ্যে নাগাদ সরাইখানায় ফিরে আসে।

দিন পাঁচেক কেটে গেল। সেদিন রাজপ্রাসাদের সম্মুখ দিয়ে ওরা আসছে দেখল প্রাসাদে ঢোকবার প্রধান দরজার সামনে লোকজনের ভিড়। প্রাসাদ রক্ষীদের সামনে লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস চলো তো কী ব্যাপার দেখি। ফ্রান্সিসরা প্রাসাদ রক্ষীদের কাছে এল। তখনই গোমড়ামুখো রক্ষীদের দেখল—হাসছে। বেশ খুশি। ফ্রান্সিস একজনকে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার ভাই?

—শোনেননি? রাজপুত্র সম্পূর্ণ সুস্থ। রাজা জানিয়েছেন পূর্ণিমা উৎসব হবে। তবে দিনটা এখনও স্থির করেন নি। দিনটা জানার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি। ফ্রান্সিসরা সবাই শুনল ব্যাপারটা। ফ্রান্সিস বলল—আমরা এখানে অপেক্ষা করবো। পূর্ণিমা উৎসবের দিনটা জেনে যাবো।

ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল। ভিড় বাড়তে লাগল। একসময় ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি তোমার সরাইখানায় চলে যাও। আমি খবরটা জেনে আসছি। হ্যারি আর শাঙ্কো চলে গেল। ফ্রান্সিস এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করল কিছুক্ষণ। একজন লোককে ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—রাজার আদেশ কী করে জানবো?

লোকটি আঙুল দিয়ে একটা চৌকোনো পাথর দেখাল। ফ্রান্সিস সেইদিকে গেল। দেখল পাথরের দেয়ালে একটা কষ্টিপাথর গেঁথে দেওয়া। প্রধান প্রবেশপথের আলো এখানে এসেছে। আট দশজন লোক কষ্টিপাথরের লেখাটা পড়ছে। লেখাটা স্পেনীয় ভাষায় লেখা। তলতেক ভাষায় কোন লিপি বা লিখিত রূপ নেই। ফ্রান্সিস পড়তে লাগল—ঈশ্বরের কৃপায় রাজপুত্র সুস্থ হয়েছে। পূর্ণিমা উৎসবের দিন ঘোষিত হবে।

ফ্রান্সিস লেখাটা সবে পড়ে শেষ করেছে একটা বলিষ্ঠ হাত পেছন থেকে ফ্রান্সিসের গলা পেঁচিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস দু'হাত দিয়ে গলায় চেপে ধরা হাতটা খুলতে চেষ্টা করতে লাগল। এইভাবে কিছুক্ষণ চলল। দুজনেই হাঁপাতে লাগল। ফ্রান্সিস ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল রবার্ট ওরা গলা পেঁচিয়ে ধরে আছে। সঙ্গে সাইল। সাইল ফ্রান্সিসের হাত দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধল। এবার দুজন ফ্রান্সিসকে টেনে নিয়ে চলল। ভিড়ের দু'একজন জানতে চাইল—কী ব্যাপার? সাইল গলা চড়িয়ে বলল—লোকটা চোর। তাই ধরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস এই অভিযোগের কোন জবাব দিতে পারল না। রবার্ট ওর গলা চেপে আছে।

ওরা ফ্রান্সিসকে টেনে নিয়ে চলল। রোগাটে চেহারার রবার্টের হাত লোহার মতো শক্ত। ফ্রান্সিস নানাভাবে চেষ্টা করেও গলা ধরা হাতটা সরাতে পারল না।

প্রাসাদের উদ্যানের কাছে এল সাইলরা। একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিসকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলা হল। সবাই গাড়িতে বসে পড়ল। গাড়ি চলল। পাথুরে রাস্তায় টক্ টক্ শব্দ উঠল। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ।

গাড়ি বেশ কিছুটা পথ যেতে রবার্ট হাতের চাপ কমাল। ফ্রান্সিস হাঁপানো গলায় বললো—আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

—আমাদের আস্তানায়। সাইল বলল।

—কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—একমাত্র তুমিই নকশাটার নির্দেশ বুঝতে পেরেছো। তোমরা বার কয়েকবার চিচেন ইতজায় গেছ। আমরা সর্বক্ষণ তোমাকে নজরে রেখেছিলাম। তুমি নকশার নির্দেশ মেনে সব দেখেছো। আমরা নিশ্চিত তুমিই নকশাটার অর্থ ও নির্দেশ বুঝতে পেরেছো।

—আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি মিথ্যে কথা বলছো। সাইল গলা চড়িয়ে বলল।

—এই ব্যাপারে আমি কোন কথাই বলবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাকে বলতে বাধ্য করবো। দাঁত চাপাস্বরে সাইল বলল।

—আমাকে বাধ্য করার চেষ্টা করো না। সে চেষ্টা করলে তোমরা দুজনেই নরকে যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। দেখা যাবে কে নরকে যায়! সাইল বলল।

গাড়ি একটা পাথরে টিলার সামনে এসে থামল। রবার্ট গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল—তোমার গলা ছেড়ে দিলাম। চ্যাঁচামেচি করবে না।

টিলাটার পাশ দিয়ে ওরা চলল। কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল একটা বাগান মতো। সবাই বাগানাটায় ঢুকল। বাগানের পরেই টিলার গায়ে একট গুহামত। তার মুখটা এমন ছোট যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে। রবার্ট হামা দিয়ে চলে।

ফ্রান্সিসদেরও হামা দিয়ে ঢুকতে হল। গুহার মধ্যে তখন অন্ধকার সাইল অন্ধকার খুঁজে খুঁজে একটা মোমবাতি বের করল চকমকি ঠুকে আলো জ্বালল। মোমবাতির আলো ছড়াল।

ফ্রান্সিস বলল—তেষ্টা পেয়েছে। জল দাও। সাইল একটা বড় চামড়ার থলি আনল। মাটির গ্লাসে জল ঢেলে ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস জল খেল। গুহার মেঝেয় একটা মোটা কাপড় পাতা। এটাই বিছানা। রবার্ট শুয়ে পড়ল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—তোমরা আমার এভাবে ধরে আনলে কেন?

—নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। সাইল বলল।

—সেটাই তো জানতে চাইছি। ফ্রান্সিস বলল।

—যারা রাজা হুনাকমিনের ধন ভাণ্ডার খুঁজেছে আর এখনও যারা খুঁজছে তুমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। আমার বিশ্বাস তুমি রাজা হুনাকমিনের গোপনে রাখা ধনভাণ্ডারের খোঁজ পেয়েছো। সাইল বলল।

—অত সোজা। নকশাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি কিন্তু ধনভাণ্ডারের হদিশ পাই নি। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি মিথ্যে কথা বলছো। সাইল বলল।

—যদি খোঁজ পেতাম তাহলে কবে সব ধনভাণ্ডার নিয়ে পালাতাম।

—সেসব বুঝি না। তোমার মুক্তি নেই। তোমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে। সাইল বলল।

—আমাকে বাদ দাও। যে সরাইখানায় আলফানসো আছে সেখানে যাও। নকশাটা চাইলেই পেয়ে যাবে। সেটা এনে দেখে বুঝে তোমরাই ধন ভাণ্ডার উদ্ধার কর। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের সেই সাধ্য নেই। একমাত্র তুমিই পারবে ঐ ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে। সাইল বলল।

—তোমার সঙ্গী ঐ গুণ্ডাটাকে—ফ্রান্সিস কথাটা শেষ করতে পারল না। রবার্ট লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। কোমর থেকে একটা বড় ছোরা এক ঝটকায় বের করল। চড়া গলায় বলল—আর একবার আমাকে গুণ্ডা বললে তোমার পেট ফাঁসিয়ে দেব।

—রাগ কর কেন? তুমি যা আমি তাই বলেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—আবার? রবার্ট চেঁচিয়ে বলল।

—ঠিক আছে। আর এসব নিয়ে কথা বলবো না। কিন্তু আমাকে যে তোমরা ভীষণ বিপদে ফেললে। ফ্রান্সিস বলল।

—কীসের বিপদ? সাইল বলল।

—আমার একদল বন্ধু পড়ে রইল তুলামের জাহাজঘাটায়। বাকি দু'জন পড়ে রইল এক সরাইখানায়। কবে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে, কবে তোমাদের হাত থেকে রেহাই পাবো। সব জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—সব হবে। বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে পারবে। তার আগে রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। সাইল বলল।

—তাই তো তোমাকে ধরে এনেছি। সাইল বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। বেশ রাত হয়েছে। সাইল উঠে দাঁড়াল। মোমবাতিটা নিয়ে কোনার দিকে গেল। মোমবাতি রেখে জমানো খড় গাছপালার শুকনো ডাল নিয়ে পাথরের উনুনে মোমবাতি দিয়ে আগুন লাগাল। উনুন ধরতে ধরতে সাইল বস্তা থেকে আটা ময়দা বার করল। আটা ময়দা ঠাসলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই রুটি বানাল। আলু শিমের তরকারি দুপুরেই করা ছিল বোধহয়।

সাইল গলা চড়িয়ে ডাকল—ফ্রান্সিস, রবার্ট খাবার তৈরি। বসে পড়। ফ্রান্সিস আর রবার্ট বিছানা থেকে উঠল। রান্নার জায়গায় এল। সাইল লম্বাটে শুকনো পাতা পাতল। রুটি তরকারি দিল। ফ্রান্সিস প্রায় হাপুস হুপুস করে খেতে লাগল। খিদেও পেয়েছে। একেবারে রাক্ষুসে ক্ষিদে। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল—আমি একটু বেশি খাই। সাইল সেটা ভালোভাবেই বুঝল। কিছু বলল না। ফ্রান্সিস আড়চোখে তাকিয়ে দেখল মাত্র কয়েকটা রুটি পড়ে আছে লোহার তাওয়ায়। ফ্রান্সিস আর রুটি চাইল না। তরকারি শেষ।

ফ্রান্সিস আর রবার্ট হাতমুখ ধুয়ে এসে বিছানায় বসল। ওদিকে সাইলকে মাত্র তিনটে রুটি তরকারি ছাড়াই খেতে হল।

আর একটু রাত বাড়তেই ওরা ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ও চুপ করে শুয়ে রইল। ঘণ্টা দুয়েক সময় পরে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠল। মোমবাতি বোধহয় সাইল নিভিয়ে দিয়েছে। গভীর অন্ধকারে ফ্রান্সিস শুধু গুহার মুখটা দেখতে পাচ্ছিল। সেইদিক লক্ষ্য রেখে ফ্রান্সিস দু'পা যেতেই রবার্টের গলা শুনল।

—চুপ করে শুয়ে পড়ো গে। আমি যতক্ষণ খুশি জাগতে পারি, যতক্ষণ খুশি ঘুমুতে পারি। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। যাও।

ফ্রান্সিস বুঝল—এভাবে পালানো যাবে না। অন্য ছক কেটে পালাতে হবে। ফ্রান্সিস ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। নানা চিন্তা মাথায়। ফ্রান্সিস মনকে শান্ত করল। আস্তে আস্তে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালের জলখাবার খেয়ে রবার্ট বলল—আমি আলফানসোর কাছ থেকে নকশাটা আনতে যাচ্ছি। ভালো কথা—ফ্রান্সিস নকশাটা এখন কার কাছে আছে?

—আমার বন্ধু শাঙ্কোর কাছে। ফ্রান্সিস বলল।

—শাঙ্কো কি ভালোয় ভালোয় দেবে না আমাকে ছুরি চালাতে হবে।

—না ভালোয় ভালোয় তোমাকে দেবে। আমি বলেছি এইকথা বলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। রবার্ট বলল।

গুহার মুখের দিকে যেতে যেতে রবার্ট বলল—সাইল, একে সাবধানে পাহারা দেবে। এ কিন্তু ভীষণ চালাক। সবসময় চোখে চোখে রাখবে। হঠাৎ রবার্ট ফিরে এল। সাইলের কানে কানে বলল—আমার শিয়রে দিনের বিছানার নিচে একটা ছোরা আছে। দরকারে কাজে লাগাবে।

রবার্ট গুহা থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—আমাকে এভাবে আটকে রেখেছো কেন?

—দরকার আছে। সাইল বলল।

—তোমরা আমার কাছে কী চাও? ফ্রান্সিস বলল।

—খুব সামান্য জিনিস—রাজা হুনাকমিনের গুপ্ত ধনভাণ্ডারের হদিশ। সাইল বলল।

—আমি ওসব ভাণ্ডারের কী জানি। ফ্রান্সিস বলল।

—একমাত্র তুমিই জানো। সাইল বলল।

—তাহলে আমাকে পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কোনভাবেই পালাতে পারবে না। সাইল বলল।

—দেখি। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

সাইল আস্তে আস্তে গিয়ে গুহার মুখে দাঁড়াল—একটা পাথরের আড়ালে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একটা অল্পবয়সী ছেলে সাইলের কাছে এল। কী কথা হল দুজনে। সাইল ফেট্টি থেকে বোধহয় দাম বের করে দিল।

সাইল গুহার ভেতরে এসে বিছানায় বসল। কোনার রান্না করার জায়গাটায় রান্নার আয়োজন করতে লাগল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রবার্ট ফিরে এল। গুহার মুখ থেকে দ্রুত ছুটে এল। ফ্রান্সিস বুঝল—সাইল রবার্ট এই গুহায় গোপনে আশ্রয় নিয়েছে। এটাই ওদের গোপন আস্তানা।

রবার্ট ঢুকতেই সাইল বলে উঠল—রবার্ট—নকশা পেলে?

—নকশা না দিয়ে যাবে কোথায়? মানে ছোরা টোরা দেখাতে হয় নি। রবার্ট বুঝতেই পারেনি যে শাঙ্কো যে নকশাটা দিয়েছে সেটা নকল। আসলটা রয়েছে হ্যারির কাছে।

—নকশাটা দাও। সাইল বলল। রবার্ট কোমরে গোঁজা নকশাটা বের করে দিল। সাইল খুব মনোযোগ দিয়ে নকশাটা দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। সাইলের নজরে পড়ল সেটা। সাইল বলল—হাসছো কেন?

—কেউই যেখানে থৈ পাচ্ছে না সেখানে তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছো যেন নকশাটার অর্থ বুঝে ফেলেছো। ফ্রান্সিস বলল।

—মন দিয়ে নকশাটা দেখছিলাম আর কি। অবশ্য নকশার অর্থ বোঝবার জন্যে তুমিই তো আছো। সাইল বলল।

—আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। প্রথমেই চিন্তা তুলামেও এমনি একটা মন্দির আছে। এখন বুঝতে হবে এই নক্‌শায় যে মন্দির মতো আঁকা হয়েছে সেটা তো তুলামের মন্দিরও হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল। সাইল একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—আচ্ছা, নকশায় কোথাকার মন্দিরটা আকাঁ আছে বলে তুমি মনে কর।

—এখানকার মন্দিরটা তুলামের মন্দিরের চাইতে অনেক বড়। কিন্তু মন্দির দুটো দেখতে একরকম। তুমি তো রাজা।

—হ্যাঁ সাইল বলল।

—তাই এবার প্রশ্ন কোন মন্দিরটা খুঁজবে? ফ্রান্সিস বলল।

সাইল চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। একটা কাজ করা যাক—তুলামের মন্দিরটা একবার খোঁজাখুঁজি করা যাক। দেখি হদিশ পাই কিনা। ফ্রান্সিস একবার ভাবল ওদের অভিজ্ঞতার কথা বলবে। পরক্ষণেই ভাবল আমি যা জানি বলি। তারপরেও যদি যেতে চায় মন্দিরটা দেখতে যায় তার দায়িত্ব সাইল আর রবার্টের। তবু ফ্রান্সিস ওদের সাবধান করে দিতে বলল—ঐ মন্দিরের নিচে গর্ভগৃহ আছে। তাতে আগুন জ্বলে।

—সবসময়? সাইল জানতে চাইল।

—না। আগুন জ্বললো না। কিছু পড়লেই দপ করে জ্বলে ওঠে। আগুন ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গর্ভগৃহটি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা তার আগেই খোঁজা শেষ করবো। সাইল বলল।

—পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা নাকি ভাইকিং। খুব বীর নাকি তোমরা। এইটুকু ব্যাপারেই ভয় পেয়ে গেলে? সাইল হেসে বলল।

—ঠিক আছে। চলো। তবে তোমাদের কিছু ক্ষতি হলে আমাকে দোষ দিও না। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাকে দোষ দেব না। তুমি রাজা হুনাকমিনের গুপ্তভাণ্ডারের সন্ধান দাও তাহলেই হবে। সাইল বলল।

—বদলে আমাকে কী দেবে? ফ্রান্সিস বলল।

—আগে পাইতো তারপর দেওয়ার প্রশ্ন। সাইল বলল।

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—না। আগে সেটা ঠিক করে নিতে হবে।

—বেশ তা করা যাবে। সাইল বলল।

—উঁহু—আমাকে আগে কথা দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে গুপ্ত ধনভাণ্ডার তিনটে ভাগ করা হবে। আমরা তিনজনে এক ভাগ করে নেব। সাইল বলল।

—হ্যাঁ এইবার আমি রাজি। এখন বলো—তুলামের মন্দির খুঁজতে যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। সাইল বলল। এবার রবার্টকে বলল—তুলামে যাবে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলো। রবার্ট বলল

—তাহলে কালকে সকালেই খেয়েটেয়ে তুলামের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বো। সাইল বলল।

দুপুরের মধ্যে সাইলের রান্না হয়ে গেল। সাইল ফ্রান্সিসকে একটা পাহাড়ি ঝর্ণায় নিয়ে গেল। ঐ ঝর্ণার জলে স্নান সারল ওরা।

বিকেলে তিনজন বেড়াতে বেরুলো। কিছুক্ষণ রাজপ্রাসাদ বাগানটাগান দেখল। তাড়াতাড়িই আস্তানায় ফিরে এল। এসময় ফ্রান্সিস রাজপ্রাসাদের

দেওয়াল দেখে এল। এখনও রাজা পূর্ণিমা উৎসবের দিনক্ষণ ঘোষণা করেন নি। রাজা এখনও ঐ উৎসবের ব্যাপারে মনস্থির করেন নি।

অন্ধকারের মধ্যেই তিনজন গুহায় ঢুকল। ভেতরের দিকে যেতে লাগল সবাই। কিন্তু নিকষ অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারের মধ্যেই সাইল চকমকি ঠুকে মোমবাতি জ্বালল।

কিছুক্ষণ পরে সাইল রান্না করতে শুরু করল। ফ্রান্সিস এর মধ্যে পালাবার ছক কষতে লাগল। কিন্তু রবার্ট গুণ্ডা খুনে। মানুষ মারতে ওদের হাত কাঁপে না। রবার্ট সবসময়ই সজাগ। ওর দৃষ্টি এড়ানো প্রায় অসম্ভব।

খাওয়া দাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের ঘুম আসছে না। শুধু ভাবনা মারিয়া, বন্ধুরা কেমন আছে। ওরা ফ্রান্সিসের হঠাৎ বেপাত্তা হওয়ার খবর পেয়েছে কিনা। পেলে ওরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।

রাত গভীর হল। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। অন্ধকারে ও উঠে বসল। আস্তে আস্তে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে গুহার মুখের দিকে চলল। কিন্তু যখন রবার্টের পায়ের কাছ দিয়ে ও যাচ্ছে তখনই রবার্টের ভারি গলা শুনল—ঘুমোও তো— নইলে ছুরি খেয়ে মরবে।

হতাশ ফ্রান্সিস ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ওদিকে হ্যারি আর শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের না ফেরার জন্যে চিন্তায় পড়ল। সরাইখানায় রাতের খাওয়ার সময় হয়ে গেল। সরাইখানার সকলের খাওয়া হয়ে গেল। হ্যারিরা তখনও ফ্রান্সিসদের জন্য অপেক্ষা করছে। সরাইখানার লোক দু'তিনবার এসে খেয়ে নিতে বলল। হ্যারি বলল—আমাদের বন্ধু এখনও ফেরে নি। বন্ধু এলে তবে খাবো।

রাত গভীর হল। হ্যারি, শাঙ্কো তখনও খেল না। সরাইখানার কাজের লোকেরা সবাই শুয়ে পড়ল। ঘরের মোমবাতি নিভিয়ে দেওয়া হল। অন্ধকারে হ্যারি আর শাঙ্কো চুপ করে শুয়ে রইল। ওদের আর খাওয়া হল না।

পাখির ডাক শোনা গেল। রাত শেষ। হ্যারি আর শাঙ্কো তখনও জেগে। দুজনের আর ঘুম হল না।

সকাল হল। সরাইখানার লোক ওদের সকালের খাবার দিতে এল। হ্যারি আর শাঙ্কো মাথা নাড়ল। লোকটি বলল—আপনারা কাল থেকে কিছু খান নি।

—বন্ধু ফিরলে খাবো। হ্যারি বলল।

—বন্ধু হয়তো অন্য কোথাও গেছে। ফিরতে দেরি হচ্ছে। আপনারা কি ততদিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকবেন? লোকটি বলল।

—দেখি। হ্যারি বলল। লোকটা চলে গেল।

দুজনে হাতমুখ ধুয়ে এল। হ্যারি বলল—শাঙ্কো চলো রাজপ্রাসাদের সামনে যাই। ফ্রান্সিস ওখানেই ছিল। আমরা চলে এসেছিলাম।

—চলো। শাঙ্কো বলল। উঠে দাঁড়াল। হ্যারিও উঠল।

দুজনে রাজপ্রাসাদের দিকে চলল। রাস্তায় লোকজন যে যার কাজ করছে। হ্যারি এই লোকজনের মধ্যে ফ্রান্সিসকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় ফ্রান্সিস? হ্যারি হতাশ হল। শাঙ্কোর মনে একটা আশঙ্কা ছড়াল—ফ্রান্সিসকে কেউ মেরে ফেলে নি তো? হ্যারিকে বলল সে কথা। হ্যারি একটু ভেবে বলল—এটা কী করে হবে? এই বিদেশে কারো সঙ্গে তো আমাদের শত্রুতা নেই। আমার মনে হয় ফ্রান্সিসকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

—কে বা কারা ফ্রান্সিসকে বন্দী করবে? শাঙ্কো বলল।

—সেটাই তো ঠিক বুঝতে পারছি না। হ্যারি বলল।

দুজনে রাজপ্রাসাদের সামনে এল। এই সকালেও এখানে লোকজন জড়ো হয়েছে। বোধহয় দেখতে যে পূর্ণিমা উৎসব সম্পর্কে রাজা কোন বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন কি না। ওরা দেখল পাথুরে গায়ে রাজার সেই পুরোনো বিজ্ঞপ্তিটাই রয়েছে। ফ্রান্সিস এখানে এসেছিল। ফ্রান্সিস ওদের চলে যেতে বলেছিল। ওরা চলে গিয়েছিল। সেইদিন থেকে ফ্রান্সিস নিরুদ্দেশ। হ্যারি ও শাঙ্কো চারদিকের লোকজন দেখতে লাগল। কিন্তু ফ্রান্সিস নেই। শাঙ্কো বলল—হ্যারি—ফ্রান্সিস একাই চিচেন ইতজায় গিয়ে রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন খুঁজছে না তো।

—না—না। মনে আছে তোমার ফ্রান্সিস বলেছিল পূর্ণিমা উৎসবের দিন ফ্রান্সিস ঐ গুপ্তধন উদ্ধার করতে যাবে।

—হ্যাঁ ফ্রান্সিস বলেছিল বটে। শাঙ্কো বলল।

কিছুক্ষণ পরে হ্যারি বলল—এখানে ফ্রান্সিসকে পাবো না। ভাবছি—চিচেন ইতজায় যাবো কি না।

—তাই চলো। একবার তো দেখি।

দুজনে চিচেন ইতজার দিকে চলল। গত কয়েকদিনের মতো রাস্তায় মানুষের ভিড় নেই। তখন পূর্ণিমা উৎসবে অনেক লোক এসেছিল। রাজকুমারের অসুখের জন্যে পূর্ণিমা উৎসব বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় সবাই চলে গেছে। এজন্যেই রাস্তায় লোকজনের তেমন ভিড় নেই।

চিচেন ইতজায় এল ওরা। হ্যারি চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। এই মন্দিরে কিন্তু মানুষের ভিড় আছে।

শাঙ্কোকে নিয়ে হ্যারি মন্দিরের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। কত লোক উঠছে নামছে। কিন্তু কোথায় ফ্রান্সিস? দুজনে গর্ভগৃহেও নামল। আবার উঠে এল। ওরা বুঝল এভাবে খুঁজে লাভ নেই। ফ্রান্সিসের যদি শারীরিক কোন ক্ষতি না হয়ে থাকে তবে ও নিজেই এদিকে আসবে। তবু মন মানে না। দুজনে ফ্রান্সিসকে খুঁজতে খুঁজতে সরাইখানায় ফিরে এল। সরাইওয়ালার দেওয়া বিছানায় বসল। বিছানা মানে শুকনো ঘাস ভেতরে। বাইরে একটা মোটা কাপড়।

শাঙ্কো বলল—হ্যারি। কাল রাত থেকে না খেয়ে আছি। চল—কিছু খাওয়া যাক।

—ফ্রান্সিসকে না দেখা পর্যন্ত আমি খাবো না। হ্যারি বলল।

—পাগলামি করো না হ্যারি। ফ্রান্সিসকে খুঁজতে হলে আমাদের সুস্থ থাকতে হবে। অনাহারে দুর্বল শরীর নিয়ে আমরা কিছুই করতে পারবো না। কথাটা ভেবে দেখ। শাঙ্কো বলল।

হ্যারি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললো—বন্দী দশায় ফ্রান্সিস বলতো —পেট ভরে খাও। খেতে ভালো না লাগলেও খাও। শরীরটা চাঙ্গা রাখো।

—আমিও তাই খেয়েটেয়ে সুস্থ থাকার কথা বলছিলাম। বুঝে দেখ—রাজবাড়ি গেলাম চিচেন ইতজায় গেলাম এখন ফিরে আসছি—শরীর একটু দুর্বল লাগছে না?

হ্যারি বলল—হ্যাঁ। ঠিকই বলেছো। শরীর বেশ দুর্বল লাগছে।

—কাজেই পেট পুরে খেতে হবে। আবার সন্ধ্যেবেলা বেরোতে হবে। ফ্রান্সিসকে খোঁজা চলবে। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। দুপুর থেকে আমরা খাওয়াদাওয়া করবো। আমাদের সুস্থ থাকতে হবে। হ্যারি বলল।

সরাইখানার মালিক এল। হেসে হেসে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল—গতকাল রাতে—খান নি। সকালেও খান নি। রান্না ভাল হয়নি?

—রান্না ঠিক আছে। আমাদের এক প্রাণের বন্ধুর কোন হদিশ পাচ্ছি না। সে নিজের থেকেও ফিরে আসেনি—তার জন্যেই আমরা খাই নি। হ্যারি বলল।

—কী করে বন্ধুটি হারালো? সরাইখানার মালিক জানতে চাইলো।

—গত সন্ধ্যায়—রাজবাড়ির সামনে আমরা গিয়েছিলাম কবে রাজা পূর্ণিমা উৎসব করতে কোন বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন কিনা সেটা দেখতে। আমরা তেমন কোন বিজ্ঞপ্তি দেখলাম না। রাত হল। বন্ধুটি বলল—তোমরা সরাইখানায় চলে যাও আমি অপেক্ষা করি। দেখি—বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল কিনা। আমি পরে যাচ্ছি। একটু থেমে হ্যারি বলল—

আমরা দুজনে ফিরে এলাম। বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাতে গেলাম না। সারারাত ঘুমুতেও পারি নি। বন্ধু ফিরল না। আজও রাজবাড়ির কাছে চিচেন ইতজায় বন্ধুকে খুঁজে বেড়ালাম। বন্ধুকে পেলাম না।

সরাইখানার মালিক মাথা এপাশ ওপাশ করে বলল—সত্যি এটা তো খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার।

শাঙ্কো বলল—আজ থেকে আমরা খাবো। শরীর সুস্থ রাখতে হবে।

হ্যারি বলল—আর এক সমস্যা। তুলামের জাহাজঘাটায় আমাদের জাহাজ রয়েছে। বত্রিশজন বন্ধু রয়েছে। তারা এখনও বন্ধুর নিঁখোজ হয়ে যাবার খবর জানে না। তারাও আমরা ফিরলাম না দেখে ভীষণ চিন্তায় পড়বে।

—তাহলে এখন কী করবেন ̃ মালিক বলল।

—সেটাই ভেবে ঠিক করতে পারছি না। হ্যারি বলল।

—আমি বলি কি— একজন জাহাজে যান। বন্ধু নিখোঁজ এই সংবাদটা জানান। আরো কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে আসুন।

হ্যারি মাথা নিচু করে ভাবল। তারপর শাঙ্কোকে বলল—

—শাঙ্কো কী করবে?

—ঠিক আছে। আমরা একটু ভেবে দেখি। শাঙ্কো বলল সরাইখানার মালিক চলে গেল।

সেদিন বিকেলে ফ্রান্সিসরা রুটি, মধু খেল। সাইল কয়েকটা থলি নিল। আটা-ময়দা তরিতরকারি এসব কিনে আনতে তৈরি হল। ফ্রান্সিস বলল—সাইল— রাজপ্রাসাদের সামনের পাথুরে দেওয়ালে রাজার বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে কিনা দেখো তো?

—কীসের বিজ্ঞপ্তি? সাইল বলল।

—পূর্ণিমা উৎসব কবে হবে তারা জানিয়েছেন কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ দেখবো। সাইল চলে গেল।

রবার্ট পাহারায় রইল। রবার্ট দুপুরের খাওয়াদাওয়া করার পর সেই যে পাতলা কম্বলের ওপর শুয়েছে আর ওঠার নাম নেই।

সন্ধ্যা নামল। অন্ধকার গুহায় ফ্রান্সিস বসে রইল। রবার্ট শুয়ে রইল।

একসময় ফ্রান্সিস বলল—রবার্ট। একটু গাত্রোত্থান কর—মানে ওঠ। মোমবাতিটা জ্বালাও।

—আমি অন্ধকারেও দেখতে পাই। রবার্ট বলল।

—আমি তো তোমার মতো বেড়াল নই। অন্ধকার আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। ফ্রান্সিস বলল।

—সাইল এসে মোমবাতি জ্বাললো। ততক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকো। রবার্ট বলল।

—বেশ। অন্ধকার থাকলে ভালো—আমার পালানোর সুবিধে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেঘোরে ছোরা খেয়ে মরবে। রবার্ট বলল।

—হুঁ। তুমি জবরদস্ত পাহারাদার। ফ্রান্সিস বলল।

রবার্ট কোন কথা বলল না। জোরে একবার শ্বাস ফেলে পাশ ফিরল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরকারি জিনিস নিয়ে সাইল ফিরল।

ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—রাজার বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে?

—না। রাজপুত্র সুস্থ হয়েছে সেই বিজ্ঞপ্তিটাই সাঁটা আছে। সাইল বলল।

—শুভ সংবাদ। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—ওকথা বলছ কেন? সাইল জানতে চাইল।

—আছে আছে! ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করে বলল।

একটু রাত হতে সাইল রাঁধতে বসল। রাঁধতে রাঁধতে বলল—তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। কাল সকাল সকাল খেয়ে বেরুবো আমরা।

—তাহলে তুলমের মন্দির দেখতে যাচ্ছো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। সাইল বলল।

তখন রাত গভীর। ফ্রান্সিস তখনও ঘুমোয়নি। আবার পালানোর জন্যে তৈরি হল। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে গুহামুখের দিকে চলল। অন্ধকারে সাইলকে ছাড়াল। রবার্টকে ছাড়িয়ে যেতেই রবার্টের মোটা গলা শুনল—ফ্রান্সিস মিছিমিছি মৃত্যুকে ডেকে এনো না। রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন খুঁজে বের করতে আমাদের সাহায্য কর। গুপ্তধন পেলেই তোমার মুক্তি।

ফ্রান্সিস নিজের জায়গায় ফিরে এল। বলল—রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধন কোথায় আমি জানি না।

—নকশায় নির্দেশ আছে। একমাত্র তুমিই সেই নির্দেশ বুঝে গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবে। কাজেই আমাদের হাত থেকে তোমার মুক্তি নেই। পালাবার চেষ্টা করো না। ছোরা তোমার হৃৎপিণ্ড ভেদ করবে। তুমি মারা যাবে। রবার্ট থেমে থেমে বলল।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরে সাইল রবার্টের কথাবার্তায় ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। ঝর্ণার জলে হাত মুখ ধুতে যাচ্ছে রবার্ট পেছন পেছন এল।

গুহায় ফিরে দেখল সাইল খেতে দিয়েছে। রুটি আর কলা, আধখানা আপেল। সাইল বলল—ফ্রান্সিস খাবার খেয়ে নিয়ে তৈরি হও। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা তৈরি হল। ফ্রান্সিসকে একটা ঝোলা দেওয়া হল। রবার্ট আর সাইল ঝোলায় রান্নার বাসনটাসন নিল। গুহা থেকে বেরিয়ে এল। চলল পূবমুখো। কিছুক্ষণের মধ্যেই শহর ছাড়িয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে এল। রোদ বেশ চড়া। রোদের তেজ সহ্য করে ওরা চলল।

শেষ দুপুরে একটা ছোট বসতিতে এল। এখন খাওয়া। সাইল বলল— চল দেখি কারো বাড়িতে খেতে পারি কিনা।

একটা দোকানের সামনে এল। সাইল দোকানদারের কাছে গেল। বলল—আমরা বেশ দূর থেকে আসছি। আমাদের কিছু খেতে দিতে পারেন? দোকানদার বলল—দেখি—স্ত্রীকে রাজি করাতে হবে। একটা পাটাতন দেখিয়ে বলল আপনারা বসুন। ফ্রান্সিসরা বসল। এতদূর হেঁটে শরীর বিশ্রাম চাইছিল।

কিন্তু সাইল বলল—এত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়লে চলবে না। আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।

দোকানদার এল। হেসে বলল—আমাদের তো রান্না খাওয়া হয়ে গেছে। আপনারা বিশ্রাম করুন। কিছুক্ষণের মধ্যে রান্না হয়ে যাবে। আপনারা কি ততক্ষণ এখানেই বিশ্রাম করবেন না ভেতরবাড়িতে বিছানায় বিশ্রাম করবেন? সাইল ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—আমরা ভেতরবাড়িতে যাব। শোবো। শুধু বসে থেকে বিশ্রাম হয় না।

—ঠিক আছে। আসুন। দোকানদারের পেছনে পেছনে ওরা ভেতরবাড়িতে ঢুকল। একটা ঘরের দরজা খুলে দোকানদার ফ্রান্সিসদের অপেক্ষা করতে বলল।

ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকে দেখল মেঝেয় বিছানা পাতা। শুকনো ঘাসপাতার বিছানা। ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। সাইলও শুয়ে পড়ল। কিন্তু রবার্ট শুয়ে পড়ল না। বসে রইল।

কেউ কোন কথা বলছিল না। এত খিদে পেয়েছে যে কেউ কথা বলতে পারছে না।

ঘণ্টাখানেক পরে একটি অল্পবয়স্ক মেয়ে এল। হাতে গোল গোল বড় পাতা। ওদের সামনে মেঝেয় পাতাগুলো দিল। একটু পরে দোকানদারের স্ত্রী ঢুকল। হাতে কাঠের বড় বেকারি। তাতে রুটি রাখা। দোকানদারের স্ত্রী রুটি পাতায় দিতে লাগল। ফ্রান্সিস শুধু রুটিই খেতে লাগল। দেখাদেখি সাইল আর রবার্টও শুধু রুটি খেতে লাগল। দোকানদারের স্ত্রী এবার কাঠের গামলায় শাকসব্জির ঝোল নিয়ে এল। পাতায় দিল। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি মাংস নিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের ঝোলসহ মাংস দিল। তিনজন গোগ্রাসে খেতে লাগল। আর এক দফা রুটি দেওয়া হল। ফ্রান্সিস আরো দুখানা রুটি চাইল। স্ত্রীলোকটি হেসে মাথা এপাশ ওপাশ করে বলল—আর রুটি নেই। যদি বলেন তাহলে রুটি করে দিতে পারি।

—ঠিক আছে। আমরা আর থাকবো না। চলে যাবো। ফ্রান্সিস বলল। তিনজনেই উঠে দাঁড়াল। মেয়েটি হাতমুখ ধোবার জল দিল। জল খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে ফ্রান্সিসরা বাড়ির বাইরে এল। দোকানদারের কাছে গিয়ে ফ্রান্সিস বলল—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমরা ভাল খেয়েছি। রবার্ট বলল—আর বসা নয়। চলো সব।

দোকানের বাইরে গিয়ে ওরা আবার পূবমুখো হাঁটতে লাগল।

বিকেল হল। যেতে যেতে সন্ধ্যে হল। একটা জঙ্গলের কাছে পৌঁছল ওরা। সাইল থামল। ফ্রান্সিস, রবার্টও থামল। সাইল বলল—চলো—এখানেই রাতের খাওয়া খাবো, শোবো, ঘুমোবো।

একটা বিরাট গাছের গোড়ায় এসে সাইল ওর পোটলা থেকে বাসনটাসন রাখল। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝোলাটোলা রাখল। সাইল বলল—এখন

সবচেয়ে জরুরী কাজটা করতে হবে। একটা ঝর্ণাটর্ণা খুঁজে বের করতে হবে। জল না হলে কিছুই রান্না করা যাবে না। একটা ঝর্ণার খোঁজে বনে ঢুকতে হবে।

—তাহলে তো তোমাকে যেতে হয়। রবার্ট বলল।

—আমি যেতে পারি। এসব আমার অভ্যেস আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তুমি যাবে না। রবার্ট বলল।

—আমি যাচ্ছি। সাইল বলল। তারপর বাসনের ঝোলা থেকে একটা একটু বড় কাঠের পাত্র বের করল। সেটা হাতে নিয়ে সাইল জঙ্গলে ঢুকল।

ফ্রান্সিস গাছের নিচে বসল। রবার্টও ওর পাশে বসল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল—রবার্ট কিছুতেই ফ্রান্সিসকে চোখের আড়ালে যেতে দিচ্ছে না। দুজনে বসে রইল অন্ধকারে। ফ্রান্সিস পালাবার ছক কষতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাইল কাঠের বড় বাটিটা ভর্তি জল নিয়ে এল। বগলে শুকনো ডালটাল নিয়ে এল। বলল—এই জলটা আমরা খাই। আমাদের নিশ্চয়স তেষ্টা পেয়েছে। বাটিটা ধরে ধরে তিনজনে জলটা খেয়ে নিল। সাইল শুকনো ডালটাল রাখল। রবার্টকে বলল—আমি আবার জল আনতে যাচ্ছি। রবার্টকে বলল—তিনটে পাথর এনে উনুন বানাও।

সাইল ঘটি নিয়ে চলে গেল। রবার্ট অন্ধকারের মধ্যে গাছতলাটার একটু দূরে থেকে তিনটে বড় পাথর আনল। উনুন বানাল।

সাইল জল নিয়ে এল। পাত্র বের করে আটা মাখতে লাগল। বলল—রবার্ট উনুন চকমকি দিয়ে জ্বালাও। রবার্ট অন্ধকারে হাতের আন্দাজে ঝোলা থেকে চকমকি পাথর বের করল। শুকনো ডালটাল আর শুকনো পাতা নিয়ে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালল।

অল্পক্ষণের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। সাইল উনুনে একটা লোহার চ্যাপ্টামত পাত্র বসাল। মোমবাতি বের করল। উনুনের আগুন থেকে মোমবাতি জ্বালল। জোর বাতাস নেই। মোমবাতি একেবারে নিভে গেল না। তবে মোমবাতির শিখা নড়তে লাগল মাঝে মাঝে। সাইল রুটি বানাতে লাগল। মোমবাতির আলোয় দেখতে দেখতে পনেরোখানা রুটি বানাল। বলল—যাও বড় পাতা নিয়ে এসো। রবার্ট অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে কয়েকটি পাতা পেল। নিয়ে এল। সাইল মধুর পাত্রটা বের করল। বলল—বসে পড়। ফ্রান্সিস আর রবার্ট পাতা সামনে নিয়ে বসল। সাইল ওদের পাতায় রুটি দিল। তারপর মধুর পাত্র থেকে মধু ঢেলে দিল। মোমবাতির মৃদু আলোয় দেখে দেখে রুটি খেতে লাগল। ঐ মধুমাখা রুটি ফ্রান্সিসের কাছে যে কী সুস্বাদু লাগল! এবার সাইলও খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ। সাইল যে জলটুকু বাঁচাতে পেরেছিল সেই জল ওরা ভাগ করে খেল। খিদে মিটল।

এবার শুয়ে পড়া। তিনজনেই গাছের নিচেই শুকনো পাতা জড়ো করে তার ওপর শুয়ে পড়ল। পরিশ্রান্ত ওরা একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হল। ফ্রান্সিসদের ঘুম ভাঙল। সাইল বলল—আর দেরি করবো না। সকালের খাওয়া খেয়েই বেরিয়ে পড়বো। আজকেই তুলামে পৌঁছবো।

গতরাতের বাসি রুটি মধু খেল। তারপর আটার ঝোলা, বাসনটাসনের ঝোলা নিয়ে চলল ওরা।

দুপুরে এক চাষীর বাড়িতে খেল। তারপর শেষ বিকেলে ওরা তুলামে পৌঁছল। ওরা খুঁজে খুঁজে একটা সরাইখানায় এল। দরদাম করে সরাইখানার পাতা বিছানায় ওরা বসল।

ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে পড়ল। সাইলও আধশোয়া হল। রবার্ট বসে রইল। ফ্রান্সিস বলল—এখন তো রাজা তুতজের সঙ্গে দেখা করা যাবে না। কাল সকালে রাজসভায় গিয়ে কথা বলতে হবে। কাজেই আজ রাতে খাওয়া ও বিশ্রাম।

রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল ওরা।

পরদিন তৈরি হয়ে ওরা রাজবাড়ির দিকে চলল। তখনই ফ্রান্সিস দেখল বেশ কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ি পশ্চিমমুখো চলেছে। আরোহীরা আনন্দে হৈ হৈ করছে। এরা কি তবে পূর্ণিমা উৎসবে যাচ্ছে?

একটা গাড়িতে লোক তোলা হচ্ছিল। ফ্রান্সিস কাছে একজন যুবককে জিজ্ঞেস করল—আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

—পূর্ণিমা উৎসবে।

—পূর্ণিমা উৎসব কবে?

—পরশু। যুবকটি গাড়িতে উঠে পড়ল।

ফ্রান্সিস বেশ উত্তেজনা বোধ করল। আমাকে আজকেই পালাতে হবে।

পরদিন সকালে ওরা রাজা তুতজের রাজসভায় গেল। রাজা তুতজ সিংহাসনে বসে আছেন। বিচার চলছে। ফ্রান্সিস সবকিছুই তাড়াতাড়ি সারতে চাইছিল। মাত্র একটা দিন হাতে।

একটু পরেই একজন বন্দীকে নিয়ে সেনাপতি রাজসভায় এল। ফ্রান্সিস সাইলকে বলল—তুমি সেনাপতিকে বল যে আমি রাজাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। সাইল আস্তে আস্তে সেনাপতির কাছে গেল। বলল—আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ রাজাকে দিতে চাই।—কী সংবাদ? সেনাপতি বলল।

—আমরা রাজাকে রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধনের একটা নকশা দিতে চাই।

—বলো কি? ঠিক তো? সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ।

—দেখছি। সেনাপতি হেঁটে হেঁটে রাজার পাশের আসনে বসা মন্ত্রীর কাছে গেল। এসব বলল। একটু পরেই সেনাপতি ফ্রান্সিসদের এগিয়ে আসতে বলল।

ফ্রান্সিসরা এগিয়ে গেল। রাজা ফ্রান্সিসকে দেখে বললেন—তুমি তো ভাইকিং। দুজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলে। তারপর পালিয়ে ছিলে।

—হ্যাঁ মান্যবর। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের কাছে রাজা হুনাকমিনের গুপ্তধনের নকশা আছে? রাজা বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল। তারপর সাইলকে নকশা দিতে বলল। সাইল নকশা বের করে দিল। ফ্রান্সিস রাজাকে দিল। রাজা মন্ত্রী দুজনেই ঝুঁকে পড়ে নকশাটা দেখতে লাগল।

—এটা ভূতুড়ে নকশা নয় তো? রাজা বললেন।

—না। আপনি আমাদের অনুমতি দিন। এখানকার মন্দিরে আমরা গুপ্তধন খুঁজে বের করবো। সাইল বলল।

—পারবে? রাজা বলল।

—নকশা পেয়েছি কাজেই কোন অসুবিধা হবে না। সাইল বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। রাজা বলল।

—আপনি দুজন প্রহরী দিন। কিন্তু তারা গর্ভগৃহে নামতে পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। নকশাটা আমার কাছেই থাকবে। রাজা বলল।

—কোন অসুবিধে নেই। তাহলে আমরা গুপ্তধন খুঁজতে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। তুতজ মুখে শব্দ করল।

ওরা রাজবাড়ির বাইরে এল। ফ্রান্সিস বলল—আমরা এখনই খুঁজতে যাবো। আমি সময় নষ্ট করতে পারবো না। তোমরা আমাকে একা ছেড়ে দিলে আমিই খুঁজতে যেতাম। তোমরা সরাইখানায় খেয়ে দেয়ে আসতে পারতে।

—তোমাকে একা ছাড়া হবে না। রবার্ট বলল।

—বেশ চলো। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই দুজন প্রহরী ওদের কাছে এল। বলল—সেনাপতি আপনাদের সাহায্য করতে বলেছেন। তাই আমরা এসেছি। চলুন। দুজন প্রহরীর হাতে দুটো নেভানো মশাল।

—আমাদের একটা মশাল লাগবে। ফ্রান্সিস বলল।

—পাবেন। প্রহরী বলল।

ওরা মন্দিরের সামনে এল। সিঁড়ির কাছে এল। ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে প্রহরীদের বলল—একটা মশাল জ্বেলে দাও। প্রহরীটি চকমকি পাথর ঠুকে মশাল জ্বালিয়ে দিল।

এবার তিনজনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল! তারপরই সিঁড়ি নেমে গেছে। ওরা নামতে লাগল। সিঁড়ি অন্ধকার হয়ে গেল। এখন মশালের আলোতে দেখে দেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

সিঁড়ি শেষ। সেই চৌকোনো ঘরটি। ফ্রান্সিস সাইলকে মশালটা দিয়ে বলল— মশালটা ধরো। কিন্তু সাবধানে আগুনের একটা ফুলকিও যেন মেঝেয় না পড়ে। যদি পড়ে ধোঁয়া আর আগুনে আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত।

ফ্রান্সিস মশালের আলোতে ঘরটা ভাল করে দেখতে লাগল। হঠাৎ দেখল পাথরের একটা জোড়ের মধ্যে একটু ফাঁক রয়েছে। ফ্রান্সিস পাথরটায় ধাক্কা দিল। পাথরটা নড়ল। আবার জোরে ধাক্কা দিল। পাথর দুটো বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস পাথর দুটো খুলে রাখল। তারপর নিচু হয়ে ঐ খোঁদলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস এবার হাত বাড়িয়ে বলল—মশালটা দাও। এই ফোঁকরের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসো।

ফ্রান্সিস জ্বলন্ত মশাল তুলল। দেখল একটা বড় ঘর। ঘরভর্তি কঙ্কাল। শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে। সাহসী ফ্রান্সিসও একটু ঘাবড়ে গেল। অত কঙ্কাল দেখে সাইল আর রবার্ট ভয়ে শিউরে উঠল।

ফ্রান্সিস মশাল হাতে ঘরটা দেখতে লাগল। ফ্রান্সিসের কেমন মনে হল এই ঘর থেকে বেরোবার পথ নিশ্চয়ই আছে। ও দেয়ালগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস দেয়ালগুলো ধাক্কাতে লাগল। হঠাৎ একটা দেয়ালের অংশ নড়ে উঠলো। ফ্রান্সিস জোরে ঠেলা দিল। পাথরের অংশ খুলে গেল। বাইরে রোদ। ফ্রান্সিস ভেবে নিল এইবার পালাতে হবে। ও বাইরে আসছে তখনই রবার্ট ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস এক ঝটকায় ওকে ফেলে দিল। রবার্ট কোমর থেকে ছোরা বের করল। ফ্রান্সিস হাতের মশালটা দিয়ে রবার্টের মুখে জোরে এক ঘা লাগাল। রবার্টের হাত থেকে ছোরাটা খসে পড়ল। ও মুখ চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল। সাইল তখন বেরিয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস মশাল ছুঁড়ে ফেলে বনভূমির দিকে ছুটতে লাগল।

একবার পেছনে তাকিয়ে দেখল দুই প্রহরী ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস গতি বাড়াল। দুই প্রহরী কাছে আসার অনেক আগে ফ্রান্সিস বনভূমিতে ঢুকে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস কয়েকটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল সাইল ও রবার্টকে প্রহরীরা নিয়ে চলেছে। বোধহয় কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবে।

এবার ফ্রান্সিস হাঁটতে হাঁটতে বন পার হতে লাগল। বনতল বেশ অন্ধকার। সাবধানে পা ফেলে হাঁটতে হচ্ছে। তারই মধ্যে যতটা দ্রুত হাঁটা যায় ততটা দ্রুতই ফ্রান্সিস হাঁটতে লাগল। পূর্ণিমা উৎসবের দিনে রাতের আগে চিচেন ইতজায় পৌঁছুতে হবে।

ভীষণ পেছল গাছের গোড়ায় আছাড় খেল কয়েকবার। তবু ফ্রান্সিস থামল না। যতটা দ্রুত সম্ভব চলল।

বনভূমি শেষ। সামনেই বিস্তৃত প্রান্তর। বাঁদিকের রাস্তায় এল। রাস্তার দু'ধারে দেখতে দেখতে চলল বুড়িমার বাড়ির উদ্দেশ্যে। খুঁজে খুঁজে বুড়িমার

বাড়ি পেল। হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস দরজায় ধাক্কা দিল। ভেতরে কোন সাড়া নেই। এবার জোরে ধাক্কা দিল। দরজাটা নড়ে গেল।

—যাচ্ছি। বুড়িমার গলা দরজা খুলল। ফ্রান্সিস দেখে বলল—বুড়িমা, আমাকে চিনতে পারছেন? বুড়িমা কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল— চিনতে পারছি। আমার ছেলের বন্ধু। ছেলের সঙ্গে এসেছিল। একটু থেমে বলল—আচ্ছা আমার ছেলে এখন কোথায়?

—চিচেন ইতজায়। ও সুস্থ। আনন্দে আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখা হলে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো। বুড়িমা বলল।

—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আপনার ছেলেকে গেলেই ধরে নিয়ে আসবো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

বুড়িমা বলল—এসো। ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকল। পাতা বিছানায় বসল। বলল—বুড়িমা, একটা কথা।

—কী কথা?

—বলছিলাম, রাজা তুতজের প্রহরীদের হাত থেকে আমি পালিয়ে এসেছি। বিকেল হয়ে এলো। এখনও একটা বাসি রুটি একটু মধু খেয়ে আছি। আপনি যদি একটু খেতে দিতেন।

—দেব বৈ কি। বল তো তোমাকে রেঁধে খাওয়াতে পারি। তুমি আমার ছেলের বন্ধু।

—তাহলে আমাকে কিছু খেতে দিন। আমার হাতে সময় কম। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। বস। বুড়িমা বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বুড়িমা একটা কাঠের থালা নিয়ে এল। ফ্রান্সিসের দিকে থালাটা এগিয়ে ধরে বলল—এই সামান্য খাবারই আছে।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস কাঠের থালাটা নিল। দেখল—বেশ কিছু মাংসের বড়া আর হাতে তৈরি কেক।

ফ্রান্সিস গোগ্রাসে খেতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব শেষ। বুড়িমা জলের ঘটি দিল। ফ্রান্সিস ঢক্ ঢক্ করে জল খেল। বলল—বুড়িমা আর কিছু বড়া হবে? রাস্তায় খেতাম।

—খাও না। বুড়িমা বলল।

—আপনি?

—রান্না করে খাব।

—ফ্রান্সিস বলল—একটা কাপড়ের টুকরোয় বেঁধে দেবেন।

বুড়িমা চলে গেল। একটু পরেই কাপড়ের থলেতে মাংসের বড়া বেঁধে নিয়ে এল। ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস ওটা কোমরের ফেট্টিতে গুঁজে রাখল।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—বুড়িমা আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো—

—ধন্যবাদের দরকার নেই। তুমি আমার ছেলেকে নিয়ে এসো। বুড়িমা বলল।

ফ্রান্সিস রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রাস্তায় তেমন ভিড় নেই। ঘোড়ায় টানা গাড়ি যাচ্ছে আসছে। একটা গাড়িতে দেখল খুবই ভিড়। গাড়িটা থামল। ঘোড়াটাকে জল, ছোলা খাওয়ানো হচ্ছে। তখনই ফ্রান্সিস একজনকে জিজ্ঞেস করল—আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

—চিচেন ইতজা—পূর্ণিমা উৎসবে।

—দেখুন আমার ভাড়া দেবার ক্ষমতা নেই। আমাকে নিয়ে যাবেন?

—বিনি ভাড়ায়? পাগল? আমরা দুদিন আগেই ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। কত লোককে নেওয়া হল না—জায়গা নেই বলে। আর বিনা ভাড়ায় যেতে চাইছেন? লোকটি বলল। ফ্রান্সিস সরে এল। হাঁটতে লাগল।

রাত হল। ফ্রান্সিস সমানে হেঁটে চলল। রাত হয়েছে। মাংসের বড়া শেষ। ফ্রান্সিস অন্ধকারে হেঁটে চলল। জল তেষ্টা পেয়েছে। বেশ খিদেও পেয়েছে।

একটা মোড়ে স্ত্রীলোক কয়েকজনের ভিড়। ফ্রান্সিস কাছে এল। দেখল একটা বড় ইদারা। একজন স্ত্রীলোক একটা লোহার পাত্রে জল তুলতে লাগল। দড়ি বাঁধা পাত্রটি ওপরে তুলল। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। মুখের কাছে হাত পাতল। স্ত্রীলোকটি ফ্রান্সিসকে জল খেতে দিল। ফ্রান্সিস জল খেল। জল নিয়ে চোখ মুখে ঝাপটা দিল। মুখ তুলল। তেষ্টা মিটল।

ফ্রান্সিস হাঁটতে লাগল। এতক্ষণ আকাশে মেঘ ছিল। চাঁদ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ বৃষ্টিও হল। ফ্রান্সিস বড় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বৃষ্টি থেমে যেতেই আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ দেখা গেল। চারদিকে চাঁদের আলো। সব কিছু রাস্তা বাড়িঘর গাছপালা সব পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল। ফ্রান্সিস আনন্দে দু'হাত তুলে ওদের ভঙ্গিতে জিগির দিল—ও—হো—হো।

এবার আর একটা মোড়ে এল। একটা দোকানে বেশ ভিড়। ফ্রান্সিস দোকানটায় ঢুকল। দেখল শরতের দোকান। দোকানের দুদিকে দুটো বেঞ্চি মতো কাঠের পাটাতন রাখা। ফ্রান্সিস বসে পড়ল।

দোকান মালিক কাঠের গ্লাসে সরবৎ দিচ্ছে। ফ্রান্সিসও একটা গ্লাস নিল। সরবৎ খেতে লাগল। কী কী মিশিয়ে সরবৎ তৈরি সেটা তো জানার উপায় নেই। তবে শরবৎটা খেয়ে গায়ে বেশ জোর পেল। হাঁটার ক্লান্তিটা কমে গেল। ফ্রান্সিস বেরোতে গেল। দোকানের মালিক হাত পাতল। ফ্রান্সিস বলল—আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলছি। একটা গুণ্ডার জন্যে আমি বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এক বন্ধুর কাছে অর্থ দামী জিনিস থাকে। আমার কাছে এখন রাজার একটা মুদ্রা নেই। আমি দাম দিতে পারবো না।

মালিক জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল—না—না। যেভাবে পারো দাম দাও।

সেত্যি বলছি আমার থলি শূন্য।

—আমি সেসব বুঝি না দাম দাও। নইলে তোমাকে বেঁধে রাখা হবে। কাল সকালে শাস্ত্রী এলে তোমাকে ধরিয়ে দেব।

ফ্রান্সিস হো হো করে হেসে উঠল। যারা খাচ্ছিল তারা অনেকেই ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে দেখল।

একজন লম্বামতো লোক ফ্রান্সিসের কাছে এগিয়ে এল। সে মালিককে বলল—কী হয়েছে?

—দেখুন না এই লোকটা শরবৎ-এর দাম না দিয়ে পালাতে চাইছে। ফ্রান্সিস মালিকের সামনে এগিয়ে এল। দাঁত চাপা স্বরে বলল—মিথ্যে বলো না। আমি পালাতে চেষ্টা করি নি। মালিক ফ্রান্সিসের চোখের দিকে তাকিয়ে বেশ ঘাবড়ে গেল। চুপ করে রইল। লম্বা লোকটি কোমর থেকে একটা ভেলভেটের থলে বের করল। বলল—কত পাওনা হয়েছে আপনার?

—দুই মুদ্রা।

—এই নিন। লম্বা লোকটি মুদ্রা দিয়ে বলল—আর একটি কথাও নয়। চলে যান এখান থেকে। মালিক প্রায় দৌড়ে চলে গেল। লম্বা লোকটি ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে এল। মোমবাতির আলোয় ফ্রান্সিস দেখল—ভদ্রলোকের গায়ে বেশ দামী পোশাক। লোকটি ফ্রান্সিসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল ইউবেক। ফ্রান্সিসও হাতটা ধরে বলল—ফ্রান্সিস। দুজনে করমর্দন করল।

—আসুন একটু কথা বলি। ইউবেক বলল। দুজনে কাঠের পাটাতনে বসল। ইউবেক বলল—আপনি বিদেশী। এখানে এলেন—কী জন্যে?

—সে আরেক কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু একটু শুনি।

ফ্রান্সিস অল্প কথায় নিজেদের দল বেঁধে দেশে দেশে ঘোরা, গুপ্তধন আবিষ্কার এসব বলল।

—আপনি কোথায় যাবেন? ইউবেক বলল।

—চিচেন ইতজা—পূর্ণিমা উৎসবে। ফ্রান্সিস বলল।

—সে তো আমরাও যাচ্ছি। আমরা ঘোড়ার গাড়ি চড়ে যাচ্ছি। গাড়োয়ানকে বলে দেখি আর একজনকে নিয়ে যাওয়া যাবে কি না। চলুন।

দুজনেই উঠল। ইউবেক বলল—আপনি তখন হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন কেন? ফ্রান্সিস হেসে বলল—কত কত বহুমূল্যবান অলঙ্কার সোনার চাকতি একটা বিরাট সোনার ঘণ্টা—এসব গুপ্তধন আমি বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার করেছি। আর আজ আমার পকেটে একটা তামার মুদ্রাও নেই।

—যাক গে এই নিয়ে দুঃখ করবেন না। আমরা এবার যাবো। ইউবেক গলা চড়িয়ে বলল—বন্ধুরা—গাড়িতে এসো। ইউবেক-এর বন্ধুরা দোকান থেকে বেরিয়ে এল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল একটা দুই ঘোড়া টানার গাড়ি দাঁড়িয়ে। ইউবেক-এর বন্ধুরা গাড়িতে উঠতে লাগল। ইউবেক ফ্রান্সিসকে নিয়ে গাড়োয়ানের কাছে গেল। ডাকল—বিভান?

—বলুন স্যার। বিভান বলল।

—আমাদের গাড়িতে একজন লোক নেয়া যেতে পারে? ইউবেক বলল।

—গাড়ির ভেতরে আর জায়গা হবে না। উনি আমার পেছনে বসতে পারেন। তবে বেশ কষ্ট হবে।

—আমি ওভাবে যেতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

ইউবেক আর বন্ধুরা গাড়িতে উঠল। ফ্রান্সিস বিভানের পেছনে টানা কাঠের ওপর বসল।

বিভান মুখে শব্দ করে চাবুক মারল। তখনই বিভানের কনুই ফ্রান্সিসের পাঁজরায় গুঁতো দিল।

ফ্রান্সিস বুঝল—বিভান যতবার চাবুক মারবে আবার একটু গুঁতো খেতে হবে। ফ্রান্সিস পরেরবার একটু কাত হয়ে গুঁতো এড়াল। এটা বারবারই হতে লাগল।

রাস্তায় গাছগাছালিতে জোৎস্না ছড়ানো। ঘোড়ার ক্ষুরের টক্ টক্ শব্দ। নিশাচর পাখি গাছের ডালের মধ্যে দিয়ে উড়ে গেল। আনন্দে ফ্রান্সিসের মন ভরে গেল।

বাকি রাতটা না ঘুমিয়েই কাটল। অবশ্য এমন একটা জায়গায় ফ্রান্সিসকে বসতে হয়েছে যেখানে ঘুমোনো অসম্ভব।

পূবদিকের আকাশে কমলা রং ধরল। একটু পরেই সূর্য উঠল। ভোরের স্নিগ্ধ আলো ছড়াল। ঠাণ্ডা বাতাস বইল।

গাড়ি যখন চিচেন ইতজায় পৌঁছল তখন বিকেল। একটা সরাইখানার সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। ফ্রান্সিস নামল। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। কোমর, পা যেন অসাড় হয়ে গেছে।

ইউবেকের কাছে এল ফ্রান্সিস। অনেক ধন্যবাদ জানাল। ইউবেক বলল, আমাদের সঙ্গে খাবেন চলুন।

—উপায় নেই। আমাকে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুদের কাছে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস দ্রুত হাঁটতে লাগল। কোমরে পায়ের ব্যথাটা কমে গেছে। রাস্তায় বেশ ভিড়। আজকে রাতেই পূর্ণিমা উৎসব।

সরাইখানার সামনে এল ফ্রান্সিস। তখনও হাঁপাচ্ছে। দরজা থেকেই গলা চড়িয়ে ডাকল—হ্যারি—শাঙ্কো। হ্যারি, শাঙ্কো শুয়ে ছিল। দুজনেই উঠে

দু'জনের কোমরের ফেট্টি খুলে নিল ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো। যার হাতে বর্শা ছিল তার হাতটা শাঙ্কো পা দিয়ে চেপে ধরল। প্রহরীটি বর্শা ছেড়ে দিল। এবার ফেট্টি দিয়ে দু'জনের মুখ বাঁধা হল। প্রহরী দু'জন চেঁচিয়ে ওঠারও সময় পায়নি—এত দ্রুত দু'জনের কোমরের ফেট্টি চেপে বাঁধা হল মুখ। তারপরে কাটা দড়ি দিয়ে দু'জনের হাত বাঁধা হল। একজন প্রহরী মুখে গোঁ গোঁ শব্দ করছিল। ফ্রান্সিস তার মুখে জোরে এক চড় কষাল। গোঙানি বন্ধ হয়ে গেল।

এবার প্রহরী দু'জনকে তাদের থাকার ঘরের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। একটা ঘরের দরজা খুলে দু'জনকে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস একজন প্রহরীর ফেট্টি খোলার সময় ঘরের চাবিটা পড়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সিস সেটা তুলে নিজের কোমরের ফেট্টিতে রেখেছিল।

এবার সেই চাবি দিয়ে ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে ফ্রান্সিসরা মন্দিরের ডান দিকের দেওয়ালের কাছে এল। তখনই ফ্রান্সিস বলে উঠল, "হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে। আসার সময় একটা কুড়ুল আনতে ভুলে গেছি। কিন্তু দেরি করা যাবে না। শাঙ্কো একটা কুড়ুল নিয়ে এসো। নইলে সব চেষ্টা বৃথা।"

শাঙ্কো প্রহরীদের ঘরের কাছে এল। প্রহরীদের নিশ্চয়ই এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হয়। তা হলে কাঠকুটো জোগাড় করতে হয়। কাঠ কাটতেও হয়। তার মানে কুড়ুল লাগে।

শাঙ্কো প্রহরীদের যে ঘরে আটকে রাখা হয়েছে তার পাশের ঘরটার দোরগোড়ায় এল। ঘরটার বারান্দায় চাঁদের উজ্জ্বল আলো পড়েছে। সেই উজ্জ্বল আলোয় ঘরের অন্ধকার অনেকটা দূরীভূত হয়েছে। শাঙ্কো ঘরে ঢুকল। দেখল—একপাশে কাঠটাঠ রাখা। শাঙ্কো কাঠগুলোর কাছে এল। দেখল পাশেই একটা কুড়ুল পড়ে আছে। শাঙ্কো কুড়ুলটা তুলে নিল। বাইরে এল। দেখল, কুড়ুলটা ছোট। কিন্তু মুখটা বেশ ধারালো। শাঙ্কো ফিরে এল।

ফ্রান্সিস কুড়ুলটা নিল। কুড়ুলটা ছোট হয়ে ভাল হয়েছে।

এবার ফ্রান্সিস জংলা গাছ ঝোপের মধ্যে দিয়ে দেওয়ালের কাছে এল। দেওয়ালের নীচের দিকে পাথরের পাটা ভেঙে পা রাখার ব্যবস্থা সেই বয়স্ক লোকটি করে রেখেছিল।

ফ্রান্সিস খোঁদলে পা রেখে রেখে অনেকটা উঠে এল। এই খোঁদলগুলো সেই বয়স্ক লোকটি কুড়ুল চালিয়ে ভেঙে ভেঙে করেছিল। এবার ফ্রান্সিস চাঁদের আলোয় দেখে দেখে পাথরের পাটায় কুড়ুল চালিয়ে খুলে ফেলতে লাগল। আর সব লোকজন পূর্ণিমার উৎসবে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অস্পষ্ট গানবাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কুড়ুল চালাবার শব্দ আর কে শুনবে বন্দি প্রহরী দু'জন ছাড়া।

আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিস উঠতে লাগল। একটা-দুটো পাথরের পাটা খসিয়ে ফ্রান্সিস নীচে ফেলে দিচ্ছে। ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্রান্সিস দেওয়ালের মাথায় উঠে গেল। নীচে দাঁড়ানো হ্যারি, শাঙ্কো, আলফান্সো তাকিয়ে আছে ফ্রান্সিসের দিকে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় ফ্রান্সিসকে ওরা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

এবার ফ্রান্সিস দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে কুঠুরিতে যাওয়ার কাঠের আর গুঁড়ো পাথরচুন দিয়ে তৈরি লম্বা অংশটা দেখল। এখান থেকে সাঁকোর মতো ওটার ওপর দিয়ে হেঁটে কুঠুরি দুটোয় যাওয়া যাবে।

ফ্রান্সিস চারদিক ভাল করে দেখে নিল। না—কুঠুরিতে যাওয়ার অন্য কোনও পথ নেই। ফ্রান্সিস সেই পাটাতন দিয়ে তৈরি পথটায় ডান পা রাখল। পা দিয়ে চাপ দিয়ে বুঝল দীর্ঘদিনের রোদ বৃষ্টি জলে পাটাতনটা বেশ নরম হয়ে গেছে। পায়ের চাপ দিলে দোল খাচ্ছে ওই পাটাতনটা।

ফ্রান্সিস চাঁদের আলোয় সব দেখতে পাচ্ছিল। পা-টা তুলে এনে নিচু হয়ে হাত রাখল ওই পাটাতনে। স্পষ্ট বুঝল পাটাতনটা পড়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস হাত তুলে নিয়ে এবার আবার বাঁ-পাটা রাখল। চাপ দিয়ে দাঁড়াতে গেল। পাটাতনটায় কড়কড় শব্দ হল। ফ্রান্সিস বুঝল ওই পাটাতনে একটু বেশি চাপ পড়লে ভেঙে পড়বে।

ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে নকল নকশাটা বের করল। হ্যারি নকশাটা নকল করে রেখেছিল। ভাল করে দেখল—ওই অস্পষ্ট রেখাটা কুঠুরির দিকেই যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তা অসম্ভব। হয়তো পাথরকুচি চুন বালি জল মিশিয়ে দেওয়া আস্তরণটা আগে শক্ত ছিল। কিন্তু এখন রোদ বৃষ্টিতে পাটাতনটা নরম হয়ে গেছে। অল্প ধাক্কায় ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফ্রান্সিস কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। হ্যারিদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে মনস্থির করতে পারত। কিন্তু এখন তার উপায় নেই। পাটাতন ভেঙে গেলে কুঠুরি দুটোও ভেঙে পড়বে। সেই ভগ্নস্তূপেই খুঁজতে হবে রাজা হুনাকমিনের গুপ্ত ধনভাণ্ডার।

এবার ফ্রান্সিস নীচের দিকে তাকাল। দেখল শাঙ্কো ওরা ডান দিকের দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে ফ্রান্সিসের দিকে। কুঠুরি ভেঙে পড়লে ওদের কিছু হবে না। তবু সাবধানের মার নেই। ফ্রান্সিস দু'হাতের তালু গোল করে নীচের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে নিজেদের ভাষায় বলে উঠল, "কুঠুরি ভেঙে পড়বে। সাবধান।" হ্যারিরা আরও সরে গেল।

পাটাতনের কাছে এসে দাঁড়াল ফ্রান্সিস। ডান পা নামিয়ে পাটাতনে পায়ের চাপ দিতে লাগল। দু-চারবার জোরে পায়ের চাপ দিতেই কুঠুরি দুটো সশব্দে ভেঙে পড়ল সিঁড়ির ওপর। চারদিকে নৈঃশব্দের মাঝখানে বেশ জোরালো শোনাল শব্দটা। চুনের গুঁড়ো ছড়িয়ে গেল। সাদা আস্তরণ সৃষ্টি করল। হ্যারিরা চুনের সাদাটে আস্তরণ উড়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ফ্রান্সিস যত দ্রুত সম্ভব নেমে এল।

সাদা চুনের আস্তরণ উড়ে গেল। এবার সকলে ধ্বংসস্তূপের কাছে এল। চাঁদের আলোয় দেখতে লাগল যদি গুপ্তধনের কিছু নজরে পড়ে। কিন্তু চুনাপাথর বালি ছাড়া কিছু নেই।

শাঙ্কো বলল, "ফ্রান্সিস ওই কুঠরি দুটোর কোনওটাতে গুপ্তধন ছিল না।"

"না, না" ফ্রান্সিস বলল, "এখনও সেটা প্রমাণিত হয়নি। সব পাথরটাথর সরাও।"

সকলে হাত লাগাল। ধুলো-পাথর ভাঙা কাঠ সরিয়ে দেখতে লাগল। এক জায়গায় প্রায় আধখানা দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। শাঙ্কো দেওয়ালটা বেশ গায়ের জোর খাটিয়ে তুলে ফেলল। তখনই দেখা গেল একটা লম্বাটে বাক্স। গুঁড়ো চুনের মধ্যে। শাঙ্কো বলে উঠল, "ফ্রান্সিস, এই বাক্সটা দ্যাখো।" ফ্রান্সিস ছুটে এল। বাক্সটা দেখে বলল, "রাজা হুনাকমিনের এই গুপ্তভাণ্ডার এখন আমাদের হাতে।" ফ্রান্সিস কোমর থেকে ফেট্টিটা খুলল। বাক্সটার গায়ে লেগে থাকা চুনের ধুলো মুছল। দেখা গেল কালো কাঠের বাক্সটার গায়ে সোনার মিনে করা ফুল, লতা-পাতা। মাঝখানে নৃত্যরত হরিণ। রাস্তায় লোকজনের কথাবার্তা শোনা গেল। উৎসব শেষ। সকলে বাড়ি ফিরছে। ফ্রান্সিস ফেট্টির কাপড়টা দিয়ে বাক্সটা জড়াল। তারপর চাপাস্বরে বলল, "আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। চলো সব।"

ওরা মন্দিরের চত্বর পার হচ্ছে তখনই প্রহরীদের একজনের চাপা কথা শুনতে পেল, "বাঁচাও, বাঁচাও।"

ওরা দ্রুত ছুটে এসে রাস্তায় উঠল। বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল সরাইখানার দিকে। এখন সড়কপথ জনশূন্য নয়। উৎসব থেকে লোকজন ফিরছে। কথাবার্তায় খুশির ধ্বনিতে ভরে উঠেছে বড় রাস্তাটা।

গুপ্তধনের বাক্সটা ফ্রান্সিস ফেট্টির কাপড় চাপা দিয়ে নিয়ে চলেছে।

ভোর ভোর ওরা সরাইখানায় পৌঁছল। নিজেদের জায়গায় এসে বসল। হ্যারি বলল, "ফ্রান্সিস, তুমি কি নিশ্চিত যে গুপ্তধন এই কাঠের বাক্সটাতেই আছে?"

"আমি নিশ্চিত—এই বাক্সটাতেই রাজা হুনাকমিন তাঁর গুপ্তধন রেখে গেছেন। নকশায় দ্যাখো এক নৃত্যরতা হরিণের ছবি আছে। বাক্সের ওপরেও সেই ছবিটাই মিনে করে করা।"

"এখন বাক্সটা কি খুলবে?" হ্যারি বলল।

"না, এখানে নয়। তুলাম যাব—আমাদের জাহাজে উঠব, তারপর।" আলফান্‌সো বলল, "আমার একটা কথা ছিল। আমাকে বলেছিলেন—"

ফ্রান্সিস বলে উঠল, "ঠিক, ঠিক। আমার মনেই ছিল না। হ্যাঁ। হ্যারি আলফান্‌সো নতুন করে জীবন শুরু করুক, ওইজন্যই আমি ওকে গুপ্তধনের কিছু অংশ দেব।"

"তা হলে তো বাক্স খুলতেই হয়।" হ্যারি বলল।

"ঠিক আছে।" কথাটা বলে ফ্রান্সিস ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে দেখল। উৎসব শেষ। অনেক লোক চলে গেছে। পাঁচ-ছ'জন লোক এদিক-ওদিক শুয়ে-বসে আছে। ফ্রান্সিস বলল, "এখন খোলা যাবে। কিন্তু আসল জিনিসটাই তো নেই। বাক্সটার চাবি কোথায়?"

শাঙ্কো বলল, "উপায় নেই ফ্রান্সিস, বাক্সটা ভাঙতে হবে।"

"বুঝলাম, কিন্তু কীভাবে ভাঙবে।" ফ্রান্সিস বলল।

"একটা সরু লম্বা পেরেক চাই। তা হলেই তালাটা ভাঙা যাবে।" শাঙ্কো বলল।

"তা হলে সেইরকম একটা পেরেক জোগাড় করো।" ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি বলল, "শাঙ্কো, বাক্সটা এখানে ভাঙা উচিত হবে না। এখানে লোক কম থাকলেও বাক্স ভাঙা আর ভাঙা বাক্স থেকে সোনা, মণি-মাণিক্য বের হলে এই কয়েকজনের নজরে পড়বেই। দৃশ্যটা সাধারণ দৃশ্য থাকবে না। অত দামী দামী জিনিস, এরাই হয়তো আমাদের কাবু করে সব মূল্যবান জিনিস নিয়ে পালাতে পারে।"

"তা হলে তুমি কী বলো?" ফ্রান্সিস বলল।

"এই সরাইখানার পেছনেও দু-একটি ঘর আছে। রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘর। এখন সকালের খাবার তৈরি হচ্ছে। রাঁধুনিরা সব রান্নাঘরে। ভাঁড়ার ঘর ফাঁকা। ওখানে গিয়ে বাক্স ভাঙতে হবে। তা হলে আর কারও কিছু সন্দেহ হবে না। সবচেয়ে বড় কথা, মূল্যবান কিছুই কারও নজরে যেন না পড়ে।" ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল, "হ্যারি ধন্যবাদ। এতটা আমি ভাবিনি। তা হলে শাঙ্কো—যাও। রাঁধুনিদের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করো। সেই সঙ্গে পেরেকের খোঁজটাও করো।"

শাঙ্কো চলে গেল। পেছনে রান্নাঘরে এল। দেখল দু'জন খাবার তৈরি করছে। একজন সেসব কাঠের গামলায় তুলছে।

শাঙ্কো সেই পরিবেশনকারীকে বলল, "আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল।"

"বলুন।" লোকটি বলল।

"আপনাদের পাশের ভাঁড়ার ঘরের তো কেউ নেই এখন?" শাঙ্কো বলল।

"না। কেন বলুন তো?" লোকটি বলল।

"একটা বাক্স আমাদের সঙ্গে ছিল। তার চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি না। কাজেই বাক্সটা ভাঙতে হবে। আপনাদের ভাঁড়ার ঘরে বাক্সটা নিয়ে গিয়ে তালা ভাঙব। এখন আপনারা যদি অনুমতি দেন।"

শাঙ্কোর এত সম্মান দিয়ে কথা বলায় রাঁধুনি খুব খুশি। বলল, "যান না।"

"তখন ওই ঘরে কেউ যাবে না তো?" শাঙ্কো বলল।

"না। কেউ যাবে না।" লোকটি বলল।

"আচ্ছা, আপনারা তো কখনও বস্তাটস্তা সেলাই করেন। সেইরকম সূচ আছে আপনাদের কাছে?" শাঙ্কো বলল।

"ওরকম দুটো সূচ আছে আমাদের।" লোকটি বলল।

"তার একটা পাব?" শাঙ্কো বলল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভাঁড়ার ঘরের কাঠের তাকের ওপর আছে।" লোকটি বলল।

"ঠিক আছে। তা হলে আমাদের বাক্সটা নিয়ে আসছি।" শাঙ্কো বলল।

"আসুন।" রাঁধুনি বলল।

শাঙ্কো এসে সব বলল। ফ্রান্সিস হেসে বলল, "শাবাশ শাঙ্কো।"

সকলে ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলল। শাঙ্কো কাপড় জড়ানো বাক্সটা নিয়ে চলল।

ভাঁড়ার ঘর এই সকালেও একটু অন্ধকার-অন্ধকার। শাঙ্কো তাকটায় হাত দিয়ে খুঁজল। দুটো সরু সূঁচ পেল। দু-তিনটে কাঠের পাটাতনের ওপর আটা-ময়দা এসবের বস্তা রাখা। শাঙ্কো সেই পাটাতনের ওপর বাক্সটা রাখল। তারপর চাবির ফুটোয় সূঁচটা ঢুকিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাতে লাগল। কিন্তু বাক্স খুলল না। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর হাত থেকে সূচটা নিল। ঘোরাতে লাগল। কিন্তু তালা খুলল না। ফ্রান্সিস বলল, "এভাবে খোলা যাবে না। ভেতরের তলাটা ভাঙতে হবে। তার জন্য লম্বা পেরেক, হাতুড়ি চাই। শাঙ্কো, দ্যাখো একটা হাতুড়ি, পেরেকের ব্যবস্থা করতে পারো কি না।"

শাঙ্কো আবার সেই রাঁধুনির কাছে গেল। দেখল সেই রাঁধুনি নেই। অন্য রাঁধুনি বলল, "ও সকালের খাবার দিচ্ছে। কিছু পরে আসবে।"

শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল, "বাক্সটা নিয়ে চলো সকালের খাবারটা খেয়ে আসি। তারপর তো হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে।"

সকলে সকালের খাবার খেতে এল। খাওয়ার পর ওরা চলল পেছনের ভাঁড়ার ঘরের দিকে। শাঙ্কো চলল সরাইখানার মালিকের কাছে। হাতুড়ি, পেরেক চাই। মালিক বলল কিছু পেরেক একটা কাঠের বাক্সে ছিল। হাতুড়িও ছিল। কিন্তু এখন কোথায় সেগুলো সে জানে না। খুঁজতে হবে।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল সব। ফ্রান্সিস বলল, "তা হলে হাতুড়ি, পেরেক খোঁজা যাক।"

শাঙ্কো চারদিকে যখন তাকিয়ে দেখছে, তখনই নজরে পড়ল কুড়ুলটা। পাশেই কাঠের চ্যালা রাখা। শাঙ্কো ছুটে কুড়ুলটা নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বলল, "কী হলো?"

"কুড়ুল দিয়ে বাক্সটার তালার জায়গাটা ভেঙে ফেলব।" শাঙ্কো কথাটা বলে বাক্সটা মাটির মেঝেয় রাখল। তারপর কয়েকটা চ্যালাকাঠ নিয়ে এল। কুড়ুল দিয়ে কাটতে লাগল। আলফান্‌সো বলল, "আপনি কী করছেন?" শাঙ্কো কোনও কথা বলল না। হ্যারি ব্যাপারটা বুঝতে পারল না।

ফ্রান্সিস বলে উঠল, "শাবাশ শাঙ্কো।"

"আর ব্যাপারটা কী?" হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, "শাঙ্কো কাঠের বাক্সে কুড়ুল চালাবার আগে কাঠ কাটছে। সবাই কাঠ কাটছে এইটাই বুঝবে। তার মধ্যেই শাঙ্কো বাক্সটায় কুড়ুলের ঘা বসাবে। সকলে ভাববে কাঠই কাটা হচ্ছে। অন্য কিছু নয়।" ফ্রান্সিসের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাঙ্কো কাঠের বাক্সের চাবির ছিদ্রের ফুটোটার ওপর জোরে কুড়ুল চালাল। বাক্সটার ডালাটা ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে বাক্সটার ভাঙা ডালাটা তুলতে গেল। তখন সকলে ভাঙা বাক্সটার কাছে এল।

ফ্রান্সিস ভাঙা ডালাটা টান দিতেই উঠে এল। মণিমাণিক্যে ভর্তি ভাঙা বাক্সটা। কতরকম গয়না, অলঙ্কার। সেগুলো থেকে হীরের দ্যুতি বের হচ্ছে। ফ্রান্সিস ওপর থেকে বিচিত্র নকশার গয়নাগাঁটিগুলো নামিয়ে রাখল। সেসবের নীচেই অনেক স্বর্ণমুদ্রা।

সেই অতি মূল্যবান অলঙ্কার, মিনে করা ছোট্ট ছুরির বাঁট, সোনার ফ্রেমে বাঁধানো আয়না এসব দেখে আলফান্‌সোর চোখ তখন ছানাবড়া। এত মূল্যবান জিনিস! ফ্রান্সিস, হ্যারি, শাঙ্কোর কাছে এরকম ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। কাজেই ওরা অবাক হল না।

ফ্রান্সিস বলল, "হ্যারি, শাঙ্কো এসব এখানেই ভাগ করে আমরা নিয়ে যাব। কী বলো?"

"বাক্স ঢেকে রাখো।" হ্যারি বলল।

"শুধু বাক্স ঢেকে রাখা নয়। একেবারে এখানেই সব সেরে নিই। এ রকম শূন্য ঘর এখানে আর কোথাও পাব না।" ফ্রান্সিস বলল।

"ঠিক আছে। যা করার তাড়াতাড়ি করো।" হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস বাক্স থেকে সোনার মুদ্রাগুলো সব তুলতে তুলতে বলল, "হ্যারি তোমার কোমরের ফেট্টিটা খুলে পাতো।" হ্যারি ফেট্টি খুলে পাতল। ফ্রান্সিস সোনার মুদ্রাগুলো সেই কাপড়ে ঢালল। তারপর কাপড়টা পেঁচিয়ে নিয়ে তার মধ্যে সোনার মুদ্রাগুলো বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিল।"

"আলফান্‌সো, আমরা এখন চলে যাব। আমরা আর দেরি করতে পারব না। তুমি কাঠের বাক্সে অলঙ্কারগুলো ভরে কোমরের ফেট্টি খুলে তাতে বেঁধে নাও। বাক্সটা এখানেই রেখে দাও।" ফ্রান্সিস বলল।

"কিন্তু বাক্সটার গায়ে সোনার গিল্টিগুলো রয়েছে।" আলফান্সো বলল।

"বেশি লোভ কোরো না। যাক্‌গে, তোমাকে কেন এত অলঙ্কার দিলাম এবং এসব নিয়ে তুমি কী করবে তা আমি আগেই তোমাকে বলেছি। তুমিও রাজি হয়েছ। কথার খেলাপ কোরো না।" ফ্রান্সিস বলল।

"না ফ্রান্সিস। আপনার সব নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।" আলফান্সো বলল।

"ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?" হ্যারি বলল।

"দুপুরের খাওয়াটা খেয়ে সমুদ্রতীরের তুলাম নগরের দিকে রওনা হব। বন্ধুরা নিশ্চয়ই আমাদের কোনও খবর না পেয়ে চিন্তায় পড়েছে।

ফ্রান্সিসরা দুপুরের খাওয়া খেল। স্বর্ণমুদ্রায় ভরা পুঁটুলিটা হ্যারির কাছ থেকে নিল। শাঙ্কোকে দিয়ে বলল, "কোমরে পেঁচিয়ে নাও।" শাঙ্কো পুঁটুলিটা লম্বা করে কোমরে বেঁধে নিল।

ফ্রান্সিস বলল, "আলফান্সো, বাক্সটা এখানে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি কোমরের ফেট্টিটা খুলে বাক্সটাও জড়িয়ে নাও। কেউ যেন না দ্যাখে। তারপর তোমাকে কী করতে হবে বলেছি।"

আলফান্সো ফ্রান্সিসের ডান হাতটা জড়িয়ে ধরল। কান্না-ভেজা গলায় বলল, "আপনি আমাকে নতুন জীবন দান করলেন। এই জীবনই আমি ছেলেবেলা থেকে কামনা করেছি। আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব জানি না।"

ফ্রান্সিস হেসে আলফান্সোর পিঠে আস্তে চাপড় দিল। বলল—"তা হলে আলফান্সো, আমরা জাহাজে বন্ধুদের কাছে ফিরে যাচ্ছি। চলি।"

ফ্রান্সিস, হ্যারি, শাঙ্কো সরাইখানার পাওনা মিটিয়ে রাস্তায় নামল। আলফান্সো তখনই তাড়াতাড়ি ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল, "আপনাদের অতটা পথ হেঁটে যেতে কষ্ট হবে। আমি একটা শস্যটানা গাড়ি নিয়ে আসছি। আপনারা অপেক্ষা করুন।"

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে পড়ল। আলফান্সো ডানদিকের গলিপথে ঢুকল। কিছুক্ষণ পরে ও একটা শস্যটানা গাড়িতে চড়ে এল। গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাড়া ঠিক করে দিল।

ফ্রান্সিসরা গাড়িটাতে উঠল। এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি চলল কোবা নগরের দিকে।

ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে ওরা কোবা নগরে পৌঁছল। সেখানে এক সরাইখানায় রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে একটা গাড়ি ভাড়া করে চলল তুলাম নগরের দিকে।

বিকেলের দিকে তুলাম নগরে পৌঁছল। জাহাজঘাটায় এল। দূর থেকে বন্ধুরা ফ্রান্সিসদের দেখতে পেল। অনেকটা ছুটে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো।

সকলে জাহাজে উঠল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, "ভাইসব, এবার আমি বাধ্য হয়ে গুপ্তধনের অংশ নিয়েছি। বাকিটা একজন বিশ্বস্ত লোককে দিয়েছি। এবার চলো আমাদের মাতৃভূমির দিকে।"

বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গে পাল খাটাতে চলল। ঘড়ঘড় শব্দে নোঙর তোলা হল। জাহাজ চলল। জোর বাতাসে পালগুলো ফুলে উঠল। দাঁড় টানার প্রয়োজন নেই। সমুদ্রের জলের ঢেউ ভেঙে জাহাজ চলল।

পাথরের ফুলদানি

পাথরের ফুলদানি

গতকাল গভীর রাতে পেড্রো সমুদ্রতীর দেখেছিল। কয়েক মাস পর ওরা ডাঙার খোঁজ পেল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা খুশিতে তখন লাফালাফি করছে। ফ্রান্সিসেরও ঘুম ভেঙে গেল। মারিয়াও খুশি। বলল—ডাঙা দেখা গেছে। ঐ ডাঙায় যারা থাকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে জানা যাবে আমরা কোথায় এলাম। আমাদের দেশই বা কতদূরে।

—হ্যাঁ। তা জানা যাবে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বিছানা থেকে উঠে বলল—কিন্তু অজানা জায়গায় নামা বিপজ্জনক।

—সেই ভয় পেলে তো কিছুই করা যায় না। মারিয়া বলল।

তখনই দরজায় টোকা দেবার শব্দ হল। ফ্রান্সিস দরজা খুলল। হ্যারি দাঁড়িয়ে। হ্যারি হেসে বলল—ডাঙা দেখা গেছে। এখন এটাই ভাববার যে আমরা এখানে নামবো কি না।

ফ্রান্সিস বলল—নেমে লোকজনের দেখা পেলে তবে তো বুঝতে পারবো কোথায় এলাম।

—তা তো বটেই—ফ্রান্সিস বলল—এখন ভোর হয়ে আসছে। তৈরি হয়ে যেতে যেতে সকাল হয়ে যাবে। তখন ঐ ডাঙায় যাওয়া বিপজ্জনক।

—তবে তো কাল রাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। হ্যারি বলল।

—তাই হবে। কাল রাত বাড়লে আমরা যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। হ্যারি মারিয়াকে বলল—রাজকুমারী—কয়েক মাস ধরে আপনি নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন।

—দুশ্চিন্তা হয় না? চারদিকে শুধু জল আর জল। মাটির দেখা নেই। এটা ভালো লাগে? রাজকুমারী মারিয়া বলল।

—তা তো বটেই। যাক গে—ডাঙার খোঁজ পাওয়া গেছে। এটাই বড় কথা। চলি।

হ্যারি চলে গেল। ফ্রান্সিস এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মারিয়াও নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হল। সকালের খাওয়া দাওয়া চলল। তখনই রাঁধুনী হ্যারির কাছে এল। হ্যারি বলল—কী ব্যাপার?

—ব্যাপার বড় চিন্তার। রাঁধুনী বলল।

—চিন্তার? কী হয়েছে? হ্যারি বলল।

—খাবার জল ফুরিয়ে এসেছে। দু'একদিনের মধ্যেই খাবার জল ফুরিয়ে যাবে। রাঁধুনি বলল।

—বলো কি। হ্যারি বেশ চিন্তায় পড়ল। বলল—দেখি। ফ্রান্সিসকে বলছি।

হ্যারি ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরের সামনে এল। দরজায় টোকা দিল। ফ্রান্সিস একটা থালায় সকালের খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে বলল—দরজা খোলা। হ্যারি ঘরে ঢুকল। বলল—ফ্রান্সিস—ভীষণ সমস্যায় পড়লাম।

—কেন? কি হয়েছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—রাঁধুনী বলে গেল—খাবার জল ফুরিয়ে আসছে হ্যারি বলল। ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল—জল কম খেতে হবে। একটু পরেই আমাদের ডাঙায় নামতে হবে। খাবার জলের খোঁজ করতে হবে। জল আনতে হবে।

—এই দিনের বেলাই যাবে? হ্যারি বলল।

—তাই যেতে হবে। উপায় নেই। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলবে না।

—দিনের বেলা যাবো? বিপদে পড়বো না তো? হ্যারি বলল।

—দেখা যাক। বিপদ হতে পারে। তার মোকাবিলা করবো। তরোয়ালের লড়াই এ নামতে হলে নামবো। তবে সবই করতে হবে খুব হিসেব করে। অবস্থা বুঝে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে দেরি করে কি লাভ। এখুনি চলো। হ্যারি বলল।

—তুমি আর শাঙ্কো তৈরি হও। আমি আসছি। ফ্রান্সিস বলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস তরোয়াল কোমরে ঝুলিয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। ততক্ষণে হ্যারি শাঙ্কো উঠে এসেছে।

ভাইকিং বন্ধুরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—খাবার জল ফুরিয়ে গেছে। আমরা খাবার জল আনতে যাচ্ছি। বিপদ আপদ হতে পারে। কিন্তু আমি তার পরোয়া করছি না। আমাদের যদি ফিরতে দেরি হয় তোমরা দুশ্চিন্তা করো না।

ওদিকে শাঙ্কো দুটো জলের পীপে জাহাজের দড়ি দড়া ধরে ধরে ছোট নৌকোয় তুলেছে। ফ্রান্সিস হ্যারি হালের দিকে আসছে তখন হ্যারি আস্তে বলল—ফ্রান্সিস রাজকুমারীকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে যাও। ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। মারিয়া পেছনে পেছনে আসছিল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। মারিয়াকে বলল—মারিয়া দুশ্চিন্তা করো না। আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

দড়ির মই হালের কাছে নিচে নামিয়ে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি মইয়ের সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে ছোট নৌকোটায় নেমে এল। শাঙ্কো নৌকোটার বাঁধা দড়ি খুলে দিল। নৌকোটা জাহাজের গা থেকে সরে এল। শাঙ্কো বৈঠা বাইতে লাগল। নৌকো তীরভূমির দিকে চলল।

ফ্রান্সিস ডাঙার দিকটা চোখ কুঁচকে দেখতে লাগল। রোদ বেশ চড়া। ডাঙার বাঁপাশে দেখল শুধু বালি। মাটি নেই। ডানপাশে মাটি দেখল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে নরম মাটি নয়। বেশ শক্ত মাটি। ঘরবাড়ি বা লোকজন দেখা গেল না। ফ্রান্সিসের

তখন একটাই চিন্তা—এখানে তো নামবো কিন্তু এখানে খাবার জল পাবো তো? তখনই দেখল ডানদিকে একটা টিলার মত।

শাঙ্কো নৌকো তীরে ভেড়াল। তিনজনেই নামল। শাঙ্কো বৈঠা রেখে নৌকোটা টেনে তীরের বেশ কিছু ওপরে নিয়ে এসে রাখল। যদি খুব জোর জোয়ারও আসে নৌকোটা ভেসে যাবে না।

এবার তিনজনে খালি জলের পীপে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস বলল—বাঁ দিকটা মনে হচ্ছে মরুভূমি। ডানদিকে ঐ টিলাটার দিকে চল। তিনজনে দুটো পীপে নিয়ে চলল।

ওরা টিলার কাছে এল। ছোট টিলা। শুকনো খটখটে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার টিলার নিচটা—কিছু ওপাশে ছোট বুনো গাছ ফার্ণ গাছ। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—হ্যারি—এখানে জল আছে। টিলার ওপাশে চল। ওরা টিলাটা ঘুরে ওপাশে আসছে তখন খুব মৃদু জল পড়ার আওয়াজ শুনল। কাছাকাছি আসতেই দেখল টিলার মাঝামাঝি জায়গা থেকে জল বেরোচ্ছে। ঝর্ণা। জল নিচে পড়ে পড়ে গর্ত হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো গর্ত মত জায়গাটাতে পীপে বসাও। তবে খুব বেশি জল পড়ছে না। পীপে ভরতে সময় লাগবে।

শাঙ্কো গর্তটায় পীপে বসাল। পীপেয় জল পড়তে লাগল। শাঙ্কো ওখানে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি টিলার ছায়ায় বসে রইল।

একটা পীপে ভরে গেল। শাঙ্কো পীপেটা ধরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁধে তুলে নিল। নিজেদের নোঙর করা জাহাজের দিকে চলল। ফ্রান্সিস অন্য পীপেটা বসাল। পীপেটা ধরে রেখে ঝর্ণার জল ভরতে লাগল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। তখনও পীপেটা জলে ভরে নি। ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল—হ্যারি আমরা বোধহয় বিপদে পড়লাম। পেছনের জংলা ডালপাতা ভাঙবার শব্দ হল। পাঁচ-ছ'জন ইনকা যোদ্ধা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে ঘিরে দাঁড়াল। যোদ্ধাদের মাথায় ফেট্রির মতো বাঁধা তাতে নানা পাখির পালক গোঁজা। যোদ্ধাদের পরনে নানা রঙের পোশাক। তাতে রঙীন সুতোর কাজ করা। মাথায় লম্বা চুল। বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। তখনই ফ্রান্সিসের পীপেটা ভরে গেছে।

ইন্‌কা যোদ্ধাদের দলনেতা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস আর হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা কারা? কোত্থেকে এখানে এসেছো? হ্যারি বলল—আমরা ভাইকিং। আমাদের জাহাজে চড়ে আমরা নানা দেশ ঘুরে বেড়াই। গুপ্তধনের কথা শুনলে আমরা সেই গুপ্তধন উদ্ধার করি।

—তারপর গুপ্তধন নিয়ে পালাও। দলনেতা বলল।

—এই অভিযোগ মিথ্যে। ফ্রান্সিস বলল।

এবার দলপতি তরোয়াল কোষবদ্ধ করল। বলল—তোমাদের তরোয়ালও ফেলে দাও। ফ্রান্সিস আর হ্যারি তরোয়াল রেখে দিল বালির উপর। দলপতি বলল—এখন বলো তো, এখানে কেন এসেছো?

—আমাদের জাহাজে পানীয় জল ফুরিয়ে গেছে। এখানে ঝর্ণা থেকে জল নেব বলে এসেছিলাম। আমাদের কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—যা হোক—তোমাদের বন্দী করা হল। দলপতি বলল।

—আমরা তো কোন অপরাধ করি নি। তাছাড়া আমাদের জাহাজে আমাদের বন্ধুরা সব তৃষ্ণার্ত। তাদের জন্যে এই জলভরা পীপে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এটা জাহাজে পৌঁছে দিয়ে আমি চলে আসবো। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি পালাও? দলপতি বলল।

—আমার বন্ধু হ্যারি রইল। বন্ধুকে ফেলে তো পালাতে পারবো না।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—শাঙ্কো আসছে। শাঙ্কো আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। বুঝল ওরা বন্দী হল।

—শাঙ্কো তরোয়াল ফেলে দাও। শাঙ্কো ওদের কাছে এল। তরোয়াল কোমরের ফেট্টি থেকে বের করে বালির ওপর ফেলে দিল। দলপতি একজন ইনকা সৈন্যকে ইঙ্গিত করল। সেই সৈন্যটি তরোয়ালগুলো তুলে নিল। নিজের কোমরে প্যাঁচানো দড়ি খুলল। তরোয়ালগুলি বেঁধে ঝুলিয়ে নিল।

—তাহলে আমি জলের পীপেটা জাহাজে রেখে আসছি। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি যদি আর না ফেরো? দলপতি বলল।

—দুই বন্ধুকে ফেলে পালাবো? ফ্রান্সিস বলল।

—তা পারো। দলপতি বলল।

—আমাদের বন্ধুত্ব অত ঠুনকো নয়। যাক গে বেলা বাড়ছে। আমি যাচ্ছি।

—তুমি যদি না ফেরো তাহলে তোমার বন্ধুদের এখানেই হত্যা করা হবে। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি শাঙ্কো আমি জলের পীপে পৌঁছে দিয়ে আসছি। শাঙ্কো ওদের দেশী ভাষায় বলল—বন্ধুদের এনে লড়াই করতে পারি। এরা ছয় জন।

—না। ঐ দেখ। ঘোড়ায় চড়ে ইন্‌কা যোদ্ধারা আসছে। মানে সৈন্যাবাস কাছেই আছে।

দলপতি ফ্রান্সিসকে বলল—বেলা বাড়ছে। জল নিয়ে যাও। তারপর ফিরে এসো।

ফ্রান্সিস দেখল ঘোড়ায় চড়ে ইন্‌কা যোদ্ধারা এদিকেই আসছে। ফ্রান্সিস পীপেটা কাঁধে তুলে নিল। চলল ওদের জাহাজের দিকে।

টিলার পাশেই কয়েকটা পাথরের খণ্ড পড়ে ছিল। হ্যারি তার একটাতে বসল। শাঙ্কোও পাশে বসল। যোদ্ধারাও কয়েকজন পাথরে বসল। এখানে ঝর্ণাটা আছে বলে পাথরগুলো খুব গরম নয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস নৌকো চালিয়ে তীরে উঠল। নৌকোও পারের ওপর দিকে টেনে এনে রাখল।

ফ্রান্সিস হ্যারিদের কাছে এসেছে তখনই সাত আটজন অশ্বারোহী যোদ্ধা ওখানে এল। টিলাটার ওধারে যোদ্ধারা বসেছিল। অশ্বারোহী যোদ্ধারা ওখানে এল। অশ্বারোহীদের মধ্যে সবচেয়ে সামনে আসছে একজন একটা ধবধবে সাদা ঘোড়ায় চড়ে।

যোদ্ধারা উঠে পরপর দাঁড়াল। বোঝা গেল অশ্বারোহী যোদ্ধাদের মধ্যে ঐ লোকটিই সেনাপতি। গায়ে সূতীর কাজ করা পোশাক। কপালে নীল রঙের ফেট্টি। তাতে পাখির পালক গোঁজা। কোমরে কোষবদ্ধ তরবারি। তারা সংখ্যায় সাত আটজন। তারা আগের যোদ্ধাদের সামনে এল। সেনাপতি দলনেতাকে বলল—কাপাকের কোন খোঁজ পেলে? যোদ্ধারা মাথা নুইয়ে সেনাপতিকে সম্মান জানাল। দলপতি বলল—না। আমরা চারদিকে খোঁজখবর নিচ্ছি।

—হ্যাঁ। তল্লাশী চালিয়ে যাও। সেনাপতি বলল। তারপর ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বলল—এরা কারা?

—এরা ভাইকিং। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। গুপ্তধন আবিষ্কার করে।

—ও। ওদের বন্দী করে রাখো। ভাইকিংরা জলদস্যু। সেনাপতি বলল।

—এ আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা। যারা শৌর্যে বীর্যে আমাদের সঙ্গে পারে না তারা এসব কুৎসা রটনা করে। হ্যারি বলল।

—তোমাদের কয়েদঘরেই থাকতে হবে। সেনাপতি বলল।

—কিন্তু কেন? আমরা কী অপরাধ করেছি? ফ্রান্সিস বলল।

—সেসব বিচার করবেন রাজা পাচাকুটি। সেনাপতি বলল।

সেনাপতি আর যোদ্ধারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

ফ্রান্সিস দলপতির দিকে তাকিয়ে বলল—আমাদের কী হবে?

দলপতি বলল—তোমরা তো বন্দী। আমাদের সঙ্গে যাবে রাজধানী কুজকোয়। রাজা পাচাকুটির রাজসভায় তোমাদের যেতে হবে। তারপরে বন্দী জীবন মেনে নিতে হবে। ফ্রান্সিস চড়া গলায় বলল—আমাদের কী পেয়েছো? তোমাদের দাস?

—বেশি মেজাজ দেখিও না। জানো তোমাদের এক্ষুনি খতম করতে পারি। দলনেতা বলল।

—আমাদের লড়াই করার সুযোগ না দিয়ে পারবে। কিন্তু যদি আমাদের হাতে তরোয়াল দাও—তোমরা ধুলোর মতো উড়ে যাবে। আমাদের হাতে তরোয়াল থাকলে স্বয়ং শয়তানও আমাদের ভয় করে। তোমরা তো শিশু। ফ্রান্সিস বলল। ফ্রান্সিসের কথা শেষ হবার আগেই শাঙ্কো বলে উঠল—ফ্রান্সিস—লড়াই। যে সৈন্যের হাতে দড়িবাঁধা ওদের তিনটে তরোয়াল ছিল শাঙ্কো সেই সৈন্যটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৈন্যটি ছিটকে পড়ে গেল। শাঙ্কো অতি দ্রুত একটা তরোয়াল খুলে ফ্রান্সিসের দিকে ছুঁড়ে দিল। ফ্রান্সিস তরোয়ালের হাতলটা ধরে ফেলল। শাঙ্কো নিজেও একটা তরোয়াল নিল। অন্যটা হ্যারিকে দিল। ওদিকে সৈন্যরাও তখন তরোয়াল কোষমুক্ত করেছে।

শুরু হল তরোয়ালের লড়াই। ফ্রান্সিস দলপতির সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। তরোয়াল চালাতে চালাতে বলল—তোমরা অস্ত্র ত্যাগ কর। নইলে মরবে। জাহাজ থেকে যদি আমার বন্ধুরা আসে তোমরা কেউ বাঁচবে না। এখনও বলছি অস্ত্র ত্যাগ কর। আমরা জাহাজে ফিরে যাব। কিন্তু দলপতি তাতে কর্ণপাত করল না। তরোয়াল চালাতে লাগল। এবার ফ্রান্সিস তরোয়াল পেছন দিক থেকে ঘুরিয়ে এনে দলপতির

তরোয়ালে এত জোরে ঘা মারল যে দলপতির হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। ও বালির ওপর পড়ে গেল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে তরোয়ালের গা-টা দলপতির গলায় ঠেকিয়ে বলল—বাঁচতে চাও না মরতে? সেনাপতি হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল। অন্য সৈন্যরাও লড়াই থামাল। দলপতি বলল—চল। অন্য সৈন্যরা তরোয়াল খাপে ঢুকিয়ে দলপতির পেছনে পেছনে চলল। মরুভূমির ওপর দিয়ে ওরা হেঁটে চলে গেল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি জাহাজে চল। তিনজনে সমুদ্রের দিকে নামতে লাগল। হ্যারির বাঁ কাঁধে তরোয়াল ছুঁয়ে গেছে। হ্যারি অল্পই আহত হয়েছে। তার কাঁধের কাছে পোশাক রক্তে ভিজে গেছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর শরীরও অক্ষত নেই। শরীরে তরোয়ালের ফলায় কেটেটেটে গেছে।

তিনজনে নৌকোটার কাছে এল। নৌকো জলে নামাল। উঠে বসল। শাঙ্কো বৈঠা বাইতে লাগল। নৌকো জাহাজের দিকে চলল।

জাহাজ থেকে দড়ির মই ফেলা হল। ফ্রান্সিসরা জাহাজে উঠে এল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে ভেন-এর কাছে এল। বলল—হ্যারির কাঁধ বর্শায় কেটে গেছে। ওষুধ দাও। ফ্রান্সিস চলে এল। ভেন হ্যারির জন্যে ওষুধ তৈরি করতে লাগল।

নিজের কেবিনঘরে ঢুকতে মারিয়া এগিয়ে এল। বর্শায় কেটে গেছে। নিশ্চয়ই তরোয়ালের লড়াই করেছো।

—আমাদের জীবনটাই তো এরকম। শুধু লড়াই। ফ্রান্সিস পোশাক খুলতে খুলতে বলল।

—না। তুমি আর তরোয়াল ধরতে পারবে না। মারিয়া বলল।

—এটা একটা কথা হল। বেঁচে থাকতে গেলে লড়াই করতেই হবে। কখনও বুদ্ধির লড়াই। কখনও শরীরের লড়াই। এই লড়াইয়ের মধ্যেই আমাদের থাকতে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তুমি আর লড়াইয়ের মধ্যে যাবে না। মারিয়া বলল।

—মারিয়া—তুমি তো এতদিনে আমাকে বুঝেছো। আমি সব লড়াই থামিয়ে গুপ্তধন আবিষ্কার না করে থাকবো কী করে? ফ্রান্সিস বলল।

—না। আমার ভয় করে। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস হো হো করে হেসে উঠল। বলল—এতে ভয় পাওয়ার কী আছে। চার পাঁচজনের সঙ্গে একা লড়তে গেলে একটু চিন্তা হয় বৈকি। তখন লড়াইয়ের কৌশলটা পাল্টাতে হয়। তবে আমি ভয় পাই না। একটু থেমে বলল —মারিয়া তুমি তো কখনও এত দুর্বল হও নি। হঠাৎ এত দুশ্চিন্তায় পড়লে কেন?

—না। দেশে ফিরে চল। মারিয়া বলল।

—দেশে ফিরে তো সেই খাও দাও ঘুমোও। এক নিশ্চিন্ত জীবন। এই জীবনকে মেনে নেওয়া আমার চরিত্রবিরোধী। আমি কক্ষনো মেনে নিতে পারবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—বয়েস তো হচ্ছে। মারিয়া বলল।

—যতদিন পারবো—ঘুরে বেড়াবো—এ দেশ ও দেশ দ্বীপ দেশ। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস তোমার এবার বিশ্রাম নেওয়া উচিত। মারিয়া বলল।

—অসম্ভব। আমার জীবনে বিশ্রাম বলে কিছু নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—কথা শোন। এবার দেশে চলো। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে—তোমরা ফিরে যাও। আমার বন্ধুদের মধ্যে যারা আমার সঙ্গে থাকতে চায় তারা থাকবে। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমাকে এই বিদেশে ফেলে রেখে আমি যাব না। মারিয়া বলল।

—আমিও সেটাই চাই। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল—খিদেয় পেট জ্বলছে। ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কোকে নিয়ে রান্নাঘরে এল। রাঁধুনি বন্ধুরা অতি দ্রুত ফ্রান্সিসদের খেতে দিল।

খেয়ে দেয়ে ফ্রান্সিসরা যে যার কেবিনে চলে গেল। ফ্রান্সিসও ওর কেবিনঘরে এল। তারপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। মারিয়া একটা ন্যাকড়া হাতে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস যখন পোশাক ছাড়ছে তখন দেখেছে ফ্রান্সিসের কাঁধে পিঠে তরোয়ালের কাটার দাগ। মারিয়া ভেন-এর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এসেছে। মারিয়া ফ্রান্সিসের গায়ে সেই ওষুধ লাগানো ন্যাকড়াটা চেপে চেপে ধরতে লাগল। সেইসব কাটা জায়গাগুলো ভীষণ জ্বালা করে উঠল। ফ্রানিস মুখে শব্দ করল—আ-আ। ফ্রান্সিসের গায়ে ওষুধ দেওয়া হলে মারিয়া হ্যারি শাঙ্কোর কাছেও গিয়ে ওষুধ লাগিয়ে এল। হ্যারির কেবিনঘরে গিয়ে দেখল—ভেন হ্যারির ডান কাঁধে ন্যাকড়া বাঁধছে। মারিয়া ভেনকে বলল—খুব বেশি কেটেছে?

—তেমন কিছু নয়। তবে নিয়মিত ওষুধ লাগাতে হবে। সাতদিন একেবারে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। ভেন বলল।

—ভেন, আপনি ওষুধ খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে গেছেন তো? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ, হ্যারিকে সব নির্দেশ দিয়েছি। ভেন বলল। তারপর দুটো ওষুধের বোয়াম কাপড়ের ঝোলা হামান-দিস্তা নিয়ে ভেন চলে গেল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর বিস্কো কেবিনঘরে এল। বেশ গরম পড়েছে। কেবিনঘরে থাকা চলবে না। ও একটা মোটা কাপড়ের চাদর নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ উঠে এল। জোর হাওয়া বইছে। বিস্কো মাস্তুলের কাছে চাদরটা পাতল। তারপর শুয়ে পড়ল। আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘ। আধখানা চাঁদ আকাশে। বিস্কো চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। চাঁদটা কখনো মেঘে ঢাকা পড়ছে। বেশ অন্ধকার তখন। মেঘ সরে যেতেই চাঁদ বেরিয়ে আসছে। তখন আলো। চাঁদ আবার মেঘে ঢাকা পড়ছে। বিস্কো চাঁদ আর মেঘের খেলা দেখতে লাগল। তারপর পাশ ফিরে শুল। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বিস্কোর মত সাত আটজন ভাইকিং ডেক-এ ঘুমোচ্ছিল।

হঠাৎ একটা জোর শব্দ হতে বিস্কোর ঘুম ভেঙে গেল। বিস্কো এদিক ওদিক তাকালো। ভাবতে লাগল শব্দটা কোনদিকে হয়েছে? তখনই আবার শব্দ হল। বিস্কো এবার বুঝল শব্দ হয়েছে হালের দিকে। বিস্কো আস্তে আস্তে উঠে বসল। আস্তে আস্তে

পা ফেলে চলল হালের দিকে। হালের কাছে আসতেই দেখল গায়ে চাদর জড়ানো একটা লোক তখনই হাল থেকে জাহাজের ডেক-এ নামল। প্রায় অন্ধকারেই বিস্কো দেখল লোকটির কোমরে গোঁজা তরোয়াল। বিস্কো সাবধান হল। ভাবল ঐ লোকটা তরোয়াল বের করবার আগেই বিস্কো লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটা সাবধান হবার সুযোগই পেল না। চিৎ হয়ে ডেক-এর ওপর গড়িয়ে পড়ল। বিস্কো দ্রুত লোকটার কোমর থেকে তরোয়ালটা বের করে নিল। লোকটা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। বিস্কো বলল— তুমি কে? লোকটি ভাঙা গলায় বলল—দোহাই। তরোয়াল চালাবেন না। আমি সব বলছি।

—বেশ বলো। বিস্কো তরোয়াল নামিয়ে বলল। লোকটার গায়ে ইনকাদের পোষাক। বেশ ধূলো মাখা, মলিন।

বিস্কোদের কথাবার্তায় দুজন ভাইকিং বন্ধুর ঘুম ভেঙে গেল। দুজন বিস্কোদের কাছে এল। দেখল বিস্কো তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বিস্কো এক বন্ধুকে বলল—যাও ফ্রান্সিসকে ডেকে নিয়ে এসো। বন্ধুটি ছুটে গেল। একটু পরেই ফ্রান্সিস এল। বিস্কোকে বলল—কী ব্যাপার?

—এই লোকটা লুকিয়ে আমাদের জাহাজে উঠেছে। বিস্কো বলল।

ফ্রান্সিস লোকটার দিকে তাকাল। বলল, তুমি তো ইনকা?

—হ্যাঁ। লোকটা মাথা ওঠানামা করল।

—তুমি আমাদের জাহাজে এসেছো কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—আশ্রয় নিতে। লোকটি বলল।

—কেন? অন্য কোনখানে আশ্রয় নিতে পারতে। ফ্রান্সিস বলল।

—না। কোন ইনকার বাড়িতে আশ্রয় নেবার উপায় নেই। লোকটি বলল।

—কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—সব বলছি। তার আগে আমাকে খেতে দিন। দুদিন যাবৎ না খেয়ে আছি। লোকটি বলল।

ফ্রান্সিস বিস্কোকে বলল—একে আমাদের রসুইঘরে নিয়ে যাও। পেট ভরে খেতে দাও। তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার নাম কি?

—কাপাক বলেই ডাকবেন। কাপাক বলল।

—বেশ। যাও। আমি তোমার ফেরার জন্যে অপেক্ষা করছি। ফ্রান্সিস বলল।

কাপাক খেতে গেল। তখনই হ্যারি এল। বলল—ফ্রান্সিস কী ব্যাপার?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। এক ইনকা আমাদের জাহাজে লুকিয়ে উঠেছে। আমাদের কাছে আশ্রয় চায়। ও যেন বলতে চাইছে কোন ইনকা ওকে আশ্রয় দেবে না। কারণটা ও এখনও বলেনি। দুদিন না খেয়ে আছে। তাই আগে খেতে পাঠালাম। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখা যাক—কথা বলে। হ্যারি বলল।

কিছুক্ষণ পরে বিস্কো কাপাককে নিয়ে এল। ফ্রান্সিসকে বলল কাপাক প্রায় তিনজনের খাবার খেয়েছে। বোঝাগেল ও সত্যিই খুব ক্ষুধার্ত ছিল।

ঢেকে শুয়ে আছেন। তার মাথার কাছে বসে আছেন একজন মহিলা। বুঝলাম এরাই রাজা আর রাণী। আমি বললাম—আপনারাই বোধহয় রাজা কুয়েক হুয়া আর রাণী।

অসুস্থ রাজা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। বললেন—আপনি ঠিকই বুঝেছেন। এখন আপনারা কি চান?

—আমি আপনাদের বন্দী করতাম। কিন্তু যা শুনেছিলাম তা ঠিক। আপনি গুরুতর অসুস্থ। আমি বললাম।

—হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। আমার পুত্র কন্যাকে অন্যত্র রেখেছি। আপনি আমাদের হত্যা করতে পারেন।

আমি খোলা তরোয়াল কোষবদ্ধ করলাম। আমার সঙ্গীরাও তরোয়াল কোষবদ্ধ করল।

রাজা ক্ষীণস্বরে বললেন—ওষুধটা দাও। রাণী বিছানা থেকে উঠলেন। একটা চিনেমাটির গ্লাসে জল নিয়ে ওষুধের বড়িটা নিয়ে এগিয়ে এলেন। রাজাকে ওষুধ খাওয়ালেন।

আমি বললাম—মাননীয় রাজা আপনি অসুস্থ। আপনি এখানেই থাকবেন। ওষুধ খেয়ে সুস্থ হবার পর আপনাকে মাজোর্কা ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটা আমার কথা বললাম। আমাদের রাজা পাচাকুটি এরপরে যা স্থির করবেন সেটাই করতে হবে। তবে আপনাদের গায়ে হাত দেওয়া হবে না এটা জেনে রাখুন। রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মুখে দাড়ি গোঁফ চোখ দুটো কোটরে। সারা মুখ সাদাটে রক্তহীন। বুঝলাম রাজার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। ভাবছি কী করবো এখন।

রাজা কুয়েক হুয়া আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। বুঝলাম একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। অস্বস্তি হচ্ছিল। তাই বললাম—আপনি অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? কাপাক থামল।

এসময় ফ্রান্সিস বলল—কাপাক আপনাকে তুমি করে বলা উচিত হয়নি। মাফ করবেন।

—না—না তাতে কী হয়েছে? কাপাক হেসে বলল।

হ্যারি বলল—আপনি কী যেন বলছিলেন।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—কাপাক বলল। তারপর বলতে লাগল—আমার কথা শুনে রাজা কুয়েক হুয়া আমাকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। আমি রাজার কাছে গেলাম। রাজা ফিস ফিস করে কী বললেন আমি ঠিক বুঝলাম না। রাজা বুঝল সেটা। আমাকে মাথা নামাতে ইঙ্গিত করল। আমি রাজার মুখের উপর ঝুঁকলাম। রাজা বললেন—আপনার সঙ্গের সৈন্যদের এখান থেকে দূরে যেতে বলুন। একটা খুব দরকারি কথা আপনাকে বলব। আমি সঙ্গের সৈন্যদের বললাম—তোমরা যাও। আমি আসছি। সৈন্যরা বেরিয়ে গেল।

রাণী ভেতরের ঘরে গিয়েছিলেন। তখনই রাণী ঘরে ঢুকলেন। রাজার শিয়রে গিয়ে বসলেন।

একটা কথা বলি।—রাজা বললেন।

—কী কথা। রাণী বললেন।

—পুরুষানুক্রমে যে নক্সাটা গয়নার বাক্সে পড়ে আছে সেটা এঁকে দেব। রাজা বললেন।

—উনি কি পারবেন নক্সাটা ঠিক বুঝতে? রাণী বললেন।

—দেখা যাক। একটু থেমে বললেন—তাহলে নক্সাটা বের করে দাও। রাণী উঠে দাঁড়ালেন। রাজার মাথার বালিশের নিচে হাত ঢোকালেন। একটা চামড়ার ছোট্ট ব্যাগমত বের করলেন। রাজার হাতে দিলেন। রাজা ওটা হাতে নিলেন। ব্যাগটা আমাকে দিলেন। আমি ছোট্ট ব্যাগটা খুললাম। দেখি একটা গোল বিবর্ধক কাঁচ রয়েছে একটা খোপে। অন্য খোপ থেকে বেরুলো একটা নক্সাটা ছোট্ট চৌকোনো পার্চমেন্টের শক্ত কাগজ।

—ঐ কাগজে একটা নকশা আঁকা আছে। রাজা বললেন। আমি দেখেটেখে কিছুই বুঝলাম না।

—ঐ বিবর্ধক কাঁচটা দিয়ে নক্সাটা দেখুন। রাজা বললেন।

একটু থেমে কাপাক বলল—আমি বিবর্ধক কাঁচটা দিয়ে দেখলাম—তাসের মতো চৌকোনো কাগজটার চারদিকে সোজা দাগ। চারদিকে চারটে করে ফুলদানি তাতে ফোটা ফুল বুঝলাম এই নকশার অর্থ বের করতে আমার সময় লাগবে। বললাম—তাহলে এই নকশাটা আমাকে দিলেন?

—হ্যাঁ। আমার ঠাকুর্দার হাত থেকে বাবা পেয়েছিলেন। ঠাকুর্দা বলেছিলেন নক্সা দিলাম। এর অর্থ বের করতে পারলে তুমি প্রচুর হীরে মণি মুক্তোর অলংকার পাবে। সোনা রূপো তো পাবেই। রাজা হাঁপাতে লাগলেন। আমি বললাম—আমি বুঝেছি। আর কথা বলবেন না। আমি চলি। আপনি বিশ্রাম করুন। আমি চলে এলাম।

ঘোড়ায় চড়ে সমস্ত মাজোর্কা ঘুরলাম। রাজার তৈরি সৈন্যাবাস ফাঁকা। কেউ নেই। আমি আমার সৈন্যদের সৈন্যাবাসে আসতে খবর পাঠালাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে সৈন্যরা এল। আমি একটা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। নক্সাটা কোমরে গোঁজা। বের করলাম। বিবর্ধক কাঁচ দিয়ে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় নক্সাটা বেশ কিছুক্ষণ দেখলাম। কিন্তু প্রায় কিছুই বুঝলাম না।

—ঠিক আছে—নক্সাটা পরে দেখছি। তারপর কী করলেন? ফ্রান্সিস বলল।

রাতের খাবার খেয়ে ঘরে এলাম। ক্লান্ত শরীর। শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এল। আচ্ছা—নকশাটা বোঝাচ্ছে রাজা কুয়েক হুয়ার ঠাকুর্দার ধনসম্পদ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন? যদি গোপনেই রাখলেন তবে ছেলেকে মানে রাজা কুয়েক হুয়াকের বাবাকে বললেন না কেন? না-না। কাল সকালে একবার রাজার কাছে যেতে হবে। আরো কিছু জানার আছে। কথা বলা থামিয়ে কাপাক বলল—আপনাদের শুনতে একঘেয়ে লাগছে নিশ্চয়ই।

—না—না। ফ্রান্সিস বলল—আপনি বলুন।

কাপাক বলতে লাগল—আমি পরদিন সকালে রাজা কুয়েক হুয়ার কাছে গেলাম। সঙ্গে ঈগরকে নিয়ে গেলাম। রাজার শয়নঘরে ঢুকলাম। দেখি রাজা উঠে বসেছেন। রাণী তাঁকে সকালের খাবার খাইয়ে দিচ্ছেন।

—তা হলে আমি যাই। পরে আসবো। আমি বললাম।

—না—না। রাজা মুখ মুছতে মুছতে বললেন—বসুন। আমার হয়ে গেছে।

দেয়ালের কাছে রাখা আসনে দু'জন বসল। এবার আমি বললাম—একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না।

—কোন কথা? রাজা বললেন।

—আপনার ঠাকুর্দা ধনসম্পদ গোপনে রেখেছিলেন কেন? আমি জানতে চাইলাম।

—এই মাজোর্কার নদীর ওপারে থাকে দুতিন গোষ্ঠীর বুনোমানুষরা। দুটি গোষ্ঠী সভ্য হয়েছে কিন্তু একটি গোষ্ঠী এখনও বুনো স্বভাবের। এরা মাঝে মাঝে এই মাজোর্কা নগরে এসে লুঠপাট করে পালিয়ে যায়। তাই এদের হাত থেকে বাঁচাতে ঠাকুর্দা গোপনে ধনসম্পদ রেখেছিলেন পরে পিতাকে বলে যাবেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু ঐ বুনোমানুষদের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি গুরুতর আহত হন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যান। বাবাকে কিছু বলে যেতে পারেন নি। আমিও অবশ্য ঐ ধনসম্পদের আশা ছেড়ে দিয়েছি।

—তা কেন? আমি দেখছি। আমি বললাম। কাপাক বলল।

—দেখুন চেষ্টা করে। রাজা বললেন।

আমি বললাম—আপনার প্রাসাদরক্ষীরা কোথায় গেল?

—এই রাজবাড়ির পেছনদিকে একটা বড় ঘর আছে। ওটাই দ্বাররক্ষীদের থাকবার ঘর। ওরা বোধহয় বেরোতে সাহস পাচ্ছে না।

—ঠিক আছে। আমি ওদের ভরসা দিচ্ছি। আমি বললাম। রাজবাড়ির থেকে বাইরে এলাম। তারপর রাজবাড়ির পেছনে গেলাম। রাজার রক্ষীদের বললাম—কাজে যাও। কোন ভয় নেই। বিস্তৃত মাঠ পার হয়ে আমরা নগরে এলাম। ঈগরকে বললাম—গলা চড়িয়ে বলে দে আপনারা যে যার বাড়িতে চলে আসুন। আর লড়াই হবে না। ঈগর আমার কথাগুলো জোরে চেঁচিয়ে বলল। লোকজন আস্তে আস্তে ফিরে আসতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই প্রচার চালালাম তারপর আস্তানায় ফিরে এলাম।

—তারপর? হ্যারি বলল।

—বিকেলের দিকে আমি ঈগরকে নিয়ে নদীর দিকে গেলাম। তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। দেখলাম নদীটি বেশ নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে। ঢেউ নেই তেমন। তবে আন্দাজে বোঝা যাচ্ছে বেশ স্রোত আছে। হঠাৎই দেখলাম একটা নৌকো নদীতে দোল খাচ্ছে। আমি ভীষণভাবে চমকে উঠলাম—বুনোমানুষ! জোরে বললাম—ঈগর পালা। আমার কথা শেষ হওয়ামাত্র পিঠে বর্শার খোঁচা খেলাম। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ছোটার চেষ্টা করলাম না। ছুটতে গেলে বর্শা পিঠে ঢুকে যাবে। ঈগর প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—বুনোমানুষ।

—চুপ করে ওরা যেমন নির্দেশ দেয় সেভাবেই চলো। আমি বললাম।

চারপাঁচজন বুনোমানুষ বর্শা হাতে পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। একটা বুনোমানুষ আমাদের কাছে এসে কী বলল। কিছুই বুঝলাম না। বুনোমানুষদের দেখলাম। সারা গায়ে লোম। মুখে লালচে দাড়ি গোঁফ। মাথায় ঝাঁকড়া লাল চুল। যে আমার পিঠে বর্শার মুখটা চেপে ধরেছিল সেই বর্শার মুখটা জোরে চেপে ধরল। বুনোমানুষরা তখন হাঁটতে শুরু করেছে। নদীর ঢালু পার দিয়ে আমরা নামতে লাগলাম। আমরা দুজনে কখনও কখনও হোঁচট খাচ্ছি। কিন্তু বুনোমানুষরা সোজা চলেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়। আকাশে ভাঙা চাঁদ। এই আবছা আলোতেও চারদিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

ওরা ঠেলে নৌকোয় ওঠালো। সারাক্ষণ পিঠে বর্শার মুখ চেপে ধরা। সবাই নৌকোয় উঠল। ওরা এমনভাবে বসল দাঁড়ালো সহজে সবাই এঁটে গেল। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে নৌকো চলল। নদীর জল ছুঁয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইল। একজন বৈঠা বাইতে লাগল।

ওপারে নৌকো এসে লাগলো। সবাই আস্তে আস্তে নেমে এল। আমার পিঠে বর্শার খোঁচা। আমি আর ঈগর চললাম। আবছা দেখলাম ঈগরের পিঠেও একজন বর্শা চেপে ধরে আছে। নদীর ওপারে উঠে গাছগাছালি পার হয়ে একটা উঠোনের মত জায়গায় এলাম। আমি শুধু চারদিকে নজর রেখে যাচ্ছি কীভাবে পালাবো। একটা কথা বুঝলাম না বুনোমানুষরা আমাদের ধরল কেন? আমাদের নিয়ে ওরা কী করবে?

ওরা উঠোনের একপাশে আমাদের দাঁড় করাল। প্রথমে একজন হাতে দড়ি নিয়ে এল। ঈগরের হাত বাঁধল। আমার কাছে আসতেই আমি ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলাম। বুনোমানুষরা হকচকিয়ে গেল। আমি দুহাত নেড়ে বার বার কেঁদে উঠতে লাগলাম। বুনোমানুষরা হো হো করে হাসতে লাগল। আমি বাঁ হাতের কনুইটা বার বার দেখাতে লাগলাম। বুনোমানুষটা কী ভাবল জানি না। আমার হাত বাঁধলো না।

ওরা উঠোনের মাঝখানে আগুন জ্বালল। আগুনটা ঘিরে ওদের নাচ শুরু হল। দুটো কাঠ ঠুকে তাল দিতে লাগল কয়েকজন। নাচ চলল। রাত গভীর হল। আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নজর রাখছি। বুনোমানুষরা কে কী করছে।

একসময় দেখলাম একজন বুনোমানুষ একগাদা শুকনো কাঠ অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিল। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। এবার বুনোমানুষটা ঈগরের কাছে এল। ঈগরের হাতে বাঁধন আর একটা দড়ি বাঁধাল। আমি চিৎকার করে বললাম—ঈগর পালাও। আমি কাছেই দাঁড়ানো এক বুনোমানুষের হাত থেকে বর্শাটা এক ঝাঁকুনি দিয়ে কেড়ে নিলাম। বললাম—ঈগর ছোটো। দুজনে ছুটতে শুরু করেছি তখনই একটা বর্শা এসে সামনের একটা গাছের গায়ে গেঁথে গেল। ঈগর সঙ্গে সঙ্গে বর্শাটা খুলে নিয়ে ছুটল। আমরা বুনোমানুষদের ছাড়িয়ে যেতে পারছিলাম না। খুবই স্বাভাবিক। বুনোমানুষরা এই জঙ্গলেই থাকে। গাছের বাধা দ্রুত পার হয়ে ওরা ছুটতে

অভ্যস্ত। আমি তবু হাল ছাড়লাম না। দু'একটা বর্শা আমাদের সামনে পেছনে পড়তে লাগল। সেই বর্শা খুঁজে বের করতে গিয়ে ওরা পিছিয়ে পড়ছিল।

হঠাৎ সামনে নদী। আমি চিৎকার করে বললাম—ঈগর—নৌকো। দুজনে নদীর পারে এসে গড়ানো পাথরের গায়ে বসে পড়লাম। দুজনেই দ্রুত গড়িয়ে চললাম। এইসময়ে একটা বর্শা আমার কাঁধ কেটে বেরিয়ে গেল। আমি দ্রুত পেছনে ফিরে এক বুনোমানুষের বুকে হাতের বর্শাটা ঢুকিয়ে দিলাম। বুনো মানুষটা হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেল। আমি ঈগরের হাতের বাঁধনটা খুলে দিলাম। ঢালু পার দিয়ে গড়াতে গড়াতে নৌকোটার সামনে এসে আমরা থামলাম। এই সময় একটা বর্শা ঈগরের হাঁটুর নিচে লেগে পড়ে গেল। আবছা অন্ধকারে দেখলাম রক্ত পড়ছে। ঈগরের হাত ধরে লাফিয়ে নৌকোয় উঠলাম। নৌকোর গলুইয়ে বৈঠা রাখা। বৈঠা নিয়ে বাইতে লাগলাম। নৌকো বেশ কিছুটা চলে এসেছে তখন জলে শব্দ শুনলাম। বৈঠা চালাতে চালাতে দেখলাম দুজন বুনোমানুষ বর্শা নিয়ে সাঁতার দিয়ে আসছে। আমাদের কাছাকাছি এসে একজন আমার দিকে বর্শা ছুঁড়ল। আমি দ্রুত মাথা নোয়ালাম। বর্শাটা আমার মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে জলে পড়ল। আর একটা বুনোমানুষ বর্শা হাতে আমাদের কাছে সাঁতরে এল। ও বর্শা ছোঁড়ার আগেই আমি বৈঠাটা ওর কান লক্ষ্য করে যত জোরে সম্ভব চালালাম। বুনোমানুষটি আর্ত চিৎকার করে জলে ডুবে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই নৌকোটা তীরে এসে লাগল। আমরা দুজন লাফ দিয়ে নামলাম। তারপর পাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম।

তখনই সূর্য উঠল। ভোরের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়ল। স্পষ্ট হল আকাশ নদী গাছপালা।

একটু থেমে কাপাক বলল—একটা বিনীত অনুরোধ—ঈগর হালে বসে আছে। তাকে উঠে আসতে অনুমতি দিন। শাঙ্কো বলল—আমি যাচ্ছি। শাঙ্কো চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঈগরকে সঙ্গে নিয়ে এল। ঈগরের গায়ে সব পোশাক জলে ভেজা।

ফ্রান্সিস বলল—আগে আপনারা ভেজা পোশাক ছাড়ুন।

—আসুন। শাঙ্কো বলল। দুজন শাঙ্কোর পিছু পিছু গেল।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস একটা কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—কী কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—ওরা রাজধানী কুজকোতে না গিয়ে এই বন্দরে এল কেন?

—হ্যাঁ। আমার মনে হয় রাজধানী কুজকোয় ওঁরা থাকতে পারে নি। আবার ওঁরাই কুজকোতে না গিয়ে এখানে এল কেন? উদ্দেশ্য একটা বিদেশী জাহাজে চড়ে দেশত্যাগ। ওঁরা আর এই পেরুতে কোনদিন ফিরে আসবে না। তবে ওরা দুজনে দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন বোঝা যাচ্ছে না। ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সব জানতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। ফ্রান্সিসরা ডেক-এ বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কাপাকরা এল। পরনে ভাইকিংদের পোশাক। দুজন বসল। ফ্রান্সিস বলল—কাপাক আপনারা রাজধানী কুজকোতে ফিরে গেলেন না কেন?

—তাহলে বলি—কাপাক বলতে লাগল—কয়েকটি অঞ্চল বাদে প্রায় সারা পেরু অঞ্চল আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পাচাকুটির অধীন। কথা প্রসঙ্গে একদিন রাজা পাচাকুটি আমাকে বললেন—তিতিকানা হ্রদের চারপাশের অঞ্চল জয় করতে হবে। আমাদের অধীনে আনতে হবে। ইনকা সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত করতে হবে। কাপাক একটু থেমে বলতে লাগল—কিছু সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমি যুদ্ধযাত্রা করলাম। তিতিকানা হ্রদের তিনদিককার দেশগুলো সহজেই জয় করলাম। কিন্তু একটি রাজ্য অধিকার করতে বেশ লড়াই করতে হল।

যা হোক সব যুদ্ধ জেতা রাজ্যে একজন করে নির্ভীক সৈন্যদের রাজা করে দিয়ে আমি কুজকো ফিরে চললাম। পথে কয়েকজন সৈন্য আর এই ঈগর আমাকে বলল—কিছুদূরে একটি নগরী আছে মাজোর্কা। ফলে ফুলে সুশোভিত এই নগরের সবই সুন্দর। অন্য দুতিনজন সৈন্যও বলল ঐ সুন্দর নগরীর কথা।

সেদিন সকালে সব সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললাম—আমরা এখন দেশে ফিরে যাবো না। মাজোর্কা নগর আমরা যুদ্ধ করে জয় করবো। ইন্‌কা সাম্রাজ্যের অধীনে আনবো। কাজেই আমরা এখন মাজোর্কা জয় করতে যাবো। এখন দেশে ফিরবো না? সৈন্যরা অস্ত্র উঁচুতে তুলে আমাকে সমর্থন জানালো।

আমরা মাজোর্কার দিকে যাত্রা শুরু করলাম। দিন দুয়েকের মধ্যে মাজোর্কা পৌঁছলাম। শুনলাম রাজা কুয়েক হুয়া অসুস্থ। যা হোক আমরা প্রায় বিনা বাধায় মাজোর্কা দখল করলাম।

ফেরার সময় কুজকোর কাছাকাছি এসে ঈগরকে পাঠালাম আমাদের কীভাবে অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছে এটা জানতে।

ঈগর বিরসমুখে ফিরে এল। বলল—রাজার অনুমতি না নিয়ে মাজোর্কা দখল করার জন্যে আপনাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। রাজাজ্ঞা। সবাইকে মানতে হবে। আপনি কুজকো ঢুকলেই বিপদে পড়বেন।

—ঈগর আমাদের পালাতে হবে। তৈরি হও। কথাটা বলে চারদিকে তাকাতে লাগলাম।

তখন রাস্তার পাশে একটা খোলা মাঠে রাঁধুনিরা রান্নার আয়োজন করছে। সবাই ঘোড়া থেকে নেমেছে। মাঠের একদিকে আপেল গাছের সারি। ঈগরকে ইঙ্গিত করে ঐ বাগানের আড়ালে গেলাম। ঈগরও এল। আমি বললাম— ঈগর আমার পেছনে। আমি আপেল বাগানের পরেই একটা পায়ে চলা পথ পেলাম। দুজনে ঘোড়া ছোটালাম। গ্রামটাম পেলাম না।

বেশ কিছুক্ষণ ঘোড়া ছুটিয়ে একটা গ্রামের কাছে থামলাম। খাওয়া তো হয়নি। খুব খিদে পেয়েছে। আপেলের বাগান থেকে তিনটি পাকা আপেল নিয়ে এসেছিলাম। দুজনে তাই খেলাম।

প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘোড়া ছোটালাম। একটা গ্রামে এলাম। গ্রাম চার পাঁচটা পাথরের বাড়ি। কাছাকাছি বেশ কটা খামার। দেখে খুশি হলাম। এই গ্রামের লোকদের অবস্থা ভালই। খাওয়াতো শুধু আমাদের খাওয়া নয়। ঘোড়া দুটোকেও জল ছোলা খাওয়াতে হচ্ছিল। ঠিক করলাম আয়াচুচো গিয়ে ঘোড়া দুটো বিক্রি করে দেব। ওখানে ঘোড়া কেনাবেচার হাট বসে। গ্রামে সব ঘরের দরজাই কালো পাথরের। একটা বাড়ি দেখলাম সাদা পাথরের। সাদা পাথরের দাম বেশি।

ঘোড়া থেকে নেমে সাদা দরজার সামনে এলাম। আঙ্গুলঠুকে শব্দ করলাম। আর একবার ঠুকতেই দরজা খুলে গেল। দেখি একজন বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়ে। বললাম—খুব সমস্যায় পড়ে আপনাদের সাহায্য চাইতে এসেছি। মাজোর্কা থেকে আসছি। যাবো আয়াচুচো শহরে! এক বুড়ো বেরিয়ে এল। বলল—আপনারা কারা? কোথায় যাবেন? বুঝলাম আমাদের কথা বারবার বলতে হবে। কারণ বুঝলাম বুড়ো লোকটি কালা। অনেক কষ্টে ঘরে আসার অনুমতি পেলাম।

ভেতরের একটা ছোট ঘরে আমাদের বসতে বলল। আমরা মেঝেতে বসে রইলাম। মেঝের শুকনো ঘাস বিছানো। দড়ি দিয়ে বাঁধা বসে আরামই পেলাম। সন্ধ্যে হয় গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার ঘরে মহিলাটি একটা জ্বলন্ত মোমবাতি রেখে গেল। তাতেই ঘরের চারধার যা দেখতে পাচ্ছিলাম।

সেই দুটো আপেল খাওয়ার পর থেকে উপোস করে আছি। খিদেয় প্রায় নেতিয়ে পড়লাম। ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ বাইরের দরজা খোলার শব্দ। কে ঢুকল। বয়স্কা মহিলাটির ছেলেই হবে। যে ঢুকল সে মার সঙ্গেই কথা বলছিল। মা সবই বলল।

ছেলেটি আমাদের ঘরে ঢুকল। আমাদের এক ঝলক দেখল। বলল— আপনারা কারা? কোত্থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন?

কাপাক বলল—ঈগর তুই সামলা। ঈগর আস্তে আস্তে আমাদের কথা বলল। শেষে বলল—আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত। আগে খেতে দিন। তারপরে যা বলার বলবো।

—বেশ। যুবকটি বলল। তারপর বলতে বলতে চলল—মা—রান্না কদ্দুর? ওদের খেতে দাও। সারাদিন না খেয়ে আছে। মার কথাও শুনলাম—আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রাতের রান্না হয়ে যাবে। ওদের একটু অপেক্ষা করতে বল।

আমরা আর কোন কথা বললাম না। দুজনেই শুয়ে রইলাম। খেতে খেতে একটু রাতই হল। যুবকটি এল। কিছু কথাবার্তা হল। আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে গোল রুটির সঙ্গে আলুসেদ্ধ খেয়ে ঘোড়ায় উঠলাম। ঘোড়া ছোটালাম আয়াচুচোর দিকে।

কাপাক থামল। ফ্রান্সিস বলল—তুমি অনেকক্ষণ কথা বলছো। একটু দম নাও। তুমি কুজকো গেলে না কেন সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি।

—হ্যাঁ। আপনি বুঝেছেন। আপনাদেরও একঘেয়ে লাগছে বোধহয়।

—না-না। আপনি বলুন। হ্যারি বলল।

কাপাক বলতে লাগল—পরদিন সকালেই ঘোড়া ছোটালাম আয়াচুচোর দিকে। সন্ধ্যের আগেই আয়াচুচো পৌঁছলাম। সারাদিন খাওয়া জোটে নি। খিদে তৃষ্ণায় দুজনেই কাতর।

আয়াচুচো একটা ছোট শহর তবে লোকজনের সংখ্যা ভালোই। পাথরের বাড়িঘর। খুঁজে খুঁজে একটা ছোট সরাইখানা পেলাম। সেদিনের মত ঘোড়া বেচাকেনা হাটটা দেখে এলাম। এখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। হাট ভেঙে গেছে।

রাতটা সরাইখানায় কাটালাম।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে ঘোড়া দুটো নিয়ে চললাম ঘোড়া বেচাকেনার হাটে। লোকজনের বেশ ভিড়। ঘোড়া থেকে নামলাম। দুতিনজন প্রায় ছুটে এল। একজন বলল—আমাকে কিছু মুদ্রা দিন। আমি ঘোড়াদুটো ভাল দামে বিক্রি করিয়ে দেব। বাকিরাও একই কথা বলল। আমি বললাম—বেশ—আগে বিক্রি কর—তারপর তোমাকে যা দেবার দেব। ওরা রাজি হল। এখন কাকে বিক্রি করতে দেব—এই নিয়ে ওদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। যে লোকটি আমার কাছে প্রথম এসেছিল তাকেই বিক্রি করতে দেব। আমি বললাম। ঝগড়া মিটল।

ঘোড়া দুটো দেখে লোকটি বলল—জিন বসার আসন পাদানি এসব বিক্রি করবেন কেন। নিজের কাছে রেখে দিন।

—কোন দরকার নেই। তুমিই নাও। আমি বললাম।

—বেশ। লোকটা এক গাল হেসে বলল।

লোকটা ঘোড়া দুটো নিয়ে হাটে ঢুকল।

আমরা ঘাসের জমির ওপর বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে লোকটি এল। দুই কাঁধে ঝুলছে ঘোড়ার সাজ সরঞ্জাম। কোমরের খুঁট থেকে সোনার মুদ্রা বের করল। হেসে বলল—ভাল দামে বিক্রি করেছি। নিন দাম। আমি সোনার মুদ্রাগুলো নিলাম। একটা সোনার মুদ্রা লোকটিকে দিলাম। লোকটি খুব খুশি।

লোকটি চলে গেল। আমরা সরাইখানায় ফিরে এলাম। সেই রাতটা ঐ সরাইখানায় কাটিয়ে পরদিন সকালেই এই পিসকো বন্দরে এলাম। দেখলাম দুতিনটে জাহাজ নোঙর ফেলে জলে ভাসছে। জাহাজের মাথায় যার যার দেশের পতাকা উড়ছে। তিনটে জাহাজেরই পতাকা দেখলাম। একটা ইংরেজদের অন্যটা ফরাসীদের। আপনাদের জাহাজে দেখলাম ডেনমার্কের পতাকা। অবশ্য আপনাদের দেশের পতাকা চিনতে বেশ কষ্টই হল। আমরা ঠিক করলাম এই জাহাজেই আমরা উঠবো। ডেনমার্ক অনেক দূরের দেশ। তবে আমাদের দেশের কাছে।

একটু রাত হতে আমরা জলে সাঁতার কেটে আপনাদের জাহাজে এলাম। তারপর তো আমরা কী করেছি আপনাদের দেখা।

—আপনাদের সব কথাই শুনলাম। একটু পরে ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল—আমাদের জাহাজে থাকবেন, খাবেন আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে কিছু খরচ দেবেন। আমরা খুব একটা বড়লোক নই।

—নিশ্চয়ই দেব। তা আপনারা আপনাদের দেশের দিকে কবে যাচ্ছেন? কাপাক বলল।

—সেটা এখনও স্থির করিনি। মাজোর্কার রাজা আপনাদের একটা নক্সা দিয়েছেন। আপনি নক্সাটা একটু দেখতে দিন।

—নিশ্চয়ই। কথাটা বলে কাপাক কোমরের খুঁট থেকে নক্সাটা বের করল। ফ্রান্সিসের হাতে দিল।

ফ্রান্সিস বিবর্ধক কাঁচটা নিয়ে নকশাটা দেখতে লাগল।

নক্সাটা এরকম—

খুঁজে খুঁজে একটা সরাইখানা পেলাম। ছোট সরাইখানা। সরাইওয়ালাকে বললাম—আমাদের কথা বলতে—কষ্ট হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি পারেন খেতে দিন।

—কী খাবেন?

—মাংস রুটি। ব্যস আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। ঈগর বলল।

সরাইওয়ালার একজন লোক আমাদের ঘরটায় ঢুকতে বলল। ঢুকলাম এটাই শোবার ঘর। ঘাসপাতা বাঁধা বিছানা। মাথার বালিশ বলে কিছু নেই। কিন্তু আর অত ভাববার সময় নেই। হাতমুখ ধুয়ে এসে শুয়ে পড়লাম। আরো দু'জন লোকও ছিল।

ভোর হল। সরাইওয়ালাকে বললাম—ঘণ্টা খানেকের মধ্যে খেতে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। চিনেমাটির থালা গ্লাসে জল কাজের ছেলেটি রেখে গেল। আমরা বসে পড়লাম। রাঁধুনি গোল করে কাটা রুটি আর আলু সবজির ঝোল দিল। তারপর মুর্গীর মাংস দিয়ে গেল। আমরা হাপুসহুপুস খেতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি খেতে লাগলাম। পেট ভরে খেতে হবে। রাঁধুনি আরো রুটি দিতে এসে বলল—আস্তে খান। গলায় লাগবে। কে কার কথা শোনে। আমরা সমান গতিতে খেয়ে চললাম।

আজকেই পিসকো যাবো।

—ঠিক আছে। ঈগর বলল।

তৈরি হয়ে আমরা এই পিসকো বন্দরের দিকে আসতে লাগলাম। দুপুর তখন। চড়া রোদ গরম বাতাস। বেশ কাহিল হয়ে পড়লাম। এক গরীব চাষীর বাড়িতে বসার জায়গা পেলাম। এত খিদে পেয়েছে তখন যে ভদ্রতা টদ্রতা বিচার করতে পারছিলাম না। বললাম—আমরা খুব ক্ষুধার্ত। কিছু খেতে দিতে পারেন? চাষীর বৌ তাড়াতাড়ি আমাদের জন্যে কয়েকটা রুটি করল। আর আলুভাজা। আমরা গোগ্রাসে তাই খেলাম।

আর বিশ্রাম করলাম না। যাত্রা করলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পিসকো বন্দরে এসে বিদেশি জাহাজের খোঁজ করা। তারপর সেই জাহাজে চড়ে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া। রাত হয়ে গেলে জাহাজের পতাকা দেখতে পাবো না। তাই দ্রুতএসে বিকেল নাগাদ এই পিসকো বন্দরে এলাম। খুঁজে খুঁজে আপনাদের জাহাজটা দেখলাম।

জাহাজঘাটায় রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর আমরা অন্ধকার সমুদ্রে সাঁতরে সাঁতরে আপনাদের জাহাজে উঠলাম। ঈগর হালে বসে রইল। আমি এলাম।

দেখলাম আপনারা ভালো মানুষ। বিদেশী আপনারা। তবু আপনাদের ব্যবহারে কথাবার্তায় খুবই ভালো লাগল। ঈগরকে খবর পাঠিয়ে আনালাম।

আমাদের সব কথাই আপনাদের বললাম। আমরা দস্যুও নই চোরও নই। এখন আপনাদের বিবেচনা আপনারা আমাদের আশ্রয় দেবেন কিনা। ফ্রান্সিস বলল—আপনাদের খাদ্য আশ্রয় দুটিই দেওয়া হবে। হ্যারি বলল—বুঝতে পারছি আপনারা সৎ ও নির্ভীক। আপনারা আমাদের জাহাজেই থাকবেন। একটু পরে কাপাক বলল—কী বলে যে আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাবো বুঝতে পারছি না।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—নক্সাটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। নক্সাটা নিয়ে আমি দু'একদিন ভাববো। তারপর আপনাকে ফেরৎ দেব।

—ঠিক আছে—কাপাক বলল—আপনার কি মনে হয় এই গুপ্তধন উদ্ধার করা যাবে? কাপাক বলল।

—এখনই বলতে পারছি না। রাজবাড়িতে যাই। সব দেখে টেখে বুঝতে পারবো গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবো কিনা। আসল কথা হল নক্সাটার নির্দেশ মেনে এগোতে হবে। তার জন্যে একটু সময় লাগবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আপনি কি মাজোর্কা যাবেন? কাপাক বলল।

—নিশ্চয়ই যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদেরও যেতে ইচ্ছে করছে। কাপাক বলল।

—যাবেন। রাজা কুয়েক হুয়া আপনাকেই নক্সাটা দিয়েছেন। কাজেই নকশা দেখে গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারলে সেটা আপনারই প্রাপ্য। আমরা শুধু উদ্ধার করে দেব। তারপর রাজা কুয়েক হুয়া ও আপনি গুপ্তধন নিয়ে যা করার করবেন। ফ্রান্সিস বলল—

—আপনারা গুপ্তধন নেবেন না? কাপাক জানতে চাইল।

—না আমরা বুদ্ধির লড়াই পছন্দ করি। ভালো লাগে নকশার নির্দেশ বোঝা আর সেই অনুযায়ী ধীরে ধীরে এগিয়ে গুপ্তধন উদ্ধার করা। ফ্রান্সিস বলল।

—এতেই আপনারা খুশি? কাপাক বলল।

—হ্যাঁ। গুপ্তধন ও সম্পদের ওপর আমাদের কোন লোভ নেই। আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে গুপ্তধন উদ্ধার করে যার প্রাপ্য তাকে দিয়েই আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ করি।

—আপনাদের মত এরকম মানুষ আছে? কাপাক বলল।

—আছে—আছে। তাদের সন্ধান পান নি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস নকশাটা নিয়ে নিজের ঘরে এল। দেখল মারিয়া ছুঁচসুতো নিয়ে কী কাজ করছে। ফ্রান্সিস বিছানায় বসল। নক্সাটা বের করে দেখতে লাগল। মারিয়া বলে উঠল—আবার নক্সা? হায় যীশু!

—শোন শোন। অতীতের এক রাজার হাতে আঁকা এই নক্সাটা। ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয় গুপ্তধনের ব্যাপার আছে। মারিয়া বলল।

—অবশ্যই আছে। নইলে আমি দেখতে নেব কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—কোন দেশের কোন রাজার গুপ্তধন? মারিয়া বলল।

—এই দেশটার নাম পেরু। উত্তরে এক রাজ্য আছে। নাম মাজোর্কা। সেখানকার রাজার নাম কুয়েক হুয়া। তাঁর পিতামহ তাঁর ধনসম্পদ গোপনে রেখেছিলেন। ঐ রাজ্যের পরে একটা নদীর ওপারেই থাকে বুনো লোকদের রাজ্য। এরা যখন খুশি তখন দলবেঁধে মাজোর্কায় আসে। বাধা দেবার আগেই যা পায় চুরি করে নিয়ে যায়। এখন বর্তমান রাজার পিতামহ তাই তাঁর ধনসম্পদ একটা গোপন জায়গায় রেখেছিলেন। বুনোদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় তিনি মারা যান। বর্তমান রাজা কুয়েক হুয়াকে কিছু বলে যেতে পারেন নি। এখন রাজা একজনকে নক্সাটা দিয়েছেন যদি তিনি এই নক্সার অর্থোদ্ধার করতে পারেন। আমি তার কাছ থেকে নক্সাটা নিয়েছি। ফ্রান্সিস বলল।

—বুঝলাম। আবার গুপ্তধন উদ্ধারে নামবে। মারিয়া বলল।

—অবশ্যই নামবো। আমাকে তো জানো এইসব নক্সার অর্থ খুঁজে খুঁজে উদ্ধার করার মধ্যে আমি সবচাইতে আনন্দ পাই। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু দেশে ফেরার কী হবে? কতদিন বাবা মাকে দেখি নি। তুমি এসব বোঝো না। মারিয়া বলল।

—বুঝি। আমার তো মা নেই। বাবার জন্যেই চিন্তা হয়। কিন্তু এভাবে এসব ভাবলে মন দুর্বল হয়ে যায়। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ তা হয়। মন দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু এই ভাবনা ছাড়তেও পারি না। মারিয়া বলল।

—সেটাই করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া একটু রাগতস্বরেই বলল—আমি দেশে ফিরে যাব।

ফ্রান্সিস মারিয়ার মুখের দিকে তাকাল। দেখল মারিয়ার মুখটা কেমন লালচে হয়ে উঠেছে। তার মানে মারিয়া বেশ রেগে গেছে।

—তাহলে—ফ্রান্সিস বলল—এই পিসকো বন্দরে খোঁজ নিই।

—কেন? মারিয়া বলল।

—আমাদের দেশের দিকে যাবে এমন কোন জাহাজ পাই কিনা।

—তার মানে? মারিয়া বলল।

—তোমাকে আর কয়েকজন বন্ধুকে সেই জাহাজে তুলে দেব। তোমরা দেশে ফিরে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আর তুমি? মারিয়া বলল।

—আমার জীবন যেমন চলছে তেমনি চলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি তোমাকে এই বিদেশ বিভুঁইয়ে রেখে চলে যাবো? মারিয়া বলল।

—তাছাড়া তো উপায় দেখছি না। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস বুঝতে পারল না—কী বলবে? মারিয়ার কাঁধে হাত রেখে বলল— মারিয়া কেঁদো না।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মারিয়া বলল—আমি এই বিদেশে তোমাকে ফেলে যাব—এটা তুমি ভাবলে কী করে?

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। কথাটা তুলে নিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি যেদিন দেশে ফিরবো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবো। আর যদি না ফিরি—মারিয়া আর বলতে পারল না।

—আহা—ফ্রান্সিস বলল—আজেবাজে ভাবনা ছাড়ো তো। দুজনের সকালের খাবারটা নিয়ে এসো। বড্ড খিদে পেয়েছে।

মারিয়া উঠে দাঁড়াল। খাবার আনতে চলল।

ফ্রান্সিস গভীর মনোযোগ দিয়ে নক্সাটা দেখতে লাগল। যে ছোট্ট ব্যাগটায় নক্সাটা রাখা তার চামড়াটা শক্ত। বুনো শেয়ালের চামড়া নিশ্চয়ই। নকশার কাগজটাও চামড়া মেশানো পার্চমেণ্ট কাগজের।

মারিয়া খাবার আনল। দুজনে খেতে লাগল। মারিয়া নক্সাটা নিল। দেখতে দেখতে বলল—নকশাটার রহস্য বুঝতে পেরেছো?

—ভাবছি। দেখ—তিনটি চৌকোনো কিছু। বুঝলাম—তিনটে ঘর। কারণ মাঝখানে খাটের মত চৌকোনো কিছু। ওগুলো বিছানা বালিশ। প্রত্যেক ঘরেরই চারকোণায় ছোট কিছু আছে। ওগুলো কী ঠিক বুঝতে পারছি না। বেশ ভাবাচ্ছে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মারিয়া বলল—তিনটে ঘর। একটা একটু বড় আর একটা তার থেকে ছোট আর একটা সেটার থেকেও ছোট ঘর ছোট এই তো মনে হচ্ছে—বিছানা বালিশ।

—হ্যাঁ। শোবার ঘরই কারণ মাঝখানটায় খাটের মত চৌকোনো বিছানা আছে। বালিশও আছে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর নকশাটা যেন দেখে বলল—প্রত্যেকটি ঘরের চারকোণায় কী আছে বোঝা যাচ্ছে না।

মারিয়া নক্সার ওপর ঝুঁকে পড়ল। মুখ তুলে বলল—ঘরের চার কোণায় রয়েছে চারটি ফুলদানি। একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—

—পাথরের বড় বড় ফুলদানি। তুমি ঠিক ধরেছো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল—কিন্তু ঘরগুলো কোথায় আছে?

—সেটা জানতে হোলে খোঁজখবর করতে হবে। মারিয়া বলল।

—আমার মনে হয় এই ঘরগুলো হয় কুজকো বা মাজোর্কার রাজবাড়িতে আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা হতে পারে। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস ঘরটার বাইরে এল। দেখল এক ভাইকিং বন্ধু শুকনো কাপড় চোপড় নিয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল—ভাই হ্যারিকে একটু ডেকে দাও।

ফ্রান্সিস এসে বিছানায় বসল। একটু পরেই হ্যারি এল।

—ডাকছো কেন? হ্যারি জানতে চাইল।

ফ্রান্সিস নক্সাটা হ্যারির হাতে দিল। বলল—নক্সায় আঁকা চিহ্নগুলো দেখে আমি আর মারিয়া কিছু সিদ্ধান্তে এসেছি। এবার তুমি কী বল—তাই শুনবো।

নক্সাটা হাতে নিয়ে হ্যারি দেখতে লাগল। কিছু পরে বলল—ছোট বড় মিলিয়ে তিনটি শোবার ঘর। বিছানা বালিশ রয়েছে। হ্যারি বলল।

—অন্য কিছুও তো হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তিনটিই শোবার ঘর। বালিশ থাকবে এটাই ঠিক বোঝা যাচ্ছে।

—এই ঘর তিনটের কোথায় থাকতে পারে? ফ্রান্সিস বলল।

—মনে হয় রাজবাড়িতে। হ্যারি বলল।

—কোন্ রাজবাড়িতে? ফ্রান্সিস বলল।

—এই কুজকো অথবা মাজোর্কার রাজবাড়িতে। হ্যারি বলল।

—এটা কাপাক ঠিক বলতে পারবে। এখন প্রত্যেকটি ঘরের ঠিক চারদিকে চারটে কী আঁকা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

হ্যারি নক্সাটা দেখতে দেখতে একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—ঐ চারটে জিনিস ছোট ফুলদানি। পাথরের।

—হ্যারি—আমরাও ঐ সিদ্ধান্তেই এসেছি। ফ্রান্সিস হেসে বলল। তারপর বলল—হ্যারি কাপাককে ডেকে আনো। কাপাক কী বলে দেখা যাক।

হ্যারি বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কাপাককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল।

ফ্রান্সিস কাপাককে বিছানাতেই বসতে বলল। কাপাক বসল। ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। কাপাক বেশ আশ্চর্য হল। বলল—আপনাদের তো ছন্নছাড়া এক জীবন। ইনি আপনাদের সেই জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছেন?

—হ্যাঁ পেরেছি। মারিয়া বলল—সব জেনেশুনেই এসেছি। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা দেশে ফিরবো।

—সে তো খুব আনন্দের কথা। কাপাক বলল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—কাপাক—আপনার কাছে কয়েকটা বিষয়ে জানতে চাই।

—বেশ। বলুন কী জানতে চান? কাপাক বলল।

—এখন মাজোর্কার রাজা কে? ফ্রান্সিস বলল।

—কুয়েক হুয়া। কাপাক বলল।

—তাঁর সঙ্গে আপনার খুব হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। রাজা আমাকে খুব পছন্দ করতেন। আমারও রাজাকে ভালো লাগত। কাপাক বলল।

—রাজা আপনাকে গুপ্তধনের নক্সা দিয়েছিলেন? এটা আপনাকে বিশ্বাস করেই দিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়ই। কাপাক বলল।

—রাজবাড়িতে ক'টা ঘর? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—কোন ঘরের কথা জানতে চাইছেন? কাপাক বলল।

—ধরুন রাজার শয়নকক্ষে রাণী ও ছেলেমেয়েদের ঘর। আরও একটা ঘর থাকতে পারে। কাপাক বলল—আর একটা ঘর দেখিনি।

—আপনি শুধু দুটো ঘর দেখেছেন? ফ্রান্সিস বলল।

—প্রথমে রাজার ঘরটাই ধরুন। সেখানে কি চারদিকে চারটে ফুলদানি আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ আছে। কাপাক বলল।

—দুটো ঘরেই? ফ্রান্সিস বলল।

—তা বলতে পারবো না। কাপাক বলল।

—এটা তো জানতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা হলে রাজবাড়ি গিয়ে জানতে হবে। কাপাক বলল।

—হ্যাঁ রাজার বাড়ি ভালোভাবে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—নক্সাটা দেখে বুঝে এসব কথা বলছেন বোধহয়। কাপাক বলল।

—হ্যাঁ। নকশাটার ঘরগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঠিক আছে। আপনাকে বিরক্ত করলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। বরং আমার মনে আশা জাগছে যে আপনি এই নক্সার ধাঁধা বুঝবেন। গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবেন। কাপাক বলল।

—আপনাদের শুভেচ্ছা নিয়ে চেষ্টা করে দেখব। ফ্রান্সিস বলল।

কাপাক চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে ফ্রান্সিস বলল—আর দেরি করবো না। হ্যারি—কাল রাতেই রওনা হব।

—প্রথমে কোথায় যাবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—মাজোর্কা। রাজা কুয়েক হুয়ার সঙ্গে দেখা করবো। আরো কিছু জানার আছে। তারপর কাজে নামা। ফ্রান্সিস বলল। একটু চুপ করে থেকে হ্যারি বলল— তোমার কি দৃঢ় বিশ্বাস গুপ্তধন এই রাজবাড়িতেই আছে।

—হ্যাঁ। তবে রাজবাড়িতে গিয়ে সব বুঝতে পারব। ততদিন অপেক্ষা কর। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই শাঙ্কো ঢুকল। বলল—ফ্রান্সিস তুমি কালকেই মাজোর্কা যাচ্ছ।

—হ্যাঁ—ফ্রান্সিস হেসে মাথা ওঠানামা করল। তারপর বলল শাঙ্কো—তুমি এখনও সুস্থ নও। তোমাকে আর হ্যারিকে নিয়ে যাবো না। শুধু বিস্কো আমার সঙ্গে থাকবে। হ্যারি আর শাঙ্কো কোন কথা বলল না। এসব ব্যাপারে ফ্রান্সিসের কথাই শেষ কথা। এসব ক্ষেত্রে ওরা ফ্রান্সিসের কথাই মেনে নেয়।

হ্যারি শাঙ্কো ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মারিয়া বলল—শুধু একজন নিয়ে যাবে?

—উপায় নেই। হ্যারির তো জান—সহ্যশক্তি কম। ওকে সঙ্গে নেওয়া মানে ওকে কষ্ট দেওয়া। শাঙ্কোর অসুখ এখনও সারে নি। ভেনকে বলেছিলাম শাঙ্কোকে নিয়ে যাবো? ভেন বলেছে—শাঙ্কোর সুস্থ হতে এখনও এক সপ্তাহ লাগবে। কাজেই শাঙ্কোকেসঙ্গে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। ফ্রান্সিস বলল।

—ওরা মনে দুঃখ পেল। মারিয়া বলল।

—এতে দুঃখ পাওয়ার কী আছে? অন্য কোন অভিযানে নিয়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না।

পরদিন ফ্রান্সিস বিস্কোকে সঙ্গে নিল। কাপাক আর ঈগরও এল। চারজনে চলল আয়াচুচোতে ঘোড়া কিনতে।

ভর দুপুরে আয়াচুচোতে পৌঁছল। দরাদরি করে দুটো তেজি ঘোড়া কিনল। এবার ঘোড়ার সাজ। একটু দূরেই সারি সারি ঘোড়ার সাজের দোকান। ফ্রান্সিস প্রয়োজনীয় সব সাজই কিনল। দোকানি নিজেই সাজ পরিয়ে দিল।

খুব গরম পড়েছে। জিভ শুকিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস একটা সরবতের দোকানে এল। সরবৎ খেল সবাই। এবার ফেরা। ঘোড়ায় চড়ে ফেরা।

ফ্রান্সিস আর বিস্কো একটা ঘোড়ায় উঠল। অন্য ঘোড়াটায় কাপাক আর ঈগর চড়ল। ওরা ঘোড়া ছোটাল।

সন্ধ্যের আগেই পিসকো বন্দরে পৌঁছল।

পরদিন থেকে ফ্রান্সিস আর কাপাক ঘোড়া ছুটিয়ে ছুটিয়ে মোটামুটি অভ্যেসটা ঝালিয়ে নিল। এক ঘোড়ায় দুজন। সেটা অভ্যেস করিয়ে নিল। সেদিন সকাল থেকেই ফ্রান্সিসরা ব্যস্ত। সব গোছগাছ করে নেওয়া বড় ঝোলা ব্যাগে শুকনো খাবারও নিল। চামড়ার ব্যাগে জল নিল। তরোয়াল দড়ি নিল। কখন কোনটার প্রয়োজন পড়ে।

কাপাক আর ঈগর আগে পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে সমুদ্রতীরে উঠল। বিস্কোও চলল পাতা পাটাতনের দিকে। ফ্রান্সিস তখন মারিয়াকে সান্ত্বনা দিচ্ছে—কিছ্ছু ভেবো না—দিন কুড়ি পঁচিশের মধ্যে আমরা ফিরবো। মারিয়া একটু ফুঁপিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস বলল—কান্নাকাটি করো না। আমার মন দুর্বল করে দিও না। মারিয়া শান্ত হল চোখ মুছল।

—হাসো। ফ্রান্সিস প্রায় আদেশের মত বলল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে হাসল। ফ্রান্সিসও হাসল।

ফ্রান্সিস পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে সমুদ্রতীরে উঠল। দুজন দুজন করে দুটো ঘোড়ায় উঠল ফ্রান্সিসরা।

তারপর ঘোড়া ছোটাল। লক্ষ্য—মাজোর্কা। দুপুরে ঘোড়া থামিয়ে কিছু শুকনো খাবার ওরা খেয়ে নিল। তারপর আবার চলল।

সন্ধ্যে হল। রাত হল। আকাশে গোল চাঁদ দেখা গেল। জ্যোৎস্নায় সবকিছুই দেখা যাচ্ছিল। তবে স্পষ্ট নয়। পথ দেখা যাচ্ছিল। দুটো ঘোড়া ছুটে চলল।

একটু রাত হল। ফ্রান্সিস ঘোড়া থামাল। বলল—আর নয়। এখানেই ঘোড়া থামাও। ফ্রান্সিস ডানপাশে একটা পুকুর দেখল। ফ্রান্সিস পুকুরটার কাছে এসে ঘোড়া থামাল। কাপাকও ঘোড়া থামাল।

বিস্কো শুকনো গাছের ডালপাতার জোগাড় করল। ঈগর ওকে সাহায্য করল। তিনটি পাথর বসিয়ে উনুন করা হল। পুকুরের জল এনে রান্না চলল। ফ্রান্সিস

পুকুরপারের ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। বলল—বিস্কো—আজ তরকারিটা তুমিই কর। পরে রুটি করার সময় আমাকে ডেকো।

রান্না চলল। ছোট ব্যাগে আলুটালু ছিল—বিস্কো এনেছিল। সেসব দিয়ে তরকারি মত হল। সবশেষে রুটি। ফ্রান্সিস উঠে এল।

—ফ্রান্সিস—তুমি শুয়ে বিশ্রাম কর।

—বেশ। কিন্তু—ফ্রান্সিস বলতে গেল।

—কোন কিন্তু নয়। তুমি যাও। বিস্কো বলল।

—তুমি যখন বলছো। ফ্রান্সিস ফিরে এসে আবার ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল।

রাতের খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস বলল—রাতে আর ঘোড়ায় চড়বো না। কাল সকালে রওনা দেব। আজ এখানেই রাত কাটাবো। তাই হল। মোটা কাপড় ঘাসের ওপর পেতে বিছানা হল। ওরা শুয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিসের ঘুম আসতে দেরি হল। একটা সূত্র—রাজবাড়ির খাট। শোবার ঘর। আর পাথরের ফুলদানি। কিন্তু তিন নম্বর ঘরটায় এখনও যাওয়া হয় নি। আরো কিছু সূত্রের প্রয়োজন। এসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

সবাই ভোরে উঠল। রাতের কিছু রুটি বিস্কো রেখে দিয়েছিল। সকালের খাবার হিসেবে ঐ রুটিই মধু মিশিয়ে খাওয়া হল।

তারপর ঘোড়ার পিঠে উঠল সবাই। ঘোড়া ছোটাল মাজোর্কার দিকে।

তখন ভর দুপুর। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে লাগল। দেখল চারদিকেই বুনোগাছের ঝোপঝাড়। পুকুরও দেখল না। শুধু চারদিকে নজর রেখে চলল।

তখনই হঠাৎ বাঁপাশের গাছপালা থেকে ঘোড়ার ডাক শোনা গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আমরা বিপদে পড়লাম। ফ্রান্সিসের কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিকের জংলা গাছপালা থেকে ঘোড়ায় বসা সৈন্যরা বেরিয়ে এল। প্রায় পনেরজন সওয়ারি নিয়ে ঘোড়াগুলো পথের ওপর এল। ফ্রান্সিসরা ঘোড়া থামাল।

সবচেয়ে সামনের অশ্বারোহী ঘোড়া নিয়ে ফ্রান্সিসদের সামনে এল। কাপাকের কাছে এসে ঘোড়া দাঁড় করাল। হেসে বলল—অশুভ। এগারো দিন আমরা এখানে ঘাঁটি গেড়ে অপেক্ষা করছিলাম। জেনেছিলাম—আপনি মাজোর্কা যাবেন। কাজেই এই মোড়ে অপেক্ষা করছি। কুজবাই যান অথবা মাজোর্কাই যান এই মোড়ে আপনাকে আসতেই হবে।

—তুমি সেনাপতি হয়েছো? কাপাক জানতে চাইল।

সেনাপতি হেসে বলল—রাজা আমাকে দায়িত্ব দিলেন। আমিও দায়িত্ব নিলাম।

কাপাক চিৎকার করে বলল—তোমার মত একটা ডাহা চোরকে দাদা সেনাপতি করলেন?

সেনাপতি কোন কথা না বলে তরোয়াল বের করল। কাপাক তরোয়াল বের করার আগেই সেনাপতি কাপাকের ওপর তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস এরকমই ঘটবে বলে আঁচ করেছিল। ফ্রান্সিস তরোয়ালের খাপে তরোয়ালের হাতলে হাত দিয়ে ধরে রেখেছিল। ও দ্রুত তরোয়াল খুলে সেনাপতির তরোয়ালে ঘা মারল। সেনাপতির

তরোয়াল প্রায় ছিটকে যাচ্ছিল। কোনভাবে সামলাল। ফ্রান্সিস বলল—আমি লড়াই চাই না। সেনাপতি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এই চারজনকেই বন্দী কর। হাত বাঁধ। তারপর বলল—ঘোড়া থেকে নামো সব।

ফ্রান্সিসই নামল। বিস্কোকেও বলল নেমে আসতে। তারপর কাপাককে বলল—নেমে আসুন। ওরা সংখ্যায় বেশি। লড়াই চলবে না। সেনাপতি গলা চড়িয়ে বলল—নামুন। আপনাদের হেঁটে কুজকো যেতে হবে। কাপাক আর কোন কথা বলল না। ঈগরকে নামতে বলে নিজে ঘোড়া থেকে নামল। ফ্রান্সিসদের দুহাত পেছনে নিয়ে দুজন সৈন্য দড়ি দিয়ে বাঁধল। পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় ফ্রান্সিসরা হেঁটে চলল। ফ্রান্সিসদের ঘোড়া দুটোয় চারজন পদাতিক সৈন্য উঠল।

সেনাপতি তরোয়াল উঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল—কুজকো। সবার আগে একটা সাদা খয়েরি ঘোড়ার পিঠে সেনাপতি। তারপরে কিছু অশ্বারোহী সৈন্য। কিছু পদাতিক সৈন্য। পেছনে ফ্রান্সিসরা। ওদের পরে খোলা তরোয়াল হাতে কিছু পদাতিক সৈন্য।

শেষ বিকেলে ফ্রান্সিসরা কুজকো পৌঁছল। প্রধান প্রবেশ পথ দিয়ে ওরা নগরে ঢুকল। কিছু প্রহরী রয়েছে। সেনাপতিকে দেখে ওরা মাথা নিচু করে সম্মান জানাল।

ফ্রান্সিসরা নগরে ঢুকল। পথে বেশ ভিড়। অনেক লোক কেনাকাটা করছে। এদিকে ওদিকে ঘুরছে। অনেকেই সেনাপতির মিছিল দেখল। ওরা কাপাককে বন্দী অবস্থায় দেখে বেশ অবাক হল। ফ্রান্সিস আর বিস্কোকে ওদের দেশীয় পোশাকে দেখে লোকেরা নানা কথা বলতে লাগল। কাপাক মাথা নিচু করে হেঁটে চলল। কোনদিকে তাকাল না।

সদর রাস্তা দিয়ে ফ্রান্সিসদের মিছিল চলল। ফ্রান্সিস বিস্কো এই প্রথম ইন্‌কাদের রাজধানী কুজকো দেখল। সত্যি বেশ সাজানো গোছানো শহর। সদর রাস্তার ধার দিয়ে ফুলের গাছ। ফুল ফুটে আছে। মাঝে মাঝেই সদর রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাগানে জলের ফোয়ারা। শেষ বিকেলের আলোয় খুব সুন্দর বাগান ঝর্ণা বাড়িঘর দেখা গেল।

ওরা ফ্রান্সিসরা একটা বড় মাঠ দেখল। মাঠের পাশে লম্বাটে বাড়ি। বিস্কো বলল—সৈন্যাবাস। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল—হুঁ।

মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে ফ্রান্সিসরা এল লম্বাটে ঘরগুলোর একটা ঘরের সামনে। দুজন মশালবাহী সৈন্য ঘরের তালাটা খুলে দিল। ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকল। মেঝে জুড়ে একটাই ঘাসপাতার বিছানা। ফ্রান্সিস বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। কাপাক ফ্রান্সিসের পাশে এসে বসল। বলল—এটা কিন্তু সৈন্যাবাস। আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে মাচু পিচু নামের পাহাড়ে। ওখানে কয়েকটা গুহা আছে। গুহাতে কুজকোর গরীব মানুষজন থাকে। তারই মধ্যে একটা গুহায় কয়েদঘর। আমাদের সেখানে রাখা হবে।

—আজ রাতেই আমাদের নিয়ে যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কিছু খেতে দেওয়া হবে। তারপর। কাপাক বলল।

কিছু পরে দু'জন সৈন্য একটা বড় কাঠের গামলায় মাংসের বড়া নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। শরীর এত ক্লান্ত যে ফ্রান্সিসের খেতেই ইচ্ছে করছিল না। বিস্কো খেতে খেতে বুঝল সেটা। বলল—ফ্রান্সিস পেট পুরে খাও।

ফ্রান্সিস বলল—সারা রাস্তা এই গরমে ধূলো রোদ—খিদেটাই মরে গেছে যেন।

—তাহলেও খাও। আবার কখন খাবার জুটবে—মা মেরিই জানে। বিস্কো বলল।

—হুঁ—শরীর ঠিক রাখতে হবে। ফ্রান্সিস খেতে খেতে বলল।

ফ্রান্সিসের খাওয়া শেষ হল। জল খাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা একটু ধাতস্থ হল। শরীরে একটু জোরও পেল। ক্লান্ত ভাবটা কমল।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি এল। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—কী? ভালো আছ তোমরা?

—ওসব কথা অর্থহীন। আমাদের কয়েদখানায় নিয়ে চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—সে তো নেবই। তবে শরীরের অবস্থা এখন কেমন সেটাই জানতে চাইছিলাম। সেনাপতি বলল।

—এই নিয়ে আর কথা বলবেন না। ধূলো প্রচণ্ড রোদ আর ধূলো ওড়ানো বাতাস এসবের মধ্যে দিয়ে এলে লোকে যেরকম থাকে আমরা তেমনি আছি। এখন কয়েদ ঘরে নিয়ে চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা পাচাকুটির হুকুম এখনও পাইনি। রাজা এখানে একবার আসতেও পারেন। সেনাপতি বলল।

ফ্রান্সিসরা কেউ কোন কথা বলল না।

কিছুক্ষণ পরে সৈন্যদের মধ্যে বেশ ব্যস্ততা দেখা গেল। সেনাপতির উচ্চস্বরে বলা কথা শোনা গেল—

—সবাই ঘরে ঢোক। বাইরের মাঠে থাকবে না। সব সৈন্য ঘরে ঢুকে পড়ল। মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে রাজা পাচাকুটি এলেন। ধবধবে সাদা একটা ঘোড়ায় চড়ে। পেছনে তিনচারজন রাজার দেহরক্ষী।

রাজা ঘোড়া থেকে নামলেন। দেহরক্ষীরা নামল না। সেনাপতি রাজাকে ফ্রান্সিসদের ঘরে নিয়ে এল। রাজা ঘরে ঢুকে একবার চারদিকে চোখ বুলোলেন। ফ্রান্সিসরা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার রাজা কাপাকের দিকে তাকালেন। একটু পরে বললেন—কাপাক তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করেছো। তোমাকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

—দাদা—আমি জেনেশুনে এই ভুল করিনি। তখন ভেবেছিলাম সুন্দর নগরী মাজোর্কা যদি জয় করতে পারি তাহলে তোমার রাজত্বের সীমাও বাড়বে। আবার একটা সুন্দর নগরীও তোমার অধিকারে আসবে। কাপাক বলল।

—ওসব আমি শুনতে চাই না। আমার নির্দেশ অমান্য করেছো এটাই তোমার অপরাধ। রাজা পাচাকুটি বললেন।

—কিন্তু আমি যা করেছি তোমার জন্যেই করেছি। এ ব্যাপারে আমার কোন স্বার্থ ছিল না। কাপাক বলল।

—কে জানে? কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ তোমার ছিল কিনা। রাজা বললেন।

একটু থেমে কাপাক বলল—কত যুদ্ধে জয়ী হয়ে তোমার সাম্রাজ্য বাড়িয়েছি। আজকে একটা সামান্য ভুলের জন্যে আমাকে হত্যা করবে?

—ওসব কথা তুলে লাভ নেই। ফাঁসি তোমার হবেই। রাজা বললেন।

এতক্ষণে রাজা পাচাকুচির নজর পড়ল ফ্রান্সিসদের ওপর। রাজা সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করলেন—এরা কারা?

—বিদেশী। কাপাকোর সঙ্গী সব। সেনাপতি বলল।

—তোমরা কোন দেশের লোক। রাজা জিজ্ঞেস করলো।

—আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—এখানে কী জন্যে এসেছো? চুরি ডাকাতির মতলব নেই তো? রাজা বললেন।

—ভাইকিংরা চুরি ডাকাতি করে না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে এই দেশে এসেছো কেন? রাজা বললেন।

একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—মাজোর্কার রাজা কুয়েক হুয়া তাঁদের পারিবারিক সম্পদের সঙ্গে একটি নক্সা পেয়েছিলেন। তাঁর পিতামহের আঁকা নকশাটিতে তাঁদের ধন সম্পদের নিশানা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজা কুয়েক হুয়ার পিতা নক্সার অর্থ বের করতে পারেন নি। ওখানকার বুনো মানুষদের সঙ্গে লড়াইয়ে রাজা কুয়েক হুয়ার পিতামহ হঠাৎই মারা যান। নক্সা সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলে যেতে পারেন নি। রাজা কুয়েক হুয়ার পিতা অনেক চেষ্টা করেও গুপ্ত ধনভাণ্ডারের হদিশ করতে পারেন নি। কুয়েক হুয়া নিজেও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেন নি। হতাশ হয়ে তিনি কাপাককে নক্সাটা দিয়ে দেন। কাপাকও পারে নি। নক্সাটা আমি পেলাম। এই ব্যাপারে আমরা মাজোর্কা যাচ্ছিলাম। পথে আপনার সেনাপতি আমাকে বন্দী করেন। সবই আপনাকে বললাম। আমাদের একটাই কথা—আমরা বন্দী হওয়ার মত কোন অপরাধ করি নি।

রাজা পাচাকুচি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—নক্সাটা তোমার কাছে আছে?

—হ্যাঁ। কাপাক বলল।

—আমাকে দাও। রাজা বললেন।

—কিন্তু—যদি মাজোর্কার রাজবাড়িতে খোঁজ করার সুযোগ পাই—

—ঐ সুযোগ তুমি কোনদিনই পাবে না। গুহার কয়েদখানায় থেকে থেকেই একদিন মারা যাবে। কাজেই ওটা আমাকেই দাও। রাজা বললেন।

—বেশ এই নিন। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টির মধ্যে থেকে নক্সাটা বের করল। রাজার দিকে বাড়িয়ে ধরল। রাজা খপ্ করে যেন কেড়ে নিলেন। বললেন—মন্ত্রীমশাইকে দেব। মন্ত্রীমশাই অত্যন্ত বুদ্ধিমান। এই নক্সার রহস্য উনি অনায়াসে ভেদ করতে পারবেন।

এবার ফ্রান্সিস বলল—আপনি তো নক্সা পেলেন। এবার আমাদের ছেড়ে দিন।

—না-না—রাজা মাথা নাড়লেন—তোমরা গুপ্তধন চুরি করতে এসেছো তোমাদের ছাড়া হবে না। কাপাক বলল—দাদা—আমি অপরাধ করেছি—নিজের অজান্তে—আমাকে শাস্তি দাও, এরা বিদেশী, এদের কেন বন্দী করে রাখা হবে?

—তোমার সঙ্গী তাই। কাউকে ছাড়া হবে না। রাজা বললেন।

রাজা ঘরের বাইরে গেলেন। সাদা ঘোড়াটায় উঠলেন। পেছন পেছন সেনাপতি ঘোড়াটায় উঠলেন। দুজনে ঘোড়া চালালেন। পেছনে কয়েকজন দেহরক্ষী, অশ্বারোহী সৈন্য।

ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে পড়ল। বিস্কো বলল—

—ফ্রান্সিস এটা কী করলে?

—কী করলাম? ফ্রান্সিস বলল।

—নক্সাটা দিয়ে দিলে? বিস্কো বলল।

—ওটা নকল। আসলটা হ্যারির কাছে আছে। ঐ নিয়েই সন্তুষ্ট হল। নইলে কাপাকের সঙ্গে আমাদেরও ফাঁসিতে ঝোলাত। রাজামশাই অত্যন্ত নিচুমনা মানুষ।

—ঠিকই বলেছেন। ও আমার দাদা। তবু আমি ওকে ঘৃণা করি। ওর সঙ্গে মতের মিল না হলেই ঝোলাও ফাঁসিতে। ওর হুকুমে ইতিপূর্বে দুজন মন্ত্রী ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে। সেনাপতি মরেছে তিন জন। আমিই সবচেয়ে বেশিদিন সেনাপতি ছিলাম। এখন তো আমাকে ঝোলাবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। ভাই বলে রেহাই নেই।

ঘরের কোণায় রাখা মোমবাতিটার দিকে ফ্রান্সিস তাকিয়ে রইল। মাথায় চিন্তা। কবে নাগাদ ফিরতে পারবে। জাহাজে মারিয়া, বন্ধুরা নিশ্চয়ই খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। ফ্রান্সিসের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ফ্রান্সিসের চোখ জ্বালা করে উঠল। ও চোখ বন্ধ করল।

হঠাৎ কারর কথায় ও চোখ খুলল। দেখল একজন সৈন্য ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সৈন্যটি বলল—চলো সব। কয়েদখানায় চল।

ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল। ঘরের বাইরে এল। ছ'সাতজন সৈন্য আগে পিছে দাঁড়াল। চলল সবাই। রাস্তায় লোকজন চলাচল করছে। আকাশে চাঁদ আছে কি না ফ্রান্সিস তাকাল। চাঁদ কুয়াশা-ঢাকা চারদিক অন্ধকার রাস্তার লোকেরা ফ্রান্সিসদের দেখল।

নগরের পেছন দিককার দরজার কাছে এল। দরজায় সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। সৈন্যটি প্রহরীদের কি বলল। প্রহরীরা সরে গেল। নগরের পেছন দিককার দরজা খুলে গেল। ফ্রান্সিসরা দরজা দিয়ে বাইরে এল। ওরা চলল।

এই অন্ধকারেও ফ্রান্সিস দেখল উত্তরদিকে একটা পাহাড়ের মত। খুব উঁচু নয়। এই রাস্তা গেছে ঐ পাহাড়ের দিকে। নগর ছাড়িয়ে এই রাস্তাটা পাথর ছড়ানো। এবড়ো খেবড়ো। হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। ফ্রান্সিসরা ঐ রাস্তা দিয়েই চলল।

পাহাড়ের নিচে এসে দেখল কয়েকটা গুহা। গুহার মুখে মশাল জ্বলছে। একটা গুহার মুখ বেশ বড়। গুহার মুখে দুপাশে দুটো মশাল জ্বলছে। চারজন প্রহরী তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিসরা গুহার মুখে এল। দেখল গুহায় একটু এগিয়েই পাথরে পোঁতা লোহার গরাদ। তাতে একটা ছোট দরজা, এক প্রহরী এগিয়ে এসে দরজার তালা খুলে দিয়ে ফ্রান্সিসদের ইঙ্গিতে ঢুকতে বলল। ফ্রান্সিসরা ঢুকল। একটু দূরে গুহার ভেতরের দিককার আর একটা গরাদ পোঁতা জায়গা। ঐ দুটি গরাদের মধ্যেই যতখানি জায়গা তাই বন্দীরা পাবে।

ফ্রান্সিস দেখল মেঝেয় ঘাসের বিছানা। ফ্রান্সিস দেখেই বুঝল শুয়েও বিশ্রাম করা যাবে না। পাথরকুচি ছড়িয়ে আছে। বসলে শুলে পাথরের কুচি ফুটবে। সেই অবস্থাতেই ফ্রান্সিস শুয়ে রইল। বিস্কোরাও বসল। দেখল—পেছনের দিকে একটা মাটির জালা। নিশ্চয়ই জল আছে ওটাতে। ও উঠে জালাটার কাছে গেল। জালার মুখ-ঢাকা কাঠটা সরাল। দেখল জল। ও পাশে রাখা একটা কাচের গ্লাশমত পেল। ও গ্লাশ ডুবিয়ে পরপর তিনবার জল ভরে খেল। ফিরে এসে ফ্রান্সিসকে বলল—যাও। জল আছে ওখানে। ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল—একটা পাত্রে করে এনে দাও। বিস্কো বুঝল ফ্রান্সিস খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ও গিয়ে গ্লাশের মত পাত্রটায় জল ভরে নিয়ে এসে ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিসও পরপর তিনবার জল খেল। কাপাকরাও জল খেল।

ফ্রান্সিস চুপচাপ শুয়ে রইল। অনেক চিন্তা মাথায়। রাজা কুয়েক হুয়ার গুপ্তধন। এই বন্দীদশা। কবে ছাড়া পাবে তার কোন ঠিক নেই। দেরি করা চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে ফিরতে হবে।

একটু রাত্রে ফ্রান্সিসদের খাবার এল। দুজন সৈন্য ফ্রান্সিসদের সামনে প্রত্যেককে পাতা দিল। তারপর পোড়া রুটি আর তরিতরকারির ঝোল। ফ্রান্সিস চেয়ে চেয়ে নিয়ে নিল। বলল—বিস্কো পেট পুরে খাও। চেয়ে চেয়ে খাও। শরীর ঠিক রাখো। এটা বন্দী জীবনে ফ্রান্সিস বন্ধুদের বলে থাকে।

খাওয়া শেষ। রক্ষীরা চলে গেল। জল খেয়ে ফ্রান্সিস বলল—কাপাক আগেই শোবেন না। সবাই বিছানাটা তুলুন। বিছানাটা তোলা হল। ফ্রান্সিস এঁটো পাতাগুলি দিয়ে জায়গাটা থেকে পাথরের কুচিগুলো সরালো। তারপর বিছানা পাতা হল। এবার আর পাথরকুচি বিঁধছে না। ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু সকালেই ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। ও উঠে বসল। ও বাইরের দিকে তাকাল। দেখল—চারজনের জায়গায় দু'জন প্রহরী। আর দুজন বোধহয় খাবার আনবে। ও লক্ষ্য করল দুই প্রহরী নিজেদের মধ্যে কী নিয়ে কথা বলছে।

হঠাৎই কুজকো নগরের দিক নগর থেকে চিৎকার হৈ-হল্লার শব্দ ভেসে এল। ফ্রান্সিস বলল—কাপাক—কীসের শব্দ বলুন তো! কাপাক বলল—কুজকো নগরী আক্রান্ত।

—তার মানে? কারা আক্রমণ করল? ফ্রান্সিস বলল।

—পাশের রাজ্যের সঙ্গে এই কুজকো রাজ্যের ঝগড়া চলছে বহুদিন ধরে। বর্তমান রাজারাও লড়াইতে জড়িয়ে গেছে। লড়াই চলছে।

—তাহলে আমরা কী করবো? ফ্রান্সিস বলল।

—অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। কাপাক বলল।

ফ্রান্সিসরা চুপচাপ শুয়ে বসে রইল। ওদিকে অস্পষ্ট চিৎকার আর্তনাদ গোঙানির শব্দ আসতে লাগল।

বেলা বাড়তে লাগল। সকালের খাবার এল না। কাপাক গরাদের কাছে গেল। গরাদের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে বলল—

—কী ভাই? আমাদের খাবারের কী হল?

প্রহরী ঘুরে দাঁড়াল। বলল—আমাদেরও খাবার জোটে নি।

—কারণ কী? ফ্রান্সিস বলল।

—রাঁধতে টাঁধতে দেরি হচ্ছে আর কি। প্রহরী বলল।

—সত্যি কথাটা বল ভাই। পাশের রাজ্যের রাজা কুজকো অধিকার করতে এসেছে। দাদার সৈন্যরা লড়াই চালাচ্ছে। রাঁধুনীও লড়াইতে গেছে। কাপাক বলল।

প্রহরী সাদামাটা গলায় বলল—কতকটা ঐরকমই ব্যাপার।

—তোমার বন্ধুকে দেখছি না। কী ব্যাপার? ফ্রান্সিস বলল।

—খাওয়ার ব্যবস্থা করতে গেছে। প্রহরী বলল।

—তাহলে খাবার পাওয়া যাবে? ফ্রান্সিস বলল।

—দেখা যাক। প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। পরে কাপাকের কাছে গেল। বলল—মাত্র একজন প্রহরী। ওকে সহজেই কাবু করা যায়। কী বলেন?

—হ্যাঁ। যায়। একটু অপেক্ষা করুন। দেখা যাক অন্য প্রহরীটা আসে কি না।

—কিন্তু সেইজন্য অপেক্ষা করতে যাব কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। কাপাক উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে গরাদে হাত চেপে দাঁড়াল। বলল—ভাই একটু দেখবে?

—কী দেখবো? প্রহরী বলল।

—আমার চোখে কী পড়েছে। কাপাক বলল।

—তোমার বন্ধুদের বলো না। প্রহরী বলল।

—এই অন্ধকারে ওরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কাপাক বলল।

—আমিই কি দেখতে পাবো? প্রহরী বলল।

—আহা—তুমি দেখতেই পাবে একথা বলছি না। তবু দেখ।

প্রহরী হাতে বর্শা রেখে এগিয়ে এল। কাপাক গরাদের মধ্যে দিয়ে মাথাটা বের করল। বলল—দেখ। প্রহরী এগিয়ে এল। কাপাকের কাছে এল। মাথা নিচু করে চোখ দেখতে গেল তখনই কাপাক গরাদ দিয়ে হাত বাড়িয়ে প্রহরীর ঘাড় চেপে ধরল। প্রহরী মাথা নাড়তে লাগল। চেষ্টা করল সরে যেতে। কিন্তু পারল না। এবার ফ্রান্সিসরা গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বের করে প্রহরীর গলা মাথা চেপে রাখল। প্রহরী ওর মাথাটা টেনে নিতে চাইল। কিন্তু একটু পরেই বুঝল— এদের হাত ছাড়ানো যাবে না। অসম্ভব।

এবার ফ্রান্সিস বলল—চাবি বের কর। দরজার তালা খুলে দাও।

—চাবি আমার কাছে নেই। প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস ওর গালে মুখে একটা চড় মারল।

—না। আমার কাছে নেই। প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস আবার চড় কষাল। প্রহরী বুঝল চাবি না দিলে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। ও কোমরের গোঁজা চাবির থোকাটা বের করল। ফ্রান্সিস ওর হাত থেকে চাবির থোকাটা নিয়ে নিল। কাপাক প্রহরীর গলা চেপে ধরল। টেনে নিয়ে চলল দরজার

দিকে। দরজার সামনে এসে বলল—এইবার দরজার তালা খুলে দাও। প্রহরী ঘাড় কোমর সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল। আবার ফ্রান্সিস প্রহরীর মুখে চড় মারল। প্রহরী গালে হাত বুলোতে বুলোতে চাবির তোড়াটা ফ্রান্সিসের কাছ থেকে নিল। চাবিটা বের করে কয়েদগুহার তালা খুলে দিল। ফ্রান্সিসরা বেরিয়ে এল। পুরোনো বন্দীরাও বেরুল। বেরিয়ে এসেই ছুটতে শুরু করল। তারপর ওরা কী করল। বন্দীদের আর দেখা গেল না।

কাপাক পাথুরে রাস্তায় নামল। বলল, এটাই একমাত্র রাস্তা বের হবার। চলুন। ফ্রান্সিসরা কাপাকের নির্দেশমতই চলল। কুজকো নগরের যত কাছে আসছে ফ্রান্সিসরা লড়াই এর শব্দ শুনতে লাগল। কিছুক্ষণ আগের থেকে এখন অনেক স্পষ্ট যুদ্ধের চিৎকার গোঙানি শোনা যাচ্ছে।

বোঝাই গেল লড়াই-এ জিগির চিৎকারে অনেক ভাঁটা পড়েছে। এখন আহতদের কান্না গোঙানি শোনা যাচ্ছে। পেছনের প্রবেশপথে মাত্র একটা মশাল জ্বলছে। প্রহরী কেউ নেই। ফ্রান্সিস বলল—এখন কী করা যায়। কাপাক বলল— অনেক বেলা হয়েছে সকাল থেকে না খেয়ে আছি। নগরের মধ্যে ঢোকা যাক। কিছু খাবার জোটে কিনা দেখা যাক।

—এখন তার আগে তো জানতে হবে কে জিতলো কে হারলো। ফ্রান্সিস বলল।

—ওটা নগরে ঢুকলেই বোঝা যাবে। কাপাক বলল।

—এখন খিদেটা না খেতে পেয়ে আরো বেড়েছে। প্রথমেই খেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক। কাপাক বলল।

এবার ফ্রান্সিসরা প্রবেশ পথ ধরে এল। প্রবেশ পথের ধারে কাছে প্রহরীরা নেই। একটু এগোতেই লড়াইয়ের ভয়াবহয়তা দেখা গেল। সৈন্যরা মরে পড়ে আছে। সৈন্যাবাসের সামনের মাঠটায় মৃতরা পড়ে আছে। আহতেরা আর্তনাদ করে উঠছে। অনেক ঘোড়া মরে পড়ে আছে। নয় তো আহত হয়ে মাঠে কাঁতরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। একজন আহত সৈন্যকে কাপাক জিজ্ঞেস করল—ভাই রাগ করবেন না! বলুন তো কে জয়ী হল? সৈন্যটি আস্তে আস্তে বলল—

—পামার রাজ্যের রাজা চিমোর ইনকা হেরে গেছে।

—তুমি কোন রাজার যোদ্ধা?—পাচাকুটি না চিমোর ইনকার দেশের?

—আমি রাজা পাচাকুচির দেহরক্ষী।

ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—লড়াই কি এখনও চলছে?

—বসতি অঞ্চলে চিমোর ইনকার সৈন্যরা এখনো লড়াই করে যাচ্ছে। এরাই বেঁচে থাকা শেষ যোদ্ধা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মরবে নয়তো বন্দী হবে। দেহরক্ষী বলল।

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে আছে তখনই দেখল এক বৃদ্ধ আর একজন যুবক আহত সৈন্যদের কাটা জায়গায় ঝোলা থেকে ওষুধ বের করে লাগাচ্ছে! বেশ বোঝা গেল বৃদ্ধ রাজবৈদ্য। যুবকটি তাঁর সহকারী। তাঁরা ঘুরে ঘুরে আহতদের ওষুধ দিচ্ছে!

ফ্রান্সিস বলল—কাপাক এখন এখানে বসে থেকে লাভ নেই। প্রথমে খাবার চাই। খাওয়ার শেষে আমরা আর অপেক্ষা না করে মাজোর্কার দিকে রওনা হব। সবাই এসো। চলো।

সবাই একত্র হল। ফ্রান্সিস আর কাপাক সকলের সামনে। দল বেঁধে চলল সব। হাঁটতে হাঁটতে ফ্রান্সিস বলল—বিস্কো ঈগর—কোন সরাইখানা দেখলে বলবে।

—কিন্তু লড়াইয়ের এই ডামাডোলের মধ্যে কোন সরাইখানা কেউ খুলবে? বিস্কো বলল।

—এখন খুলবে। মানে দরজা আধভেজানো রাখবে। সবাই তো আর যুদ্ধে নামে নি। সকাল থেকে কারো কারো বাড়িতে রান্না হয় নি। সারা সকাল থেকে অনেকের উপবাস চলছে। তারা তো খাবার খুঁজবে। খাবার পাবে সরাইখানায়। সরাইখানার মালিকরা তা ভালো করেই জানে। ওরা ব্যবসায়ী। ঠিক লুকিয়ে চুরিয়ে খাবার বিক্রি করবে। একটা বটগাছের তলায় একটা সরাইখানা দেখল বিস্কো। ফ্রান্সিসকে দেখাল। ফ্রান্সিস বলল—কাপাক চলুন। ফ্রান্সিস কাছে এসে ভেজানো দরজায় টোকা দিল। কোন সাড়া নেই। আবার টোকা দিল। ভেজানো দরজা খুলে গেল। সবটা নয়। বোধহয় সরাইখানার রাঁধুনি বা কাজের লোক মুখ বাড়াল। কাপাক এগিয়ে গেল। বলল—লড়াইয়ের জন্যে আমরা খেতে পারিনি। এখন ভীষণ খিদে। খেতে দাও। লোকটি দু'একবার গাঁইগুঁই করল। ফ্রান্সিস বলল—আমরা কিন্তু রাজা পাচাকুচির সৈন্য। আমাদের জয় হয়েছে। কাজেই—

—না-না। ভেতরে আসুন। লোকটা বলল।

লোকটি দরজাটা আরো কিছুটা খুলল। ফ্রান্সিসরা কাত হয়ে ঢুকে পড়ল। টানা একটা কাঠের পাটাতনে বসল। তখনই মালিক এল। হেসে বলল —আপনাদের কথা রাইট বলেছে। লড়াই চললে কী হবে? লোকের পেটের খিদে তো মিটবে না। তাই আমি লুকিয়ে চুরিয়ে ক্ষুধার্ত মানুষদের খাবার দিচ্ছি।

—সত্যি আপনি প্রশংসনীয় কাজ করছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—যতটা পারি আর কি। সরাইওয়ালা হেসে বলল।

—এবার আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। কাপাক বলল।

মালিক ডাকল—রবার্ট?

রবার্ট এগিয়ে এল।

—রান্না কতদূর? এঁরা অভুক্ত। সরাইওয়ালা বলল।

—রুটি হয়ে গেছে। তরকারিটা ফুটছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ে যাবে। রবার্ট বলল।

—মাংসের ব্যবস্থা করেছো? মালিক বলল।

—না—মাংস জোগাড় করতে পারলাম না। রবার্ট বলল।

ফ্রান্সিস বলল—রবার্ট আমাদের রুটি দিয়ে যাও।

—শুধু রুটি? রবার্ট জানতে চাইল।

—হ্যাঁ সঙ্গে পেঁয়াজ আর নুন। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা সবাই নুন পেঁয়াজ আর রুটি খাবেন? রবার্ট আবার বলল।

—না। তবে কেউ খেতে চাইলে খাবে। যা বললাম নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

রবার্ট অবাক চোখে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চলে গেল।

মালিক বলল—রবার্ট তো বলে গেল ঝোলটা তাড়াতাড়িই হবে।

—ঠিক আছে। আমাকে আমার ইচ্ছেমত খেতে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। মালিক হেসে বলল। তারপর চলে গেল।

রবার্ট খান চারেক রুটি আর পেঁয়াজ নিয়ে এল। ফ্রান্সিসের সামনে একটা পাতা পেতে দিল। তাতে রাখল সব। ফ্রান্সিস রুটি খেতে লাগল। পেঁয়াজটা কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল। খেতে খেতে ডাকল—রবার্ট। রবার্ট এল।

—দুটো টমেটো দিয়ে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

রবার্ট টমেটো দিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস নির্বিকার মুখে সবই খেতে লাগল। ফ্রান্সিসের খাওয়া তখনও শেষ হয়নি। রবার্ট সবজির তরকারি দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস খেয়ে চলল। এবার রবার্ট অন্যদের খাবার দিতে লাগল। বিস্কোরা খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ। হাতমুখ ধুয়ে ফ্রান্সিসরা এসে পাটাতনে বসল। কিছুক্ষণ ওরা চুপ করে বসে রইল। একসময় কাপাক বলল—ফ্রান্সিস আমাদের এখানকার কাজ হয়ে গেছে। এখন মাজোর্কা যেতে হবে। আর দেরি করা ঠিক নয়।

—বেশ চলুন। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। আর সবাইও উঠে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস দাম মেটাল। তারপর সবাই রাস্তায় এল। ফ্রান্সিস মাজোর্কার দিকটা বুঝে নিল। বলল—আমাদের পূবমুখো যেতে হবে।

যেতে যেতে দেখল—রাস্তায় বাড়িঘরের সামনে অস্ত্রাঘাতে নিহত মানুষেরা পড়ে আছে। রাস্তায় কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সবাই বেশ ভীত, সন্ত্রস্ত।

সদর দেউড়ির কাছে এল ওরা। দেখল দরজার কাছে অনেক মৃতদেহ পড়ে আছে।

—থামবেন না। দ্রুত সদর দেউড়ি পার হয়ে যাবেন। কাপাক মৃদুস্বরে বলল। কিন্তু সবাই শুনতে পেল। ওরা দ্রুতপায়ে খোলা দেউড়ি পার হয়ে গেল। দু'তিনজন দ্বাররক্ষী ছিল। তারা বাধা দিল না। তাদের হাতে বল্লমও ছিল না। বোধহয় আহত।

বাইরে এসে ফ্রান্সিস বলল—কাপাক—দুটো ঘোড়া চাই। মাজোর্কা বেশ দূর।

—হ্যাঁ। হেঁটে গেলে থেমে থেমে যেতে হবে। দেরি হবে। কাপাক বলল।

—দেরি করা চলবে না। জাহাজে আমার বন্ধুরা সব রয়েছে। ওরা আমাদের জন্যে চিন্তায় আছে। আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

—তাহলে ঘোড়া জোগাড় করতে হয়। কাপাক বলল।

—চেষ্টা করতে হবে। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকাতে লাগল। তখনই দেখল একটু দূরে একটা শিশু গাছে তিনটে ঘোড়া বাঁধা। ফ্রান্সিস গলা চেপে বলল— কাপাক দেখেছেন তো?

—হ্যাঁ। কিন্তু ঘোড়াগুলোর গায়ে গলায় কোন সাজ পরানো নেই।

—কিন্তু একটা লাগাম পরানো আছে। বসার আসন টাসনের কথা এখন ভাববেন না। চলুন।

ফ্রান্সিসরা ঘোড়াগুলোর কাছে এল। শেষ বিকেলের আলো আছে। সবই দেখা যাচ্ছে।

কাপাক বলল—আগে আপনারা দুজন যান। আমরা পরে উঠব।

—বেশ। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বিস্কোকে সঙ্গে নিয়ে একটা ঘোড়ার কাছে এল। দেখল ঘোড়াগুলোর গলায় লাগাম মত পরানো দড়ি। ঐ দড়ি গাছের সঙ্গে বাঁধা। ফ্রান্সিস বলল—বিস্কো গাছে বাঁধা দড়ি কাটো। বিস্কো বলল— কাপাক আপনাদের ঘোড়ার দড়ি কেটে দিলাম। আপনারা উঠুন। কাপাক লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ল। ঈগরও এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে পেছন দিকে কাপাকের পেট জড়িয়ে ধরল।

ফ্রান্সিস আর কাপাক ঘোড়া চালাতে লাগল। বসার আসন নেই, পা দানি নেই। এভাবেই ফ্রান্সিসরা ঘোড়া চালাতে লাগল। মাঝে মাঝে ফ্রান্সিসদের ঘোড়া জোরে ছুটতে শুরু করে। বেশ করে ঘোড়া দুটোকে সামলাতে হচ্ছে। দুদিন পরে তৃতীয় দিন সন্ধ্যেবেলা ওরা মাজোর্কা পৌঁছল।

কিছুক্ষণ পরে কাপাক বলল—আমরা এসে গেছি রাজবাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। সদর দেউড়ির দুপাশে দুটো বিরাট মশাল জ্বলছে। দুটো থামের ওপর রয়েছে সেই মশাল দুটো। মোটা কাপড়ের পলতে। তেলে চুবিয়ে সেই মোটা পলতেতে আগুন জ্বালানো হয়। চারদিকে বেশ উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ লড়াইয়ের শব্দ। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—রাজবাড়ির সদর দেউড়ির কাছে লড়াই শুরু হয়েছে। মানুষের চিৎকার তরোয়ালে তরোয়ালে ঠোকাঠুকির শব্দ। শোনা গেল আহতদের গোঙানি। কান্না। ফ্রান্সিস বলল— কার সঙ্গে কার লড়াই চলছে আমরা তা বুঝতে পারছি না। যাদের মধ্যেই লড়াই হোক আমরা কোন দলে যাবো না। লড়াই থামা পর্যন্ত চলো। বাঁ দিকে ঐ বড় ঝোপটার দিকে। ওখানেই আশ্রয় নেব আমরা।

ফ্রান্সিসরা বড় ঝোপটায় ঢুকল। ঝোপের মধ্যে তেমন চাঁদের আলো পড়েনি। ওর মধ্যেই কিছুটা ঝোপ জঙ্গল পরেই দেখা গেল কিছুটা খোলা জায়গা। ফ্রান্সিস বলল—আমরা এখানে থেকে লড়াইর শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। তারপর লড়াই শেষে রাজবাড়ি যাবো।

—কাদের সঙ্গে কাদের যুদ্ধ একেবারেই বোঝা গেল না। যা হোক দেখা যাক। বিস্কো বলল।

ফ্রান্সিসরা ঐ খোলা জায়গাটুকুতে বসল। চাঁদের আলো অনুজ্জ্বল। ফ্রান্সিস ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। তখন আকাশে চাঁদ আর সাদা মেঘের খেলা চলেছে। চাঁদ সাদা মেঘে চাপা পড়েছে। মেঘ সরে যেতেই আবার চাঁদ ।

ওদিকে রাজবাড়ির দিকে শোনা গেল সমবেত ধ্বনি—পাচাকুটি—দীর্ঘজীবী হোন। এবার কাপাক বলল—দাদা আবার এই মাজোর্কা জয় করল। আমি জয়

করেছিলাম। বেশ কিছু সৈন্য পালিয়ে গিয়েছিল। হয়তো ওরাই দাদার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছে। দাদার নামে জয়ধ্বনি উঠছে। দাদার সাম্রাজ্য আরো কিছুটা বাড়ল। কতজনের প্রাণ গেল কে জানে। একটু থেমে বলল—এখনকার সেনাপতি অত্যন্ত নির্মম, নিষ্ঠুর। নির্বিচারে নরহত্যা ওর কাছে খুব মজার খেলা। সে অন্য পক্ষের সৈন্যদের বন্দী করে না হত্যা করে। এতেই তার আনন্দ।

সৈন্যদের হৈ হল্লা শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে হৈ হল্লা বন্ধ হল।

ওদিকে সেনাপতি দুজন রক্ষী নিয়ে রাজবাড়ির দরজার কাছে এল। দেখল দরজা খোলা। ধারে কাছে কেউ নেই। সেনাপতি হো হো করে হেসে উঠল। রক্ষীদের বলল—সব পালিয়েছে। চল। প্রথম মন্ত্রণা কক্ষটায় এল। একটা গোল ওক কাঠের টেবিল। চারপাশে বাঁকা পায়াওয়ালা চেয়ার। একপাশের পাথরের দেওয়ালে একটা মশাল জ্বলছে।

ভেতরের ঘরের দরজা খুলে একটি পরিচারিকা বেরিয়ে এল। বলল— আপনারা কি রাজামশাইর কাছে যাবেন?

—হ্যাঁ। সেনাপতি বলল।

—তাহলে এই ঘরে আসুন পরিচারিকা চলল।

সেনাপতিরা পরিচারিকার পিছু পিছু পরের ঘরটায় এল। দেখল বিছানায় রাজা কুয়েক হুয়া শুয়ে আছেন। রাজা অসুস্থ এটা ওরা শুনেছিল। রাজার মাথার কাছে রাণী বসে আছেন।

রাজা একটু ওঠার চেষ্টা করলেন। রাণী রাজার পিঠে হাত দিয়ে তুললেন। ঘাড়ে পিঠে মোটা বালিশ রাখলেন। রাজা স্বস্তি পেলেন। রাজা বললেন—আসুন। আপনার পরিচয়টা জানলে—সেনাপতি রাজাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—আমি রাজা পাচাকুচির সেনাপতি। আপনি অসুস্থ এটা আমরা শুনেছি। তবে এতটা অসুস্থ বুঝতে পারিনি।

আপনাদের তো তেমন কোন লড়াই করতে হয়নি। আমার সৈন্যরা এই আকস্মিক আক্রমণে বোধহয় দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। তাই পালিয়েছিল। রাজা বললেন।

—না। ওরা সহজে হার স্বীকার করে নি। শেষ শক্তিটুকু দিয়ে লড়েছে। যথার্থ বীর ওরা। অনেকেই পরাজয় সহ্য করতে না পেরে পেটে তরোয়াল ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সেনাপতি বলল।

—কেন এসব করতে গেল? রাজা বললেন।

—আপনাকে ওরা দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। আপনার জয় হল না। এই পরাজয় ওরা মেনে নিতে পারে নি। সেনাপতি বলল।

—হয়তো তাই। রাজা দুর্বলকণ্ঠে বললেন।

সেনাপতি সঙ্গের এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিকে দেখাল।

রাজা একটু মাথা নামালেন। নতুন রাজাও মাথা একটু নুইয়ে ভদ্রতা দেখাল।

—এখন মাজোর্কার রাজা আর আপনি নন—ইনি—হুয়ার্কই এখন রাজসিংহাসনে বসবেন। সেনাপতি বলল।

—খুব ভালো কথা। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রজারা খুবই চিন্তায় পড়ল। আমিও রাজকার্য ঠিকভাবে চালাতে পারছিলাম না। আমিও একজন নতুন সুস্থ রাজা চাইছিলাম। এখন আপনারা নিজেরাই যখন আমাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চাইছেন তখন আমি খুশিই হয়েছি। প্রজারা একজন নতুন রাজা পাবে। সত্যি বলতে কি—এভাবে রাজা হয়ে থেকে প্রজা সাধারণের কোন উপকারই করতে পারবো না। রাজা বললেন।

—এখন আপনাদের তো রাজবাড়ি ছাড়তে হবে। সেনাপতি বলল।

রাণী বলে উঠলেন—তাহলে আমরা কোথায় থাকবো?

—আপনারা কি এই মাজোর্কাতেই থাকতে চান? সেনাপতি জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। আমরা মাজোর্কা ছেড়ে অন্য কোথাও থাকবো না। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে। সেই ব্যবস্থাই হবে। তবে আপনারা রাজার ব্যবহৃত রাজদণ্ড পতাকা পোশাক টোশাক নিয়ে যেতে পারবেন না। ওসব নতুন রাজাকে দেওয়া হবে। সেনাপতি বেশ গম্ভীর গলায় বলল। রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বেশ ক্লান্তস্বরে বললেন—আমি ওসব কিছুই নেব না। তবে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আপনাকে বলছি। একটু থেমে বললেন—আমি পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে একটা গয়নার বাক্স পেয়েছিলাম। ওটার মধ্যে একটা নকশা পেয়েছিলাম। ওটা আমার রাজবৈদ্যকে দেখিয়েছিলাম। উনি নকশাটা নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। দেখে টেখে ফেরত দিলেন। উনিও বললেন—এই নকশা বোঝা অসম্ভব।

—ঐ নক্‌শা এখন কোথায়? সেনাপতি বলল।

—দুজন ভাইকিং আমার বাড়িতে এসেছিল। নক্সাটা তাদেরই দিয়েছি।

সেনাপতি একটু গলা চড়িয়ে বলল—কেন আপনি ওদের নক্সা দিলেন?

—যোগাযোগের ব্যাপার। আমি পরিচিত অপরিচিত সবাইকেই এই নকশার কথা বলে থাকি। এই ভাইকিংদেরও বলেছিলাম। ওরা বেশ আগ্রহের সঙ্গে নক্সাটা নিয়েছিল। বলেছিল কয়েকদিন ভালো করে দেখে ফেরৎ দেবে। রাজা বললেন।

—নক্সা দেবার আর লোক পেলেন না? ওরা নকশা নিয়ে এতক্ষণে ওদের জাহাজে চেপে অনেক দূরে চলে গেছে। সেনাপতি বলল।

—না-না। নিশ্চয়ই ফেরৎ দেবে। এই নক্সার রহস্য কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। রাজা বললেন।

—যাক গে। নাও যদি বলে যায় তাহলে এই মাজোর্কায় থেকে নক্সার গুপ্তধন খোঁজাখুঁজি করবে। পেলে আর এক মুহূর্তও এখানে থাকবে না। সেনাপতি বলল।

—দেখা যাক। রাজা বললেন।

—নক্সাটায় কি গুপ্তধন কোথায় রাখা হয়েছে তার নির্দেশ আছে? সেনাপতি জানতে চাইল।

—না। তেমনভাবে তেমন কিছু তো সূত্র নেই।—রাজা বললেন।

সেনাপতি একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর চারদিক দেখে নিয়ে বলল—এই ঘরে তো চারটে ফুলদানি আছে। ফুল রাখা আছে। মনে হয় পাথরের।

—হ্যাঁ কালো পাথরের। ও পাশে আরও দুটো ঘর আছে। একটায় ছেলেমেয়েকে নিয়ে রাণী থাকেন। অন্য ঘরটা বন্ধই থাকে। অতিথি আত্মীয়রা এলে থাকেন। রাজা বললেন।

—সব ঘরেই ফুলদানি আছে? সেনাপতি জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। সর্বমোট বারোটা ফুলদানি আছে।

সেনাপতি একটু ভাবল। তারপর বলল—সহজে এই ধাঁধা বোঝা যাবে না। পরে ভাবব।

সেনাপতি নতুন রাজা হুয়ার্কের দিকে তাকাল। বলল—মাননীয় রাজা, চলুন।

সবাই রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। চলল নিজেদের আস্তানায়। সেনাপতির সৈন্যরা এর মধ্যেই রাজা কুয়েক হুয়ার সৈন্যদের তাড়িয়ে দিয়ে ওদের থাকার ঘরগুলোর দখল নিয়েছে। হৈ-হুল্লোড় চলছে। যুদ্ধে জেতার আনন্দ।

ওদিকে সন্ধ্যে হল। ফ্রান্সিসদের চিন্তা হল রাতের খাবারের কী হবে। ফ্রান্সিস কাপাককে বলল সে কথা। কাপাক বলল—সৈন্যবাহিনীতে যে আমার রক্ষী ছিল তার মারফৎ খাবার জোগাড় করতে পারব।

একটু রাত হতে ফ্রান্সিস বলল—কাপাক আমি রাজা কুয়েক হুয়ার কাছে যাচ্ছি। নক্সাটার অর্থ বুঝতে রাজার মতামত জানা খুবই প্রয়োজন। আমি কথা বলে রাজার কাছ থেকে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারি।

কাপাক বলল—দেখুন যুদ্ধ শেষ হয়েছে। সেনাপতি এখনও দু'একদিন সাধারণ মানুষদের চলাফেরায় সাবধান করা হবে। এইসব কড়াকড়ির মধ্যে আপনি গ্রেপ্তার হতে পারেন।

—তাহলে আজ নয়। কাল রাতে যাবো। কালকের মধ্যে সেনাপতি অনেক সৈন্য কুজকো পাঠিয়ে দেবে। লড়াই তো শেষ। ফ্রান্সিস বলল। রাতটা ফ্রান্সিসরা প্রায় উপবাস করে রইল। ফ্রান্সিসের আনা একটা রুটি পাতায় করে খেল। ভোর হল। একটু বেলা হতে ফ্রান্সিস বলল—কাপাক একবার চেষ্টা করে দেখি রাজবাড়ির রাঁধুনির কাছ থেকে খাবার জোগাড় করতে পারি কি না।

ফ্রান্সিস ঝোপজঙ্গল থেকে বেরুলো। পেছন দিক দিয়ে রাজবাড়িতে ঢুকল। একেবারে রসুইঘরে চলে এল।

রাঁধুনি অবাক। বলল—আপনি কে?

—আমি বিদেশী। ভীষণ খিদে পেয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঐ কোণায় বসে খেয়ে যান। রাঁধুনী বলল।

—আমার আরো তিনজন বন্ধু রয়েছে। ওরা না খেলে আমি খাই কী করে।

—তাহলে ঐ তিনজনকেও নিয়ে আসুন। খেয়ে যান। রাঁধুনী বলল।

ফ্রান্সিস বলে উঠল অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। বন্ধুদের আনতে যাচ্ছি।

ফ্রান্সিস ফিরে এল। কাপাকদের বলল সব কথা। কাপাক বলল—এইটা একটা ভাল কাজ করেছেন। বলতে গেলে খাওয়ার সমস্যা মিটল।

সবাই ঝোপজঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। রাজবাড়ির দেয়ালের আড়াল দিয়ে তারা এল। রসুইঘরে ঢুকল। একপাশে কাঠের তক্তায় বসল। কাজের লোকটি ওদের সামনে খাবার দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস বলল—ভদ্রতা দেখাবেন না। প্রাণের আনন্দে খেয়ে যান। কাপাক সবচেয়ে বেশি খেল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—আপনার কাছে আমরা ছেলেমানুষ। কাপাকও হেসে খেতে লাগল।

—প্রাণে যতটা চায় খেয়ে যাও। এটাই আমার কথা। যাহোক—এবার জঙ্গলে চলো।

চারজনে ঝোপজঙ্গলের সেই জায়গাটায় ফিরে এল।

দিন কাটল। রাত হল। ফ্রান্সিস বলল—কাপাক—আমি রাজার কাছে যাচ্ছি। কতকগুলো তথ্য রাজার কাছ থেকে পাবো কিনা দেখি।

—হুঁ। কিন্তু সাবধানে যাবেন। রাজার বাড়ির সদর দেউড়িতে প্রাসাদরক্ষীরা থাকতে পারে। কাপাক বলল।

—সেটা ভেবেছি। ভাবছি ঈগরের পোশাকটা পরে যাই। বিদেশী পোশাক পড়লে বিপদ হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তো। জামা খুলতে খুলতে ঈগর বলল। ফ্রান্সিসও জামাকাপড় খুলল। দুজনেই পোশক পাল্টালো।

ফ্রান্সিস চলল রাজবাড়ির দিকে। আকাশে ভাঙা চাঁদ। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। তবে চারপাশ মোটামুটি দেখা যাচ্ছে।

রাজবাড়ির সামনে এল ফ্রান্সিস। সদর দেউড়িতে দেখল মাত্র দুজন প্রহরী। একজন বর্শা হাতে পাথর বাঁধানো জায়গায় বসে আছে। অন্যজন এদিক ওদিক ঘুরছে।

ফ্রান্সিস ওদের সামনে গেল। একজন এগিয়ে এল।

—কোথায় যাবেন?

—রাজামশাইর সঙ্গে কথা বলতে। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজামশাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। দ্বাররক্ষী বলল।

—না। রাজামশাই একটু বেশি রাতেই ঘুমান। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনি সেটা জানেন? রক্ষী বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করে বলল।

—আপনি কোথা থেকে আসছেন? বসে থাকা প্রহরী বলল।

—কুজকো থেকে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে যান। এখন তো উনি আর রাজা নন। দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরী বলল।

—আমার কাছে উনি এখনও রাজা। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনি যেমন বোঝেন। যান। বসে থাকা দ্বাররক্ষী বলল।

বাইরের মন্ত্রণাকক্ষ পার হয়ে ফ্রান্সিস রাজার শয়নকক্ষে ঢুকল। দেখল রাজা বিছানায় শুয়ে আছেন। মাথার কাছে রাণী বসে আছেন।

ফ্রান্সিসকে দেখে রাজা ম্লান হাসলেন।

—এখন কেমন আছেন? রাণীর দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল।

—একই রকম। কখনও কষ্ট কমছে কখনও বাড়ছে। রাণী বললেন।

এবার ফ্রান্সিস রাজাকে বলল—আপনি কাপাককে যে নকশাটা দিয়েছেন সেটা আমি দেখেছি। নকশার পেছনে দুটো পংক্তি লেখা আছে। আমি পড়তে পারি নি। লেখাটা কী যদি বলেন।

—প্রাচীন স্পেনীয় ভাষায় লেখা—হোক না কালো পাথর
ফুলদানি বড় সুন্দর।
সবচেয়ে ভালো সাদা পাথরের ফুলদানি।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল। মাথা তুলে বলল—এখানে তো তিনটে ঘর। তিনটে ঘরেই কি পাথরের ফুলদানি রাখা আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। রাজা বললেন।

—ফ্রান্সিস বলল—তাহলে তিনটে ঘরে সব মিলিয়ে বারোটা ফুলদানি আছে। একটা কথা—একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—কাপাক ছাড়া আর কাউকে আপনার নকশা দেখতে দিয়েছিলেন?

—একজন কবিরাজকে। তিনি আমার চিকিৎসা করতেন। রাজা বললেন।

—করতেন বলছেন। এখন কি আপনাকে চিকিৎসা করেন না? ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল—

—নকশাটা কি উনি ফেরৎ দিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—না। রাজা মাথা নেড়ে বললেন।

—এখন যে নকশাটা আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—নকল করে রেখেছি। রাজা বললেন।

—কবিরাজ মশাই নকশা নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেলেন।

—আপনি তাঁর খোঁজখবর করেছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু তাঁর কোনরকম হদিশই পাই নি। রাজা বললেন।

—উনি কোথায় থাকতেন? ফ্রান্সিস বলল।

—কুজকো। ঘোড়ায় চড়ে আসতেন। রাজা বললেন।

—বয়েস কম? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। মধ্যবয়স্ক। আপনি এত কথা জানতে চাইছেন কেন? রাজা বললেন।

—এসবের সঙ্গে আপনার পিতামহের রাখা গুপ্তধনের হদিশ বের করব। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবেন? রাজা বললেন।

—সেই জন্যেই তো আপনার কাছ থেকে সব জানতে চাইছি। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখুন চেষ্টা করে। রাজা বললেন।

তখনই একজন পাচাকুচির সৈন্য ঘরে ঢুকল। বলল—মাননীয় রাজা— সেনাপতি এসেছেন। রাজা বললেন—নিয়ে এসো।

রাজা ভালোভাবে উঠে বসলেন। রাণী রাজার কাঁধ ধরে রইলেন। সেনাপতি ঢুকল। সেই দাম্ভিক ভঙ্গী। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে দরজার দিকে যাচ্ছিল। সেনাপতির নজরে পড়ল। বলল—

—তুমি এদেশীয় পোশাক পরেছো। কিছু চুরির ধান্ধা। সেনাপতি বলল।

—আমরা চোর নই। ফ্রান্সিস বলল।

—না। মহাপুরুষ। সঙ্গের দুজন সৈন্যকে বলল—এই ধর তো বিদেশী ভূতটাকে। সেনাপতি বলল।

সৈন্য দুজন ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে প্রথম সৈন্যটির চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুঁষি মারল। সৈন্যটি উল্টে গিয়ে মেঝেয় পড়ল। অন্যটিকে পায়ে পা ঠেকিয়ে জোরে পা ঘোরাল। সৈন্যটিও মেঝের ওপর চিৎ হয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস দ্রুত বাইরের ঘরে এল। তারপর মন্ত্রণাকক্ষটি পার হয়ে সদর দেউড়িতে এল। সঙ্গে দেউড়ির আলোর বাইরে ছুটে এল। প্রহরী দু'জন চিৎকার করে উঠল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস অন্ধকারে মিশে গেছে।

ফ্রান্সিস রাজবাড়ির তিনটে ঘর ভালো করে দেখতে চেয়েছিল। সেটা আর হলো না।

ফ্রান্সিস নদীর ধারে এল। জোর হাওয়া ছুটেছে। ফ্রান্সিসের ঘামে ভেজা গা জুড়োল।

হঠাৎ একটা খেজুর গাছের পেছন থেকে চারপাঁচজন বুনো মানুষ ছুটে এসে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস এই আক্রমণের জন্যে তৈরি ছিল না। নিজেকে সামলাতে পারল না। মাটিতে পড়ে গেল। বুনোরা সবাই মিলে ফ্রান্সিসকে শক্ত হাতে চেপে রইল। নদীর ঢালে নিয়ে এল। ফ্রান্সিসকে ঢাল দিয়ে নামিয়ে নৌকোয় বসিয়ে দিল। বৈঠা দিয়ে একজন নৌকো চালাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওপারে পৌঁছল। ফ্রান্সিস বার তিনেক জিজ্ঞেস করল—আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? কেউ কোন কথা বলল না।

নৌকো থেকে নেমে বুনোরা ফ্রান্সিসকে নিয়ে চলল। এতক্ষণ তবু নিস্তেজ জ্যোৎস্নায় কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিল। এখন বনের মধ্যে ঢুকে চারদিক অন্ধকার।

কিছুক্ষণ পরে বুনোরা ফ্রান্সিসকে ওদের বসতি এলাকায় নিয়ে এল। একটা বেশ বড় উঠোনের মত। চারপাশে বাড়ি ঘর। কেউ কেউ ঘর থেকে মুখ বের করে ফ্রান্সিসকে দেখল।

ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলল—আবার কয়েদঘর। আবার বন্দীদশা।

কিন্তু আশ্চর্য। ফ্রান্সিসকে ওরা একটা গাছের ডালে তৈরি ঘরে নিয়ে এল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। ঘরে একটা তেলের আলো জ্বলছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একজন প্রহরী। হাতে বর্শা।

কিছুক্ষণ পরে দ্বাররক্ষী গলা চড়িয়ে বলল—রাজা আসছেন। তাঁকে সম্মান জানাও।

রাজা ঢুকল। বেশ দশাসই চেহারা। মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকতে হল। মাথায় লাল মোটা কাপড়ের ফেট্টি। তাতে বিচিত্র রঙের পাখির পালক গোঁজা। গলায় লালরঙের পাথরের মালা। মাথায় বড় বড় চুল। বেণীর মত বাঁধা।

দ্বাররক্ষী মাথা একটু নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানাল। রাজা বলল—আমাদের পুরোহিত আমাদের জানিয়েছে যে বর্তমান রাজা অর্থাৎ আমি আর রাজা থাকতে পারব না। নতুন রাজা আসবে দক্ষিণ দিক থেকে। তার গায়ের রঙ হবে সাদা। লম্বা লম্বা চুল। পরনে থাকবে বিদেশী পোশাক। তরোয়াল চালাতে অত্যন্ত দক্ষ। রাজা থামলেন।

—কিন্তু আমি রাজা হব কী করে? ফ্রান্সিস বলল।

—আমরাই আপনাকে রাজা করব। রাজা বলল।

—কিন্তু আমি তো রাজা হতে চাই না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আপনাকে বন্দী করা হবে। থাকতে দেওয়া হবে কয়েদখানায়। ফ্রাসিস কিছু বলল না। চুপ করে রইল। বুঝল এই বুনোদের হাত থেকে মুক্তি নেই। ওরা ওকে নিয়ে যা খুশি করুক। ও আপত্তি করবে না। পাথরকুচি দিয়ে মেঝে তৈরি হয়েছে। তার ওপর বিছানা। বেশ পুরু বিছানা। এক বিশেষ নরম ঘাসে তৈরি।

ফ্রান্সিস বিছানায় বসল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। রাজা চলে গেল। রাজার সঙ্গে যারা এসেছিল তারাও চলে গেল।

কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। বিছানায় শুয়ে পড়ল। মারিয়া আর বন্ধুদের কথা মনে এল। এখানে এইভাবে রাজা হয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ঠিক করল বুনোরা যা করতে বলবে তাই ও করবে। বুনোদের চটাবে না। ওদের কথামতো না চললে ওর মৃত্যু হতে পারে। কাজেই বুনোরা যা করছে করুক ও সবই মেনে নেবে।

রাত বাড়ল। দরজা খোলা হল। তিনচারজন বুনো মানুষ ঘরে ঢুকল। মেঝের একপাশে আসন পাতল। কোন গাছের পাতা বড় গোল পাতা পাতল। জলভরা কাঠের গ্লাশ রাখল। তেলের আলোটা বসবার জায়গার কাছে রাখল। একজন বুনো সৈন্য ফ্রান্সিসকে খাবারের জায়গায় এসে বসতে ইঙ্গিত করল।

ফ্রান্সিস উঠল। খেতে বসল। গোল রুটি, পাখির মাংস, তারপর ঝোলের মত কিছু। ফ্রান্সিস খেতে লাগল। মাংসটাই সবচেয়ে ভালো লাগছিল। ওটাই দুবার চেয়ে খেল।

খাওয়া শেষ। ফ্রান্সিস বিছানায় ফিরে এল। অনেক চিন্তা মাথায়। সেসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরে ঘুম ভাঙ্গল পাখির ডাকে। এখানে এত পাখি? ফ্রান্সিস হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় এসে বসল। দুজন রক্ষী খাবার নিয়ে এল। কাঠের থালায় পোড়া রুটি কয়েকটা। একটা বাঁশের ছোট চোঙে কী এক তরল জিনিস।

খিদেও পেয়েছে বেশ। ফ্রান্সিস বেশ দ্রুতই খেতে লাগল। খাওয়া শেষ।

রক্ষীরা চলে গেল। দুপুরে মাংসের সঙ্গে রুটি। আরো কিছু লতাপাতা দিয়ে রান্না করা খাবার। সেসবও খেল।

সন্ধেয় ফ্রান্সিসকে এনে উঠোনের একপাশে বসান হল। সিংহাসন ফাঁকা। বুনোরা ঢোলের মত একটা বাদ্যযন্ত্র এনে বাজাতে শুরু করল। উঠোনে স্ত্রীপুরুষ নাচতে নাচতে এল। সেইসঙ্গে তীক্ষ্মস্বরে গান।

নাচগান চলছে তখন আগের রাজা এল। একপাশে বসল। নাচগান কিছুক্ষণ চলল। তারপর নাচিয়েরা চলে গেল।

এবার আগের রাজা উঠে দাঁড়াল। গলায় বেশ জোর দিয়ে বলতে লাগল—আমাদের রাজপুরোহিত স্বপ্নের মধ্যে দেখেছে এক যুবক দক্ষিণ দিক থেকে এসেছে। সেই যুবকের রাজা হবার সমস্ত লক্ষণই পুরোহিত দেখেছে। সেই যুবকই হবে আমাদের রাজা। সব লক্ষণ মিলে গেছে।

এই পর্যন্ত বলে রাজা ফ্রান্সিসের দিকে হাত বাড়াল।

ফ্রান্সিস আগের রাজার হাত ধরল। আগের রাজা বলল—উঠে আসুন। ফ্রান্সিস এগিয়ে গেল। পুরোহিতের নির্দেশমত আমরা এই যুবককেই রাজা বলে মেনে নিলাম। বুনোরা হৈ হৈ করে উঠল। হাতের বর্শা ওঠানামা করতে লাগল। আগের রাজা বলতে লাগল—প্রজা সাধারণ—এই নতুন রাজাকে তোমরা মেনে নেবে। এই বলে আগের রাজা ফ্রান্সিসকে আস্তে ধরে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। আবার ধ্বনি উঠল—নতুন রাজা—বেঁচে থাকুন। বেশ হৈ চৈ চলল। আগের রাজা দুহাত ওপরে ওঠালো। গণ্ডগোল থেমে গেল।

পুরোহিত এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসের সামনে এসে কীসব বিড়বিড় করে বলতে লাগল। তারপর ফ্রান্সিসের মাথায় ফুল রাখল। হাত সরিয়ে নিতে ফুলগুলো পড়ে গেল। আরো কিছুক্ষণ পরে পুরোহিত মন্ত্র পড়তে পড়তে কী যেন বলল। ফ্রান্সিসের অস্বস্তি লাগছিল। চুপ করে বসে থাকতেও পারছে না আবার কিছু বলতেও পারছে না। সিংহাসন থেকে উঠে যেতেও পারছে না।

ফ্রান্সিসের কাছে এসে পুরোহিত গলা নামিয়ে বলতে লাগল, আগের রাজা কিছুতেই ক্ষমতা ছাড়ছিলেন না। মন্ত্রী অমাত্যরা আমাকে দায়িত্ব দিলেন নতুন রাজা খুঁজে বের করুন। আমি আমাদের দেবতা আরুজুবার কাছে জানতে চেয়েছিলাম নতুন রাজাকে কীভাবে পাব। আমাদের দেবতা আরুজুবা বললেন— তোর কাছে পুজোর জন্যে যে পবিত্র জল আছে তাতে নতুন রাজার ছবি ফুটে উঠবে। আমি পবিত্র জলে আপনার ছবি দেখলাম। সৈন্যদের হুকুম দিলাম আপনাকে ধরে আনতে।

—কিন্তু আমি রাজা হব না। ফ্রান্সিস বলল।

—পারবেন না পালিয়ে যেতে। রাজা হয়েই আপনাকে এখানে থাকতে হবে। পুরোহিত বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

পুরোহিত চলে গেল। সমবেত জনতার মধ্যে মাঝে মাঝেই ধ্বনি উঠল— নতুন রাজা—দীর্ঘজীবী হোন। ভিড় কমতে লাগল। সেনাপতি এসে বলল— মাননীয় রাজা—চলুন বিশ্রাম করবেন।

ফ্রান্সিস সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াল। মন্ত্রী ও সেনাপতিও উঠল। ফ্রান্সিস চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। উপায় ভাবতে লাগল কেমন করে পালানো যায়। বুনোরা নতুন রাজার জয়ধ্বনি করল। একজন যোদ্ধা সামনে আর একজন পেছনে। প্রহরী দু'জন ফ্রান্সিসকে রাজগৃহে নিয়ে এল।

ফ্রান্সিসের জন্যে কিছু পরে প্রহরী দুজন খাবার নিয়ে এল। বেশ খিদে পেয়েছে। অন্যসময় হলে ও হাপুসহুপুস খেতো। কিন্তু এখন রাজা। এখন রাজার মতো আচরণ করতে হবে। এখন সবাই তার আচরণ ব্যবহার এসব দেখবে। কাজেই এখন যা খুশি তা করা চলবে না।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে খেতে লাগল। একজন প্রহরীকে হাতের ইশারায় ডাকল। প্রহরীটি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—

—তোমার নাম কি? প্রহরীটি খুব খুশি। রাজাকে সম্মান দিয়ে একটু মাথা নিচু করল। তারপর বলল—বেচুয়া।

—হুঁ। তুমি কি সারারাত আমাকে পাহারা দাও? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আমি একা নই। সঙ্গে আর একজন থাকে। বেচুয়া বলল।

—এত পাহারার কি দরকার? ফ্রান্সিস বলল।

—মাননীয় রাজা—আপনার জানার কথা নয়। উত্তরে পাহাড়ী এলাকায় একটা দেশ আছে। ওখানে কালো পাহাড়ীদের দেশ। ওরা মাঝে মাঝেই আমাদের আক্রমণ করে। আমাদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। পালিয়ে যায়। কিন্তু এরকম আক্রমণ বন্ধ রাখে না। ওদের লক্ষ্য শুধু আমাদের রাজাকে হত্যা করা। তাই আপনাকে সবসময় পাহারাদাররা পাহারা দিয়ে রাখে। বেচুয়া বলল।

—হুঁ। দেখছি। এত পাহারা দিয়ে আমাকে আটকেই রাখা হয়। এই পাহারার ব্যবস্থা করেছেন কারা? ফ্রান্সিস বলল।

—মন্ত্রীমশাই, সেনাপতি আর অমাত্যরা। বেচুয়া বলল।

—ঠিক আছে। কিন্তু আমি এত পাহারা টাহারা পছন্দ করি না। সবসময় মনে হয় আমি যেন বন্দী হয়ে আছি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের যেমন হুকুম। আপনি মন্ত্রীমশাইকে বলে দেখুন। বেচুয়া বলল।

—তুমি বললে কালো পাহাড়ী। ওরা কারা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—ঐ কালো পাহাড়ীদের গায়ের রং কালো। উত্তরে যে পাহাড়টা মাচিপিচুলাম ওখানেই ওদের রাজত্ব। ওদের গায়ের রং কালো। তাই আমরা কালোপাহাড়ী বলি। বেচুয়া বলল।

—ওরা বুঝি মাঝে মাঝেই আক্রমণ করে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। উদ্দেশ্য তো বললাম—আমাদের রাজাকে মেরে ফেলা। বেচুয়া বলল।

—তাতে ওদের কি লাভ? ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা তাহলে আমাদের মধ্যে মারামারি করব। এই দেশে অশান্তির আগুন জ্বলবে। আমরা দুর্বল হয়ে পড়বো।

তখন ওরা সহজেই এই রাজ্যজয় করতে পারবে। এই দেখুন না—আমাদের আগের রাজা কী বলশালী। তাকেও ওরা বন্দী করেছিল। ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমরাও ওদের চেয়ে দ্রুতবেগে ছুটে গিয়ে রাজাকে উদ্ধার করেছিলাম। রাজা সুস্থ হলেন কিন্তু বাঁহাতটা শুকিয়ে গেল। ওরা রাজার বামবাহুতে বড় ছোরা বসিয়েছিল। আস্তে আস্তে ঐ জায়গাটা দুর্বল হয়ে পড়ল। সেই রাজার বাঁ হাত অকেজো হয়ে গেল। কে জানে ছোরার মুখে বিষাক্ত কিছু মেশানো হয়েছিল কিনা? বেচুয়া বলল।

পরের দিন রাতে ফ্রান্সিস খেয়ে শুয়ে পড়ল। মাংসটা কোন পাখির অথবা জীবজন্তুর এটা বুঝতে পারল না। কিন্তু খুব সুস্বাদু লাগল। ফ্রান্সিস চেয়ে খেলো।

শুয়ে শুয়ে একটা চিন্তাই ওকে বড় বিচলিত করছিল। জাহাজে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। উপায়ও নেই। সবসময়ই কাছে কাছে কোন না কোন প্রহরী।

ফ্রান্সিস এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ গভীর রাতে বুনোদের চিৎকার হৈ হল্লা। ফ্রান্সিস শুয়ে থেকে বুঝতে পারল—লড়াই শুরু হয়েছে। বুনোদের পায়ের শব্দ শুনে বুঝল—বুনোরা ছুটে যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস দেখল—ঘরের দরজায় দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না। ঘরের মশাল নেভানো হয়েছে। মন্ত্রীমশাই ছুটতে ছুটতে অন্ধকার ঘরে ঢুকলেন। অন্ধকারেই বললেন—মান্যবর রাজা—আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

—কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

—রক্ষী আপনাকে নিয়ে যাবে। আপনি কালকে পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন। লড়াই থেমে গেলে আপনাকে আবার এই ঘরে নিয়ে আসা হবে। মন্ত্রী ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

রক্ষী দুজন ঘরে ঢুকল। বেচুয়া বলল—মাননীয় রাজা—শিগগির তৈরি হন। আমাদের অন্য জায়গায় যেতে হবে।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—মশালটা জ্বালো। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বেচুয়া মশালটা জ্বালল। ফ্রান্সিস আজ পোশাক পাল্টাল না। রাজার পোশাক যা পরনে ছিল তাই পরে নিয়েই দরজার দিকে চলল। ফ্রান্সিসের পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুজন প্রহরীও। এবার বেচুয়া বলল—মাননীয় রাজা আপনি আমার পেছনে পেছনে আসুন। ফ্রান্সিস তাই চলল। কিছু দূরেই হৈ হৈ চিৎকার গোঙানি। জোর লড়াই চলছে।

বনের তলায় অন্ধকার। তবে গাছের পাতা ডালের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাভাঙা টুকরোর মত পড়েছে। তাতে অন্ধকার কাটে নি। অবশ্য মোটামুটি একটু আধটু দেখেটেখে পা ফেলে যাই।

ফ্রান্সিসের হঠাৎ মনে হল—এখন বাইরের পরিবেশ। যে কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে। তরোয়ালটা সঙ্গে থাকলে মনে অনেক জোর পাওয়া যায়। ফ্রান্সিস ডাকল—বেচুয়া!

—বলুন।

—আমার তরোয়ালটা কোথায় রাখা হয়েছে? ফ্রান্সিস বলল।

—আপনার ঘরে। বেচুয়া বলল।

—তাহলে তরোয়ালটা নিয়ে এসো। এখন একেবারে নিরস্ত্র থাকা বিপজ্জনক। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। বেচুয়া চলে যাচ্ছে তখন প্রহরীটি বলল—কোথাও দাঁড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। আমরা যে গুহায় যাবো বেচুয়া তুমিও সেখানে চলে এস।

—ঠিক আছে। বেচুয়া চলে গেল। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল যেন।

ফ্রান্সিসরা চলল। প্রহরীটি পিছু পিছু চলল।

একটা টিলার সামনে এল ওরা। একজন প্রহরী এগিয়ে গেল। অল্প জ্যোৎস্নায় দেখা গেল একটা গুহার মুখ। মুখে বড় পাথর চাপা দেওয়া। প্রহরীটি বলল—এই পাথরটা সরাতে হবে। একা পারবো না। আপনি আসুন। একজন প্রহরী বলল।

এবার দুজনে গুহামুখের পাথরটা ধাক্কা দিতে লাগল। পাথরটা নড়ল। আরো বার কয়েক ধাক্কা দিতেই পাথরটা একপাশে সরে গেল। ঢোকার মত জায়গা হল। দুজনে গুহাটায় ঢুকল।

নীরন্ধ্র অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। প্রহরীটি বলল—আপনি আমার হাত ধরে আসুন। দুজন অন্ধকারে চলল। কিছুটা এসে প্রহরীটি বলল—এখানে বসুন। ফ্রান্সিস হাত দিয়ে দেখল একটা পাথরের পাটামত। ফ্রান্সিস বসল। প্রহরীটি বসল।

বেশ গরম লাগছে। আস্তে আস্তে গরমটা সহনীয় হল। এখন বেচুয়ার জন্যে অপেক্ষা।

দুজনেই চুপ করে বসে রইল। চোখে অন্ধকারটা সয়ে এল। ফ্রান্সিস অস্পষ্ট দেখল পাথরের লম্বা পাটাটায় বিছানা মত কাপড় পাতা। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। এখন চিন্তা হল বেচুয়ার জন্যে ও নির্বিঘ্নে আসতে পারবে কিনা।

কিছুক্ষণ পরে দূর থেকে বেচুয়ার ডাকই মনে হল। প্রহরীটি গুহার মুখের দিকে দ্রুত ছুটে গেল। ফ্রান্সিসও পেছনে পেছনে ছুটল। গুহার মুখে পাথরের আড়াল থেকে দুজনে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দেখল—বেচুয়া টলতে টলতে আসছে। ওর হাতে বর্শাটা নেই। হাতে একটা তরোয়াল। তখনই ফ্রান্সিসরা ভালো করে দেখল বেচুয়ার পিঠে একটা বর্শা বেঁধা। বেচুয়া আর বেশি দূর আসতে পারল না। উবু হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

প্রহরীটি ছুটে বেচুয়ার কাছে গেল। এক হ্যাঁচকা টানে বর্শাটা বের করল। রক্ত বেরোতে লাগল। ফ্রান্সিস দেখল বেচুয়ার ডান হাতে তরোয়ালটা ধরা। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে তরোয়ালটা তুলে নিল।

তখনই বন থেকে চার পাঁচজন যোদ্ধা বেরিয়ে এল। ওদের গায়ের রং কালো। ফ্রান্সিস বুঝল এরাই কালো পাহাড়ি। বুনোদের নতুন রাজাকে ধরতে এসেছে।

ওরা ফ্রান্সিসের গায়ে রাজার পোশাক দেখেই চিনল। উল্লাসে ওরা চিৎকার করে উঠল। ছুটে এল ফ্রান্সিসের সামনে। প্রথম যোদ্ধাটি ফ্রান্সিসের দিকে বর্শা ছুঁড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত সরে গেল। যোদ্ধাটির হাতে বর্শা নেই। ফ্রান্সিস লাফিয়ে সামনে গিয়ে

যোদ্ধাটির বুকে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল। যোদ্ধাটি চিৎ হয়ে পাথুরে মাটিতে পড়ে গেল। আর একজন বর্শা হাতে এগিয়ে এল। প্রহরীটি ফ্রান্সিসকে বলল—আপনি যাবেন না—আমি যাচ্ছি। প্রহরীটি একজন যোদ্ধাকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল। নিখুঁত নিশানা। বর্শাটা বুকে ঢুকে গেল। যোদ্ধাটি মাটিতে পড়ে গেল।

এবার ফ্রান্সিস তরোয়াল হাতে যোদ্ধাদের দিকে ছুটে এল। যোদ্ধারা পালাতে শুরু করল। সব যোদ্ধারা যখন বনে ঢুকে পড়ল তখন ফ্রান্সিস ফিরে এল। বেচুয়ার কাছে এসে প্রহরীটিকে বলল চলো। ওকে গুহায় নিয়ে যাবো। বিস্কো সব সময় ফ্রান্সিসের কাছাকাছি আছে।

দুজনে বেচুয়াকে ধরাধরি করে গুহার ভেতরে নিয়ে এল। পাথরের ওপর বিছানায় শুইয়ে দিল। প্রহরীটি রাখা জল নিয়ে এল। ফ্রান্সিস বেচুয়ার চোখেমুখে জল দিল। প্রহরীটি চকমকি পাথর ঠুকে মশাল জ্বালল। চারদিকে আলো ছড়ালো।

ফ্রান্সিস এতক্ষণে বুঝল—বেশ খিদে পেয়েছে। কিন্তু খাবার এখন কোথায় পাওয়া যাবে? বিস্কো এল। বলল—ফ্রান্সিস—একটু যে ঘুমিয়ে নেব তারও উপায় নেই। খালি পেটে ঘুমও আসছে না।

—উপায় নেই। এখন বাইরে লড়াই চলছে। বাইরে বেরোনো যাবে না। অপেক্ষা করতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লড়াই থেমে যাবে। তখন খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে ফ্রান্সিস বলল।

রাত শেষ। পাখির ডাক শোনা গেল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ বেচুয়ার গোঙানি শোনা গেল। ফ্রান্সিস উঠে গিয়ে বেচুয়ার পাশে বসল। বলল—বেচুয়া শরীর খারাপ লাগছে?

—হ্যাঁ। শরীর অসম্ভব দুর্বল লাগছে। মাথা ঘুরে ঘুরে উঠছে। কথাটা আস্তে আস্তে বলে বেচুয়া বলল—আমি—বোধহয় বাঁচবো না।

—এইসব আজেবাজে চিন্তাকে প্রশ্রয় দিও না। নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ভাববে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল—দেখি তো জ্বরটা কেমন? ফ্রান্সিস বেচুয়ার হাতে নাড়ি টিপে দেখল। গাল গলায় উত্তাপ দেখল। বেশ জ্বর এখন।

ফ্রান্সিস বলল—জ্বর আছে এখনও। তবে একটু ওষুধ টষুধ পড়লে তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। ততক্ষণে একটু জ্বর বাড়ল।

ফ্রান্সিস বলল—একটু কষ্ট সহ্য কর। বেচুয়া আর কথা বলল না। দু চোখ বুঁজে শুয়ে রইল।

এইবার খাদ্য চাই। ফ্রান্সিস কীভাবে খাদ্য জোগাড় করবে ভেবে পেল না। প্রহরী ফ্রান্সিসকে বলল সেকথা। প্রহরীটি বলল—একটু দূরে এক জমিদার থাকে। তাঁর বাড়ি থেকে খাবার চুরি করতে হবে।

—তার মানে আমাদের সারাদিনই না খেয়ে থাকতে হবে। একটাই বাঁচোয়া জলভরা পীপে আছে দুটো। সারাদিনই জল খেতে হবে। তাতে খিদেটা বেশ চাপা পড়ে যাবে। বিস্কো বলল।

দুপুরে প্রহরীটি বনজঙ্গল থেকে কিছু ফল নিয়ে এল। তাই ভাগ করে সবাই খেল।

সারা দিনটা গেল। সন্ধ্যে থেকেই বেচুয়ার গোঙানিটা শুরু হল। বোঝাই যাচ্ছে—বেচুয়া ভীষণ কষ্ট সহ্য করছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে। ফ্রান্সিস ভাবল যে বর্শায় বেচুয়া আহত হয়েছিল সেটার মাথায় বিষ মাখানো ছিল।

রাত বাড়তে লাগল। বেচুয়ার গোঙানি থেমে গেছে। বোধহয় আর গোঙানি করবার শক্তিও অবশিষ্ট নেই।

সকাল থেকে এই রাত পর্যন্ত ফ্রান্সিসরা শুধু জল খেয়ে । খাবার জোগাড় করতে বিস্কো আর প্রহরীটি একটু রাতে বেরুলো। নিচু দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকল। জ্যোৎস্না খুব উজ্জ্বল নয়। দেখেশুনে পা ফেলতে হচ্ছিল।

রসুই ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করা। অল্প আলোয় দেখল একটা তালা লাগানো। বিস্কোরা দেখল লোহার বড় তালা। বিস্কো বার কয়েক চেষ্টা করল খুলতে। কিন্তু পারল না।

বিস্কো বের করল ছোরার মুখটা তারপর তালার গর্তে ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দিতে লাগল। তারপর চাপ বাড়াল। শব্দ করে তালাটা ভেঙে গেল। একটু শব্দ হল।

ফ্রান্সিসরা চুপ করে দাঁড়িল রইল না। কারো ঘুম ভাঙে নি। ফ্রান্সিসরা রসুইঘরে ঢুকল। কাঠের ডেকচিতে রাখা ছিল মাংস। ফ্রান্সিস ডেকচিটা তুলে নিল। কেক রুটি সবই নিল দুজন।

দরজা ভেজিয়ে পাঁচিল টপকে বাইরে বেরিয়ে এল।

গুহায় ফিরে এল। বেচুয়া বাদে সবাই খাবার ভাগ করে নিয়ে খেতে লাগল। প্রায় দুদিন উপবাস। ফ্রান্সিস খাবারের দিকে চেয়ে রইল। খিদেটাই মারা গেছে। উপায় নেই। খাবার যেমনই লাগুক সব খাবার খেতে হবে। ফ্রান্সিস খেতে লাগল।

শেষ রাতের দিকে বেচুয়া সমস্ত শরীর মোচড়াতে লাগল। মুখে গোঁ গোঁ শব্দ করছে। সবাই বেচুয়ার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল।

হঠাৎ বেচুয়ার শরীর স্থির হয়ে গেল। বেচুয়া মারা গেল। ফ্রান্সিসের চোখে জল এল। ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এবার বেচুয়াকে কবর দেওয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সূর্য ওঠার আগেই কবর দিতে হবে। লড়াইয়ের ফলাফল কী তা ওরা এখনও জানে না। রাজা পাচাকুচি যদি জয়ী হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকা ছেড়ে পালাতে হবে। যদি রাজা কুয়েক হুয়ার জয় হয় তা হলে নিশ্চিন্ত। কবরে দিয়ে সবাই মাজোর্কার উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

বেচুয়ার শরীর এখানেই কোথাও কবর দিতে হবে।

বিস্কো আর প্রহরীটি জমিদার বাড়ির পেছনে এল। দেওয়াল। ওরা দুজনেই দেয়াল টপকে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। দুজনে রসুইঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল! দেখল তিনজন রাঁধুনি। এমন সময় বাড়ির কাজের স্ত্রীলোকটি ওখানে কাজে এল। বিস্কোদের দেখে গলা চড়িয়ে বলল—তোমরা কে গা? প্রহরীটি গলা চেপে বলল—তরোয়াল দিয়ে নাক কেটে দেবো। স্ত্রীলোকটি ‘ও মাগো’ বলে বড়ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

এবার বিস্কো গলার নিচে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করল। ছুটে গিয়ে এক রাঁধুনির গলায় গিয়ে ছোরা ঠেকাল। বলল—একটু হাত নাড়লেই তুমি ভবের পার। অন্য দুই রাঁধুনিও কী বলবে বলে কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। বিস্কো তিনজনকেই ছোরাটা দেখাল। তারপর বলল—আমরা ডাকাত না। অবস্থা বিপাকে আমরা দুদিন যাবৎ না খেয়ে আছি। কাল রাতে তোমাদের এই রসুইঘর থেকে খাবার চুরি করে নিয়ে গেছি। আজকেও নেবো। একটু থেমে বিস্কো বলল—রুটির থালা ভর্তি করে রুটি দাও কেক থাকলে দাও আর মাংসের হাঁড়িটা দাও। নইলে তোমাদের তিনজনের একজন মরবেই। এক্ষুনি।

রাঁধুনিরা নিজেদের বিপদ বুঝল। ওরা মাটির থালা মাংসের হাঁড়ি দিয়ে দিল।

বিস্কো চাপা সুরে বলল—পালাও। তারপর খাবার নিয়ে ছুটল পেছনের দেওয়ালের দিকে। দেয়ালটা পার হয়ে বাইরের বাগানে এল তারপর ছুটল বড় রাস্তার দিকে।

দুপুরে ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা খাওয়ার ব্যাপারে আর দেরি করল না।

এবার কবর দেওয়া। পেছনের একটা ঘরে ফ্রান্সিস এল। খুঁজে খুঁজে দুটো বেলচা পেল। দুটো কাঠের পাটাতন পেল। একটা বড় আর একটা ছোট। ও গলা চড়িয়ে ডাকল—বিস্কো, এদিকে এসো। বিস্কো এল। বলল কী ব্যাপার?

—এই লম্বা পাটাতনটায় বেচুয়াকে শুইয়ে দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

—উপায় কি। এখানে কফিন কোথায় পাবো। বিস্কো বলল।

—এখন কবরের জায়গা খোঁজা। চলো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে গুহার বাইরে এল। প্রহরীটিকে বলল—তুমি থাক। আমরা কবরের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।

দুজনে বেরিয়ে এল। দেখল সামনেই একটা উপত্যকার মত। সবুজ ঘাসে ঢাকা। ফ্রান্সিস বলল—বেচুয়াকে কবর দিতে বেশি দূর যেতে পারব না। কাজেই এই উপত্যকা নরম মাটির। এখানেই কবর দেব।

দুজনে গুহায় ফিরে এল। ফ্রান্সিস প্রহরীটিকে সব বলল। তারপর কাঠের পাটাতনে বেচুয়াকে শুইয়ে নিয়ে চলল কবরের জায়গায়। একপাশে মৃতদেহ রেখে বেলচা দিয়ে ফ্রান্সিস আর বিস্কো মাটি খুঁড়তে লাগল। একটা লম্বাটে গর্ত মত হল।

তখন ভোর হয়েছে। ফ্রান্সিসরা আর দেরি করল না। গর্তে কাঠের পাটাতনসহ বেচুয়ার মৃতদেহ নামিয়ে দিল। তারপর ওরা কবরে মাটি ফেলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্ত বুঁজে গেল মাটিতে।

সবাই গুহায় ফিরে এল। ফ্রান্সিস পাথরের ওপর কাপড়ের বিছানায় শুল। গলা চড়িয়ে বলল—এবার খাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে?

—ঐ মহিলার রসুই ঘর থেকে খাবার আনা। বিস্কো বলল।

—তাহলে প্রহরী আর বিস্কো যাও। আমি ভীষণ দুর্বল বোধ করছি। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি বিশ্রাম কর। আমরা যাচ্ছি। বিস্কো বলল। তারপর দুজনে গুহা থেকে বেরিয়ে এল।

আবার জমিদারের রাঁধুনীদের ছোরা দেখিয়ে খাবার নিয়ে পালিয়ে এল। আবার ঐ খাবার খেল। প্রহরীও খেল।

সেই রাত কাটল। ফ্রান্সিসরা কালোদের সঙ্গে পাচাকুচির লড়াইয়ে কারা জিতল তা জানা গেল না।

ফ্রান্সিস প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি তো আগে আমাদের পাহারা দিতে।

—হ্যাঁ রাজার হুকুম। প্রহরী বলল।

—কিন্তু মুস্কিল হয়েছে আমরা আর এখানে পড়ে থাকবো না। আজকেই চলে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে আমাকে হত্যা করে যেতে পারেন। প্রহরী বলল।

—তোমাকে আহত করেই পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক বুঝলাম না। প্রহরী বলল।

—আমি তোমার পায়ে আর পিঠে আস্তে তরোয়াল চালিয়ে কেটে দেব। তোমার সেনাপতিকে বলতে পারবে তোমাকে আহত করে আমরা পালিয়েছি।

—হ্যাঁ। তা হতে পারে। প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস তরবারিটা কোষমুক্ত করল। প্রহরীর বাঁ পায়ে ডান পায়ে তরোয়াল দিয়ে একটু আস্তে ঘষে দিল। পিঠেও তরোয়াল কাটল। পা কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল।

—তাহলে চলি। ফ্রান্সিস বলল। গায়ে রাজার পোশাকটা রয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বিস্কো ঘোড়ায় চড়ে মাজোর্কা নগরে এল।

দুজনে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল লোকজন দাঁড়িয়ে পরে ওর রাজবেশ দেখছে। বুঝল এরকম হলে বিপদ।

হাতের কাছে একটা দর্জির দোকানে পেল। দুজনে দোকানে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল—আমার জামা বানিয়ে দিন। এক্ষুনি। দর্জি বেশি অর্থ চাইল। বিস্কো কোমরের ফেট্টিতে রাখা একটা সোনার চাকতি বের করে দিল। দর্জি খুব খুশি। বলল—আপনি বসুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বানিয়ে দিচ্ছি।

দর্জি জামা সেলাই করতে লাগল। ফ্রান্সিস বিস্কো বসে রইল। পোশাক সেলাই হয়ে গেল। ফ্রান্সিস রাজবেশ ছেড়ে নতুন পোশাক পড়ল। রাজবেশটাও নিল। দামটাম চুকিয়ে ওরা রাস্তায় এল।

—এখন কী করবে? বিস্কো বলল।

—দুটো কাজ। এক ঝোপজঙ্গলে হ্যারিদের রেখে গিয়েছিলাম সেইখানে খোঁজ করতে যেতে হবে। দুই—রাজা কুয়েক হুয়ার কাছে যেতে হবে। এখন কোন কাজটা আগে করবো সেটাই ভাবছি।

—দেখ এই দুপুরে রাজার কাছে যাওয়া ঠিক নয়। বোধহয় অসুস্থ রাজা দেখাই করবেন না। তার চেয়ে হ্যারিদের খোঁজ করাই ভালো। আমাদের দেখে ওরা নিশ্চিন্ত হবে। আমরাও ওদের কোন বিপদ হয়নি জেনে খুশি হব। বিস্কো বলল।

—ঠিক আছে। তাহলে জংলা জায়গাটায় চলো। জঙ্গলে দুজনেই ঢুকল। ফাঁকা জায়গাটায় এল। হয়তো দেখা হবে। না। কেউ নেই। এদিক ওদিক দেখছে তখনই

দেখল একটা জংলা গাছের ডালে একটা বড় কাগজ ঝুলছে। ফ্রান্সিস ছুটে গেল। কাগজটা ঐ গাছেরই সঙ্গে আটকানো। কাগজটা নিয়ে ফ্রান্সিস পড়ল—ফ্রান্সিস এখানে উত্তরে একটা বেশ বড় পোশাক টোশাকের দোকান আছে। তার উল্টোদিকের রাস্তার একটু ভেতরে একটা সরাইখানা পাবে। আমরা ওখানেই আছি।—হ্যারি।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—বিস্কো ওদের হদিশ পেয়েছি। কাগজটা বিস্কোকে দিল। বিস্কো পড়ে বলল—তাহলে ঐ দোকানের খোঁজে চল।

—হ্যাঁ। যেতে তো হবেই।

দুজনে উত্তরমুখো চলল। খুঁজতে খুঁজতে পোশাকের দোকানটা পেল। ঠিক তার উল্টোদিকে একটা বড় দোকান। ওটাই পোশাকের দোকান। রাস্তার উল্টোদিকে একটা সরাইখানা।

ফ্রান্সিস বিস্কোর দিকে তাকিয়ে হাসল। বিস্কোও হাসল। দু'জনে ছুটে রাস্তা পার হয়ে সরাইখানার সামনে এল। খোলা দরজা দিয়ে দেখল হ্যারিকে। হ্যারি পায়চারি করছে।

—হ্যারি? ফ্রান্সিস ডাকল। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। হ্যারির চোখে জল। ফ্রান্সিস ধমকের সুরে বলল— অ্যাই—কাঁদবে না। ততক্ষণে সবাই এসে ফ্রান্সিসকে ঘিরে দাঁড়াল। সকলেই হাসছে। বিস্কো ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। সবাই চিৎকার করে ধ্বনি তুলল—ও —হো—হো।

ভেতরের একটা ঘর থেকে মারিয়া বেরিয়ে এল। শুকনো মুখ। মাথার চুল অবিন্যস্ত। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে হেসে এগিয়ে এল।

ওদিকে বিস্কো সকলকে বলতে লাগল ওরা কী কী করেছে—সেসব।

কিছু পরে ফ্রান্সিস আর বিস্কো খেয়ে নিল। ফ্রান্সিস মারিয়া আর বন্ধুদের অক্ষত দেহে দেখে খুব নিশ্চিন্ত হল।

বিকেলের দিকে ফ্রান্সিস মারিয়া আর হ্যারিকে ডাকল। ওরা ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—রাজা কুয়েক হুয়ার কাছে যাব। তোমরাও চলো।

—রাজা কুয়েক হুয়া নিশ্চয়ই নিজের রাজবাড়িতেই আছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—কোথাও চলে যেতেও পারেন। হ্যারি বলল।

—না। উনি অসুস্থ। যেখানে যাবেন দেখেশুনে যাবেন। সেখানে চিকিৎসার সুবিধে আছে কিনা। এসব দেখেটেখে যাবেন।

—তাহলে তোমার কী মনে হয়? উনি এখনও রাজবাড়ি ছেড়ে যান নি? মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ—আমার তাই মনে হয়। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন কী করবে? হ্যারি জানতে চাইল।

—আমার মনে হচ্ছে রাজার সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করা দরকার। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? মারিয়া বলল।

—সেই নক্সাটা ফিরিয়ে দিতে হবে! তারপর তাঁর পিতামহের ধন সম্পদ খুঁজে বের করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে আরো দু'তিনদিন। মারিয়া বলল।

—হ্যাঁ—তাও লাগতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া কোন কথা না বলে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—মারিয়া খুবই উদ্বেগের মধ্যে আছেন। তাকে সাহস দাও।

ফ্রান্সিস মারিয়ার ঘরে ঢুকল। দেখল মারিয়া বিষণ্ণমুখে বিছানায় বসে আছে। কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল—

—আমি তো এসেছি। এখন তোমার দুশ্চিন্তা থাকার কথা নয়?

—দুশ্চিন্তা আমার কোনদিন যাবে না। মারিয়া আস্তে আস্তে বলল।

একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া—তুমি এতদিন আমার সঙ্গে থেকে নিশ্চয়ই বুঝেছো যে আমি এক অন্যরকমের জীবন কাটাই। বাড়িতে নিশ্চিন্ত সুখের জীবন আমার জীবন নয়। তুমি যদি আমার জীবনটাই মেনে নাও তাহলে আমি খুশী হব। তুমি যদি আমার জীবনটা মেনে নিতে না পারো তবে বলো আমি তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেবো।

—না। বেশ জোরেই বলল মারিয়া। তারপর ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল। ফ্রান্সিস হেসে ওর হাতটা ধরল। মারিয়া একটু অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলল—মৃত্যু পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো। কোন শক্তি আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

ফ্রান্সিস মারিয়ার হাতটা জড়িয়ে ধরে হেসে বলল—তোমার কাছ থেকে ঠিক এই কথাটাই আশা করেছিলাম। যা হোক—তৈরি হয়ে নাও। আমরা রাজা কুয়েক হুয়ার কাছে যাবো। কথা আছে। তুমি হ্যারিও যাবে।

কিছু পরে ফ্রান্সিস মারিয়া আর হ্যারি তৈরি হয়ে নিল।

রাজা কুয়েক হুয়ার রাজবাড়ির সামনে ওরা। প্রবেশপথে কোন দ্বাররক্ষী নেই। মন্ত্রণাকক্ষ পার হচ্ছে তখনই একজন রক্ষী এল। বলল—আপনারা মাননীয় রাজার সঙ্গে দেখা করবেন?

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস মাথা ওঠানামা করল।

—একটু দাঁড়ান। দ্বাররক্ষী বলল।

রক্ষী ঘরের ভেতরে চলে গেল। একটু পরে বেরিয়ে এসে বলল—আসুন।

ফ্রান্সিসরা রাজার শয়নকক্ষে ঢুকল। দেখল রাজা শুয়ে আছেন। শিয়রে রাণী বসে আছেন। একটি মেয়ে রাজার কপালে হাত বুলোচ্ছে। ফ্রান্সিস রাণীর দিকে তাকিয়ে বলল—রাণীমা—মাননীয় রাজার শরীর কেমন আছে?

—খুব ভাল না। রাণী বললেন।

রাজা চোখ বুঁজে ছিলেন। এবার চোখ খুলে ফ্রান্সিসদের দেখে বললেন— ও আপনারা এসেছেন। বসুন।

খাটের কাছে দুটো কাঠের আসন রাখা। মারিয়া হ্যারি বসল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে রইল। এবার বলল—মাননীয় রাজা আপনাকে বিরক্ত করছি।

—ও কিছু না। বলুন। রাজা বললেন।

—আপনার পিতামহ তাঁর সম্পদ কোথায় রেখে গেছেন তার কথা একটা নক্সায় এঁকে রেখেছিলেন। ঐ নক্সাটা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। আমি মোটামুটি আঁচ করতে পেরেছি সেই সম্পদ কোথায় আছে। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

—আপনি খুঁজে পেয়েছেন? রাজা জানতে চাইলেন।

—না। এখনও পাই নি। তবে পাবো আশা করছি। আমি এই ঘরটা দেখেছি! অন্দরে আরো ঘর রয়েছে তো?

—হ্যাঁ। রাজা বললেন।

—ঐ দুটো ঘরে কে থাকেন?

—আমার স্ত্রী। ছেলেমেয়ে একটা ঘরে থাকেন। রাজা বললেন।

—আর একটা ঘরে? ফ্রান্সিস বলল।

—ওটা আমাদের অতিথিঘর বলতে পারেন। পরিচিত আত্মীয়স্বজন এলে থাকেন। রাজা বললেন।

—সব ঘরেই পাথরের ফুলদানি আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আমার ঠাকুর্দার শখ ছিল ফুলের। নানা রঙের ফুল তিনি পছন্দ করতেন। এই ফুলদানিগুলো তিনিই লোক রেখে করিয়েছিলেন। রাজা বললেন।

—প্রতিটি ফুলদানিতেই ফুল রাখা হয়? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। একজন মালী আছে। মালী প্রতিদিন ভোরে তাজা ফুল এনে রাখে ফুলদানীগুলোতে। রাজা বললেন।

—এবার একটা অনুরোধ। ভেতরের ঘরগুলো যদি দেখতে দেন। ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়ই। মেয়েকে বললেন—অন্য ঘরদুটো ফ্রান্সিস সাহেবকে দেখিয়ে দে।

আন্না উঠে দাঁড়াল। রাজার বালিশের তলা থেকে একটা চাবি নিয়ে বলল—আসুন।

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি তোমরা থাকো। আমি যাচ্ছি।

আন্নার সঙ্গে প্রথম ঘরটায় গেল ফ্রান্সিস। ঘরে ঢুকল। কাঁচ-ঢাকা আলো ঘরটায়। সবই মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বড় বিছানা একটায়। অন্যটা ছোট বিছানা। বড়টায় বোধহয় ভাইবোনেরা থাকে। ছোটটায় রাণী।

ফ্রান্সিস ফুলদানিগুলো এক এক করে দেখতে লাগল। চারটে ফুলদানি। তাতে ফুল রাখা। ফ্রান্সিস দেখল প্রত্যেকটি ফুলদানিই বসানো আছে হাত তিনেক মোটা কাঠের ওপর। প্রত্যেকটি একইভাবে রাখা। কালো পাথরের সব ফুলদানি।

এবার ফ্রান্সিস বলল—আন্না তোমাদের অতিথিঘর কি খোলা?

—না। চাবি এনেছি। আন্না বলল।

অতিথি ঘরের সামনে এল ফ্রান্সিস। তালা ঝুলছে। আন্না তালা খুলল। বলল একটু দাঁড়ান আলো আনছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আন্না একটা হলুদরঙের মোটা মোমবাতি নিয়ে এল।

ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। একই রকম ঘর। তবে একটু বেশি সাজানো গুছনো। খাটের ওপর ফুলপাতা আঁকা মোটা একটা চাদর। বালিশ।

এবার ফ্রান্সিস ফুলদানিগুলো দেখতে লাগল। সেই গোল কাঠের পাটা তিন হাত মত এবং তার ওপর ফুলদানি রাখা। হঠাৎ ফ্রান্সিসের চোখে পড়ল পূবদিকের ফুলদানিটা। ও ফুলদানিটার কাছে গেল। ভালো করে দেখল ফুলদানির দুটো পাতা ভাঙা। ফুলদানিগুলো ফুলের পাতার ফুলের মত তৈরি করা। ভাঙা জায়গায় দেখল সাদাটে। ফ্রান্সিস হাত দিয়ে দেখল কালো রঙ উঠে এল। দেখা গেল সাদাটে পাথর। এই একটাই সাদা পাথরের। কালো রং করে রাখা।

ফ্রান্সিস ভাঙা পাতা দুটো দেখতে লাগল। তারপর ফুলদানিটা তুলল। গোল কাঠের ছোট্ট স্তম্ভ। ভেতরে কুঁদে একটা গর্তমত রাখা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস বলে উঠল—থলি রাখা ছিল চুরি হয়ে গেছে। আন্না বলল—কী বললেন যেন।

—না-না। ও কিছু না। চলো তোমার বাবার কাছে।

ফ্রান্সিস বলল—আন্না চল। দুজনে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস রাজার কাছে এল। বলল—মাননীয় রাজা—মণিমানিক্য অলঙ্কার রাখা ছিল যে থলিটায় সেটা চুরি হয়ে গেছে।

—বলেন কী? রাজা উঠতে গেলেন। রাণী শুইয়ে দিলেন। বললেন—একেবারে উত্তেজিত হবেন না।

—এখন প্রশ্ন কে চুরি করল? ফ্রান্সিস বলল।

—আপনি কি নিশ্চিত গুপ্তভাবে রাখা মূল্যবান সবই চুরি হয়ে গেছে? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। এবার আপনাকে কিছু পুরোনো ঘটনা মনে করতে হবে। যেমন— ঐ অতিথি ঘরে আপনার অনাত্মীয় মানে যারা আপনার আত্মীয় নন তেমন কাউকে থাকতে দিয়েছিলেন?

—সবাই তো রাতে থাকতো না। তবে অনাত্মীয় বলতে যাদের বোঝায় তাদের দুজনের কথা মনে পড়ছে—এক—বাবার এক প্রিয় বন্ধু। বড্ড বক বক করতেন। দুদিন ছিলেন। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। আর একজন আমার বৈদ্য— কবিরাজ। বেশিদিনের কথা নয়। মাস দুতিন আগে আমাকে সেদিন দেখতে এসেছিলেন। আমাকে দেখে যেতে তাঁর দেরি হয়ে গিয়েছিল। বাইরে ঝড় বৃষ্টি চলছিল। রাতের খাওয়া খেলেন। অতিথিঘরে রইলেন। পরদিন সকালে চলে গেলেন।

—আর? ফ্রান্সিস আরও জানতে চাইল।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান মনে পড়েছে। দিন কয়েক পরে ঐ কবিরাজ আবার এলেন। সেদিন তাঁর আসার কথা নয়। উনি আমাকে দেখলেন। ওষুধও পাল্টালেন না। রাত হয়ে গিয়েছিল। তিনি ঐ অতিথি আবাসে থাকলেন। কিন্তু ভোরবেলা কখন চলে গেছেন কেউ জানে না। শুধু মালী নাকি দেখেছিল।

—এঁরা ছাড়া আর কেউ? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—মনে পড়ছে না। রাজা বললেন।

—ইদানীং মানে মাস কয়েকের মধ্যে? ফ্রান্সিস বলল।

—না। আর কেউ অতিথিঘরে থাকেন নি।

এবার ফ্রান্সিস বলল—ঐ বকরবকর ভদ্রলোক—আপনার বাবার বন্ধু—আর কবিরাজের ঠিকানা চাই। দিতে পারবেন?

রাজা রাণীকে বললেন—বালিশের তলা থেকে মোটা বইটা বের কর তো?

রাণী বালিশের তলা থেকে মোটা বইটা বের করে রাজাকে দিলেন। রাজা নোট বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন—বাবার বন্ধুর নিজের হাতে তাঁর ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন। তিনি—রাজা থেমে গেলেন। বললেন— পেয়েছি। ফ্রান্সিস আন্নাকে বললেন—এক টুকরো কাগজ আর কালি কলম নিয়ে এস। আমাকে ঠিকানা দুটো লিখে দাও। আন্না ভেতরের ঘরে চলে গেল।

—পেয়েছি, পেয়েছি। কবিরাজের ঠিকানাও পেয়েছি। রাজা বললেন।

আন্না কাগজ কলম নিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—ঠিকানা দুটো আমাকে লিখে দাও। আন্না ঠিকানা লিখে দিল।

ঠিকানা লেখা কাগজটা ফ্রান্সিস পড়ল। বলল—কবিরাজ কুজকোতে থাকেন। প্রথমে তাঁকেই খুঁজবো তারপর আপনার পিতার বন্ধুকে খুঁজবো। কিন্তু উনি থাকেন চিলিতে। বেশ দূর। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—তাহলে আমরা আজ চলি। আমি কালকেই কুজকো যাচ্ছি।

—ভালো। দেখুন গুপ্তধন উদ্ধার করা যায় কিনা। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস দেরি করতে চাইল না। জাহাজের বন্ধুরা নিশ্চয়ই ওদের জন্যে চিন্তান্বিত।

সকালে খেয়েই ফ্রান্সিস বলল—বিস্কো—রাজকুমারী রইলেন। একটু সাবধানে থেকো। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবো।

তিনজনে খেতে বসল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো খেয়ে উঠেই তিনটে ঘোড়া ভাড়া করে আনবে।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো ঘাড় কাত করে বলল।

খাওয়া হল। শাঙ্কো ঘোড়া ভাড়া করতে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো তিনটে ঘোড়া নিয়ে এল।

ফ্রান্সিসরা তৈরি হয়ে ঘোড়ায় উঠল। তিনটি ঘোড়া সওয়ারি নিয়ে ছুটল কুজকোর দিকে।

শেষ দুপুরে কুজকো পৌঁছল। একটা মাঠের ওপর এল ওরা। অনেক ঘোড়া রয়েছে। ঘোড়া থেকে নেমে ফ্রান্সিস চলল ঘোড়ার মালিকের কাছে। নির্দেশমত পেলও তাকে। ঘোড়া জমা দিল। পরে ফিরে যাওয়ার অগ্রিমটাও লোকটাকে দিয়ে রাখল।

খিদে পেয়েছে। কিন্তু এখন খাওয়া নয়। যে কাজে এসেছে সেটা আগে করতে হবে।

ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে কাগজটা বের করল। প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে গীর্জাটা। তার বাঁদিকের ছোট রাস্তা ধরে এগোতে হবে। চার্চের রাস্তা শেষ হতেই বাঁদিকের প্রথম বাড়িটা। রাজা কুয়েক হুয়ার এটাই নির্দেশ ছিল।

গীর্জা ছাড়িয়েই বাড়িটার সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। দেখা গেল নতুন ঝকমকে একটা বাড়ি। অথচ রাজা বলেছিলেন বেশ পুরোন বাড়ি।

ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—অলঙ্কার বিক্রি করে কবিরাজ এখন ধনী। বাড়িটি কেমন নক্সারমত তৈরি। হ্যারি হাসল।

ওরা সদর দরজার কাছে এল। একটা দড়িমতো ঝুলছে। ফ্রান্সিস দড়িটা নিচে টানল। বাড়ির ভেতরে সুরেলা আওয়াজ হল। একটু পরে একটা কাজের লোক এল। হ্যারি বলল—কবিরাজ মশাই আছেন?

—হ্যাঁ আছেন। কিন্তু বিকেলবেলা রোগী দেখেন না।

—ঠিক আছে। আমরা ঘুরে আসছি। হ্যারি বলল।

—আচ্ছা লোকটি দরজা বন্ধ করে দিল।

রাস্তায় এল ওরা। ফ্রান্সিস বলল—আমাদের একটা সুবিধে হল। এই ফাঁকে চলো খেয়ে নি।

কুজকো বেশ বড় শহর। ইনকা সাম্রাজ্যের রাজধানী। রাস্তায় ভিড়ও বেশ।

একটু খুঁজতেই একটা ভালো সরাইখানা পেল। ঢুকল ওরা। হ্যারি মাংস মোটা রুটির জন্য বলল। খুব তাড়াতাড়িই খাবার এল। খেতে খেতে হ্যারি বলল—আচ্ছা ফ্রান্সিস তুমি কোন অকাট্য যুক্তি পেয়েছো যে কবিরাজ চুরি করেছে বলছো।

—আমার সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয়েছে যখন শুনলাম কবিরাজ যেদিন চলে যান তখন খুব ভোরেই তিনি চলে এসেছিলেন। তারপর তিনচারমাস কেটে গেছে কবিরাজ আর যান নি। কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ এই প্রশ্ন উঠতে পারে। এখন কবিরাজকে নিয়ে কী করবে?

—কবিরাজ গুপ্তধন চুরি করেছে এই সত্যটা ওকে স্বীকার করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি স্বীকার না করে? হ্যারি বলল।

—তবে রাজা কুয়েক হুয়া অবশ্য এখন আর রাজা নন—তবুও তাকে দিয়ে রাজা পাচাকুচির দরবারে নালিশ করাবো।

—তাতে কাজ হবে? শাঙ্কো বলল।

—হতে পারে আবার নাও হতে পারে। আমরা গুপ্তধনের হদিশ দেব। বাকি উদ্ধার করার দায়িত্ব আমাদের নয়। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। দেখ। হ্যারি বলল।

বিকেলে ওরা কবিরাজের বাড়িতে গেল। সেই লোকটি বাঁ পাশের ঘরটায় ফ্রান্সিসদের বসাল। আরো লোক বসে আছে।

লোকটি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ঐখানে নাম লিখিয়ে বসুন। ফ্রান্সিস দেখল একটা কাঠের আসনে একজন কাগজ কালিকলম নিয়ে বসে আছে। সে নাম ডাকছে।

ফ্রান্সিস লোকটির কাছে গেল। নাম লেখাল।

ফ্রান্সিসরা বসে আছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে লোকটি ফ্রান্সিসের নাম ডাকল।

ফ্রান্সিস কবিরাজের ঘরে ঢুকল। কবিরাজকে দেখল। কবিরাজকে দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল লোকটা ভীষণ ধূর্ত। এই লোকটার পক্ষে চুরি করা অসম্ভব নয়। চোখদুটোর তীব্র দৃষ্টি। কিন্তু মুখ ভাবলেশহীন।

—আপনাকে বিদেশী বলে মনে হচ্ছে। কবিরাজ একটু হেসে বললেন।

—হ্যাঁ আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। তা আপনার কী কষ্ট? কবিরাজ বললেন।

—কষ্টের কথা বলতে আসিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে? কবিরাজ বললেন। অল্প হাসলেন।

—আপনি রাজা কুয়েক হুয়াকের চিকিৎসা করেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কবিরাজ বললেন।

—আচ্ছা—রাজা তাঁর পিতামহের গুপ্তধনের কথা আপনাকে বলেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। এই গুপ্তধনের কথা অনেককেই বলতেন। এটা বলে বোধহয় তিনি আনন্দ পেতেন।

—যাই হোক—একদিন জলঝড়ে আপনি এই কুজকোয় ফিরতে পারেন নি। রাজার অতিথি ঘরে ছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কবিরাজ বললেন।

—রাজা আপনাকে একটা নক্সা দেখিয়েছিলেন। ওটাতে গুপ্তধনের হদিশ ছিল। কিন্তু কেউ ওটার সমাধান ভেবে পায় নি। যা হোক—আপনি শোবার সময় নক্সাটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে বললেন—এখানকার তিনটি শয়নঘরের নক্সাটা আঁকা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—নকশাটা দেখলে তাই মনে হয়। কবিরাজ বললেন।

—আপনি অতিথিঘরটার ফুলদানিগুলো তুলে তুলে দেখেছিলেন গুপ্তধন রয়েছে কিনা। হঠাৎই পেয়ে যান একটা থলি। থলি দেখে এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে পাথরের ফুলের দুটো পাপড়ি ভেঙে ফ্যালেন। থলিটা খুলতে গিয়ে খোলেন নি। সেই রাতে ঐ পর্যন্ত। ফ্রান্সিস বলল।

—এসব কী বলছেন আপনি? কোথায় গুপ্তধন কোথায় থলিটলি এসব—মানে কি? কবিরাজ বললেন।

ফ্রান্সিস আগের মতই বলতে লাগল—পরে যেদিন রোগী দেখার কথা নয়—সেইদিন গেলেন। অতিথিঘরে রইলেন। ভোরের দিকে থলিটা নিয়ে প্রায় পালিয়ে এলেন। কারো সঙ্গে দেখা না করেই চলে এসেছিলেন। একমাত্র মালী আপনাকে দেখেছিল।

কবিরাজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—এসব মিথ্যে অপবাদ।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বলল—আমরা বিদেশী। এক জায়গায় তো বেশিদিন থাকি না। যদি থাকতাম তাহলে আপনাকে কয়েদখানায় ঢোকাতাম।

—বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও। কবিরাজ বললেন। ফ্রান্সিস বলল—

আমি মাজোর্কা যাচ্ছি। রাজা কুয়েক হুয়াকে সব বলবো। উনি যদি আপনার নামে রাজা পাচাকুচির রাজদরবারে নালিশ করেন—শেষ পর্যন্ত আপনাকে সব স্বীকার করতে হবে। রাজা কুয়েক হুয়ার মত একজন উদারমনা মানুষকে ঠকালেন—এটাই

দুঃখের। কবিরাজ তখনও চ্যাঁচাচ্ছেন—বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও। নাম লেখার লোকটি ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিসের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস লোকটার ঘাড়ে এক রদ্দা কষাল। লোকটি মেঝেয় বসে পড়ল।

ফ্রান্সিস বাইরে এল। হ্যারি ছুটে এল—ফ্রান্সিস তোমাকে মারধোর করে নি তো?

—দূর। দুঃখ কী জানো—কবিরাজকে কান ঘেঁষে মাথায় এক রদ্দা কষালে ভালো হত। ফ্রান্সিস বলল।

—চল—চল। আর নয়। হ্যারি বলল।

তিনজনে কবিরাজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

জাহাজে ওঠার সময় হয়ে আসছে। দুপুরে খাওয়ার সময় শাঙ্কো প্রস্তাব দিয়ে বলল—ফ্রান্সিস—আমাদের তো জাহাজে ফেরার সময় এসে গেছে। এখন আমাদের কিছু স্বর্ণমুদ্রা দাও। বাজারে গিয়ে দরকারী জিনিস টিনিস কিনে আনি।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস হেসে বলল। মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—মারিয়া তুমিও যাবে। মারিয়া একটু চুপ করে থেকে বলল—আমারও কিছু কেনাকাটা ছিল। কিন্তু সকাল থেকে মাথার বাঁ পাশে ভীষণ ব্যথা শুরু হয়েছে। কখনও কমছে কখনও বাড়ছে। আমি যেতে পারবো না।

—ঠিক আছে। রাজকুমারী বিশ্রাম নিন। আমরা যাবো। তবে খুব বেশি ঘোরাঘুরি করবো না। তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো। হ্যারি বলল। কেউ কিছু বলল না।

খাওয়া শেষ। ঘরে এসে সবাই পোশাক পাল্টাতে লাগল। মারিয়া ফ্রান্সিসকে বলল—তুমি কিছু কিনবে না। তুমি আর আমি কাল সকালে বেরিয়ে আমাদের দুজনের জিনিসপত্র কিনবো।

—কী কিনবে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—সেটা কাল সকালে ভাবা যাবে। মারিয়া বলল।

—তাহলে আজ আমি যাবো না। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া বলল—কেন। বন্ধুর সঙ্গে তুমিও যাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসরা তৈরি হল। হ্যারি বলল—রাজকুমারীকে একা রেখে যাওয়া চলবে না। বিস্কো এখানে থাকবে। ও কালকে ফ্রান্সিসদের সঙ্গে যাবে।

ফ্রান্সিস সবাইকে দুটো করে স্বর্ণমুদ্রা দিল। সকলেই খুশি।

পড়ন্ত বিকেলে ফ্রান্সিসরা কেনাকাটা করতে বাজারের দিকে চলল।

সরাইখানার বাইরে দাঁড়িয়ে বিস্কো দেখল সেটা। মারিয়া ঘর থেকে বেরোয় নি। বিস্কো নিজেদের ঘরের দিকে চলল। ওর একটু অভিমান হয়েছিল। ওকে ফ্রান্সিসরা নিয়ে গেল না।

বিস্কো বিছানায় শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

মারিয়া বিছানায় শুয়েছিল। মাথার যন্ত্রণাটা একটু কমেছে। একা একা শুয়ে আছে। ভালো লাগল না।

সরাইখানার বাইরে এসে দাঁড়াল। রাস্তার লোকজন গাড়িঘোড়া মানুষের ব্যস্ততা এসব দেখতে লাগল। আবার একঘেঁয়ে লাগছে। ঘর থেকে আসবে কিনা ভাবছে

তখনই এক ঘোড়াসওয়ার ঠিক ওর সামনে এসে ঘোড়াটাকে দাঁড় করালো। মারিয়া আরোহীর দিকে তাকাল। লোকটার লম্বা লম্বা চুল। কপালে একটা লাল ফেট্টি বাঁধা। গাল পর্যন্ত জুলপি। কুৎকুতে চোখ। দেখেই কেমন গুণ্ডা গুণ্ডা মনে হল।

লোকটা ঘোড়াটা মারিয়ার আরো কাছে আনল। মারিয়া কিছু বোঝবার আগেই নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে মারিয়ার কোমর ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ঘোড়ার ওপর তুলে নিল। সামনে বসিয়ে ঘোড়া ছোটাল উত্তরমুখো। রাস্তার লোকজন যারা দেখল তারা হৈ হৈ করে উঠল। তারপর ঘটনাটা দেখেছে এমন লোকেদের দুজন ছুটল ঘোড়সওয়ারকে ধরতে। কিন্তু তেজি ঘোড়ার গতির সঙ্গে তারা পারবে কেন। হাল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। ততক্ষণে ঘোড়া সওয়ারসহ অনেক দূরে।

বিস্কোর ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ বাইরের একটা হৈ হৈ চিৎকার শুনল। ও উঠল। কী ব্যাপার দেখতে হয়। ও আস্তে আস্তে বাইরে এল। তখন অনেক লোক জমে গেছে। একজনকে জিজ্ঞেস করল কী ব্যাপার? লোকটি বলল— একটা গুণ্ডা ঘোড়ায় চড়ে এসে একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল। এরকম হতে পারে। বিস্কো কিছু মনে করল না। নিজের ঘরে চলে আসছে তখনই দেখল মারিয়ার ঘরের দরজা হাট করে খোলা। বিস্কো দ্রুত ঘরে ঢুকল। ঘর শূন্য। রাজকুমারী নেই।

বিস্কো এক ছুটে বাইরে এল। তখনও কয়েকজন মিলে—এমনি সব ঘটনা নিয়ে বলাবলি করছিল। বিস্কো গিয়ে জিজ্ঞেস করল আপনারা দেখেছেন?

—আমাদের চোখের সামনে সমস্ত ব্যাপারটা ঘটেছিল। একজন বলল।

—বিস্কো—মেয়েটি কি পোশাক পরেছিল?

—বিদেশী পোশাক। একজন বলল।

—তাহলে মেয়েটি বিদেশী? বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আর একজন ঘাড় কাত করে বলল।

বিস্কো অস্ফুটস্বরে বলে উঠল তাহলে রাজকুমারী।

বিস্কো নিজের ঘরে ফিরে এল। কথা ছিল আমি রাজকুমারীর পাহারায় থাকবো। সেই আমি গর্ধভের মত ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি যদি রাজকুমারীকে বলে রাখতাম আমার ঘুম পাচ্ছে। আপনি আমাকে না বলে সরাইখানার বাইরে যাবেন না। তাহলে রাজকুমারী নিশ্চয়ই বাইরে যেতেন না। এই ঘটনাটাও ঘটত না।

বিস্কো একা ঘরে চুপ করে বসে রইল। ফ্রান্সিসরা এলে কী বলবো? রাজকুমারীকে একটা গুণ্ডা ঘোড়ায় তুলে নিয়ে গেছে। আমার অসতর্কতার জন্যেই এটা ঘটল। বিস্কো ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। আমার এই গাফিলতি ফ্রান্সিসরা মেনে নেবে না।

বিস্কো বসে থাকতে পারল না। আবার বাইরে এল। একজন বয়স্ক লোক তখনই সরাইখানায় ঢুকছিল। বিস্কোকে দেখে বলল—শুনছেন?

বিস্কো দাঁড়িয়ে পড়ল।

—শুনলাম মেয়েটি নাকি—স্বামী ও বন্ধুদের সঙ্গে এদিকে বেড়াতে এসেছেন। বৃদ্ধ বললেন।

—হ্যাঁ। বিস্কো মাথা ওঠানামা করল।

—ঘটনাটার মধ্যে একটু ভাববার ব্যাপার আছে। কারণ যে উঠিয়ে নিয়ে গেছে সে এখানকার কুখ্যাত গুণ্ডা। তাই এসব নিয়ে কেউ বেশি কথা বলছে না। এবার গলা নামিয়ে লোকটা বলল—একটা কুখ্যাত গুণ্ডা ধরে নিয়ে গেছে। ঠিক আছে। কিন্তু গুণ্ডা মিছিমিছি একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে যাবে কেন? মশাই এই ঘটনার মধ্যে বেশ জটিলতা আছে।

—আমারও তাই মনে হয়। বিস্কো বলল।

লোকটি একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—

—কেউ গুণ্ডাটাকে লাগিয়েছে। অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে।

—আমিও সেটাই ভাবছি। বিস্কো বলল।

—আপনারা তো বিদেশী। বৃদ্ধ বললেন।

—হ্যাঁ।

—কার সঙ্গে আপনাদের কী হয়েছে যে গুণ্ডা লাগিয়ে আপনাদের শায়েস্তা করতে চাইছে। বৃদ্ধ বললেন।

—কী জানি। কিছুই বুঝতে পারছি না। বিস্কো বলল।

—খোঁজ নিয়ে দেখুন আপনাদের কেউ এ দেশের কাউকে চটিয়েছেন? বৃদ্ধ বললেন।

বিস্কো কিছু বলল না।

—বলুন ঠিক বলেছি কিনা। বৃদ্ধ বললেন।

—কী জানি বুঝতে পারছি না। বিস্কো বলল।

—ঐ মহিলাকে ফেরৎ পেতে বেশ কিছু অর্থব্যয় করতে হবে। লোকটি বলল।

—দেখা যাক। বিস্কো বলল। তারপর নিজের ঘরে চলে এল। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল ফ্রান্সিসদের জন্যে। বিস্কো সরাইখানার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঢোকার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তার লোকজন গাড়ি ঘোড়া ওপর ওপর দেখতে লাগল। আসলে ওর চিন্তা যা হয়েছে হয়েছে। কিন্তু রাজকুমারীকে কি করে উদ্ধার করবে।

ফ্রান্সিসদের ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। ওরা বিস্কোকে সরাইখানার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ফ্রান্সিস বলল—কী ব্যাপার? এখানে দাঁড়িয়ে আছো? ঘরে চলো।

—চলো। সকলেই ওদের ঘরে এল। কেনার জিনিস রাখল। সকলেই কে কী কিনল তাই নিয়ে কথা বলতে লাগল। পরস্পরকে কেনা জিনিস দেখাতে লাগল।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেবার জন্যে সাদা ভালুকের চামড়ায় তৈরি পোশাকটা নিল। চলল। বিস্কো বলল—ফ্রান্সিস। একটা কথা ছিল। ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়াল। বলল, কী কথা?

—ঘণ্টা খানেক আগে এই শহরের এক গুণ্ডা ঘোড়ায় চড়ে এসে রাজকুমারীকে অপহরণ করেছে। বিস্কো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

—বলো কি। সমস্ত ঘটনাটা বলো তো। আমাদের ঘরে এসো। হ্যারি তখনই এল। বলল—

—ফ্রান্সিস পোশাক রাজকুমারীর পছন্দ হয়েছে তো?

—হ্যারি চলো কথা আছে। ফ্রান্সিস আস্তে বলল।

তিনজনে ওদের ঘরে ঢুকল। দেখল পছন্দের জিনিস কেনাকাটা করে সবাই আনন্দে আত্মহারা। জোরে জোরে কথা বলছে। ফ্রান্সিস বিরক্ত হল। বলল— আস্তে কথা বল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস কী ব্যাপার বলো তো?

—কিছুক্ষণ আগে একটা গুণ্ডা মারিয়াকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল, সবাই চুপ করে রইল। ফ্রান্সিস বলল—বিস্কো তুমি যতটা এই ঘটনা জেনেছো বলো।

—বেশ। এবার বিস্কো আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনাটা যা জেনেছে বলল।

শাঙ্কো বলে উঠল—বিস্কো—তুমি এতটা দায়িত্ব বোধহীন নও। আজকে কী হল তোমার। রাজকুমারীর সব তুমি দেখাশুনো করবে এই ভরসায় তোমার হেফাজতে রাজকুমারীকে রেখে গেছিলাম আমরা। এ তুমি কী করলে?

হ্যারি বলল—বিস্কো—এখন তোমাকে কিছু বলা বৃথা। ভুল যা হবার হয়ে গেছে। বিস্কো সবই বলেছে। তারই ওপর ভিত্তি করে রাজকুমারীকে খুঁজতে হবে। এবার ফ্রান্সিস কিছু বলো। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—প্রথমে দেখতে হবে এখানে কার সঙ্গে বা কাদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা জন্মেছে।

—আমরা আগ বাড়িয়ে তো কারুর ক্ষতি করি নি। হ্যারি বলল।

—তবু শত্রুতা জন্মেছে। রাজা কুয়েক হুয়ার নক্সা আমরা পেয়েছি। খোঁজাখুঁজি করে আমরাই প্রথম বলেছি যে গুপ্ত ধনভাণ্ডার চুরি হয়ে গেছে এবং চুরি করেছে রাজার চিকিৎসক মানে কবিরাজ মশাই। কবিরাজের সঙ্গে আমাদের সামনাসামনি কথা হয়েছে এবং তিনিই যে গুপ্তধন চুরি করেছেন এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। এইবার কবিরাজ আমাদের এদেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টায় নামল। প্রথমেই মারিয়াকে অপহরণ করে আমাদের মনোবল ভাঙতে চাইলেন। উনি বোঝাতে চাইলেন—আমরা কত অসহায় আর উনি কত শক্তিধর। আমাদের ভোগাবেন। সেটা সহজেই পারবেন কারণ আমরা বিদেশী, আমাদের স্বপক্ষে কেউ দাঁড়াবেন না। কাজেই আমাদের ওপর চাপ বাড়াবেন এবং আমাদের এই দেশ ত্যাগ করতে আমাদের বাধ্য করবেন।

—কী ভাবে? শাঙ্কো বলল।

—রাজকুমারীকে অপহরণ করে। এ জন্যে আমাকে অথবা আমাদের বন্ধুকে অপহরণ করাবেন। সুতরাং আমরা পেরু ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হব। সকলে চুপ করে রইল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এই বিষয়ে ঠিক বলেছে। আমার তো মনে হয় আমরা যদি এখন কবিরাজের কাছে গিয়ে বলি—আমাদের রাজকুমারীকে মুক্তি দিন আমরা রাজকুমারীকে নিয়ে চলে যাব। কবিরাজ সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীকে মুক্তি দেবে। সবাই হ্যারির কথা শুনল। হ্যারি ঠিকই বলেছে।

এবার ফ্রান্সিস বলল—রাজকুমারীর সন্ধান পেতে আমাদের সারা শহর খুঁজে দেখতে হবে। তার আগে কবিরাজের বাড়ি যাবো। কথায় কথায় কিছু সূত্র পেতে পারি। আমরা কবিরাজকে স্পষ্ট বলব—আপনি আমাদের জব্দ করতে রাজকুমারীকে

হরণ করিয়েছেন। কবিরাজের মনোভাবটা কী দাঁড়ায় সেটা বোঝা যাবে। কবিরাজের বাড়ি চলো।

সবাই কবিরাজের বাড়ির দিকে চলল।

কবিরাজের বাড়ির সামনে এল। দেখল একজন দারোয়ান বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে পেতলের বর্শা। ফ্রান্সিস ওর কাছে গেল। দারোয়ানকে দেখল—সন্দেহ নেই দারোয়ান বলিষ্ঠ। ফ্রান্সিস বলল—আমরা কবিরাজমশাইর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—তবে ভেতরে প্রথম ঘরটায় যান। দারোয়ান বলল।

ফ্রান্সিসরা সেই ঘরে ঢুকল। দেখল বেশ বড় ঘর। দেয়াল আলমারি ভর্তি অনেক কাঁচের বোয়াম। ফরাস পাতা। ফরাসে তিন চারজন লোক বসে রয়েছে। বোধহয় চিকিৎসার জন্য এসেছে।

ফ্রান্সিসরাও বসল। তখনই একজন লোক ঘরে ঢুকল। গলায় ঝোলানো একটা মুক্তো বসানো সোনার হার। লোকটার মাথার চুল বড় বড়। পরনে সিল্কের পোশাক। বলল—নতুন কে এলেন—নাম বলুন। কথাটা বলে যুবকটি কোমরে গোঁজা ছোট নোটবই মত বের করল। টেবিলের কাছে গিয়ে বলল— নতুন কে বা কারা এসেছেন বলুন। ফ্রান্সিস ফরাস থেকে উঠে দাঁড়াল। বলল— আমরা নতুন এসেছি।

—রোগীর নাম বলুন। যুবকটি বলল।

—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। যুবকটি নাম লিখতে লিখতে মুখে শব্দ করল—হুঁ।

—আপনার সমস্যা কি? যুবক বলল।

—কাঁধে ভীষণ ব্যথা। ওষুধ নিতে এসেছি। রোগীটি বলল।

—আগে কবিরাজমশাই আপনাকে পরীক্ষা করে দেখবেন তারপর ওষুধ দেবেন। যুবকটি বলল।

—কবিরাজ কখন দেখবেন? নোটবই লিখতে লিখতে বলল।

—উনি আয়াচুচো গেছেন। তিনি এসে বলবেন।

—কখন ফিরবেন? হ্যারি বলল।

—তার কিছু ঠিক নেই। অপেক্ষা করুন। যুবকটি বলল।

—এতো মুস্কিলের কথা। শাঙ্কো বলল।

—উপায় নেই। অপেক্ষা করুন। যুবকটি ভেতরে ঢুকে গেল। দুপুর থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। খিদে জলতেষ্টা পাচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল—খিদেও পেয়েছে, জলতেষ্টাও পেয়েছে। এ দুটোর ব্যবস্থা করতে হয়।

ফ্রান্সিস ভেতরের দরজায় গিয়ে আঙ্গুল ঠুকলো। যুবকটি বেরিয়ে এল। বলল—কী ব্যাপার?

—আমরা অনেকক্ষণ না খেয়ে আছি। কিছু খেতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—এটা কি সরাইখানা? যান জল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

একটু পরে বাড়ির কাজের লোক একটা জলভরা মাটির হাঁড়ি নিয়ে এল। হাতে কাচের গ্লাস। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—কে কে জল খাবেন খেয়ে যান।

হ্যারি, শাঙ্কো জল খেয়ে এল। যারা আগে এসেছিল তার মধ্যেও দুজন জল খেয়ে গেল। ফ্রান্সিস হাঁড়ি গ্লাস ফেরৎ দিল।

সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত। দুজন লোক রোগী নিয়ে চলে গেল। ফ্রান্সিসরা বসে রইল।

যুবকটি এল। কোনার টেবিল চেয়ারে বসল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। একে একটু টোকা দিয়ে দেখা যাক। ফ্রান্সিস যুবকটির কাছে এল। যুবকটি বোধহয় ঝিমোচ্ছিল। ফ্রান্সিস সামনের টেবিলে আঙুল ঠুকলো। যুবকটি ধড়ফড়িয়ে উঠল। বলল—আ আ—মানে আপনি কি চান?

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কবিরাজমশাইর দেখা পেতে চাই।

—অসুখটা কি?

—আমাদের কারো কোন অসুখ নেই।

—বলেন কী? তাহলে এসেছেন কেন?

—কবিরাজমশাইর সঙ্গে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে।

—কী এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা?

—আছে—আছে।

—তার মানে?

একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—শুনুন—আমরা ভাইকিং। জাহাজ চালিয়ে দেশ বিদেশে যাই। গুপ্তধন উদ্ধার করি। বদলে একটা স্বর্ণমুদ্রাও নিই না।

—আশ্চর্য তো।

—হ্যাঁ। আমরা এমনিই। একটু থেমে বলল—মাজোর্কার রাজবাড়িতে আছে অতীতের রাজার গুপ্তধন। সেটাই আমরা নক্সা দেখে বুঝে নিয়ে উদ্ধারের চেষ্টা করেছি। কিন্তু ঐ গুপ্তধন আমাদের আগেই কেউ উদ্ধার করে পালিয়েছে।

—আপনারা বুঝতে পেরেছেন কে গুপ্তধন চুরি করেছে?

—হ্যাঁ। আমাদের স্থির বিশ্বাস গুপ্তধন চুরি করেছেন আপনাদের কবিরাজমশাই।

যুবকটি হকচকিয়ে গেল। বলে উঠল—আন্দাজে আমাদের কবিরাজ মশাইর ওপরে দোষ চাপাচ্ছেন।

—আরো আছে—ফ্রান্সিস বলল—আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের দেশের রাজকুমারী। আজ দুপুরের দিকে এক ঘোড়সওয়ার এসে রাজকুমারীকে হরণ করেছে।

—ডাকাত টাকাত হবে।

—না। একটা কুখ্যাত গুণ্ডা। যদি তার লুঠ করারই উদ্দেশ্য হ'ত তাহলে সে ঘরে ঢুকে সোনার চাকতি দামি পাথর লুঠ করে নিত। কিন্তু সে তা করে নি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রাজকুমারীকে হরণ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। এই ঘটনার সঙ্গে কবিরাজমশাইর যোগ আছে।

—কী আজেবাজে বলছেন। যুবকটি বলল।

—যা সত্য তাই বলছি।

—যত সব বাজে কথা। যুবকটি গলা চড়িয়ে বলল। শাঙ্কো যুবকটির গলার ওপর দিয়ে বলল—এই বিরাট বাড়িটা আমাদের খুঁজতে দেবেন?

—কী খুঁজবেন?

—রাজকুমারীকে—আমাদের রাজকুমারীকে।

—সব পাগলের দল।

—এদের পাল্লায় পড়ে আমি না পাগল হয়ে যাই।

—আমরা সেটাই চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনাদের সাহস তো কম নয়। কবিরাজমশাইকে চোর বলছেন। কবিরাজমশাইর কোন ক্ষতি আপনারা করতে পারবেন না। যুবকটি বলল।

—রাজা পাচাকুচির দরবারে আমরা কবিরাজের মুখোশ খুলে দেব।

—কবিরাজমশাইর কত সম্মান আপনারা জানেন না। কোনভাবেই তাঁকে অপদস্ত করতে পারবেন না। বাড়ি যান।

—বাড়ি নয়। সরাইখানা।

—তাহলে সেখানেই যান।

—আমরা কবিরাজমশাইর সঙ্গে দেখা না করে যাব না। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা এখানেই থাকবো। শাঙ্কো বলল।

—ভালো হয় আপনাদের চলে যাওয়া।

—আমাদের ভাল আমরাই বুঝবো।

যুবকটি হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। জোরে ডাকল—ফ্রেডি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদেহী এক ঝাঁকড়াচুলো লোক ঘরে ঢুকল।

ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে যুবকটি বলল—এরা কবিরাজমশাইকে অপমান করবে বলে এসেছে। এদের তাড়িয়ে দে। ফ্রেডি ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। ছোট কুৎকুতে চোখে। তারপর কোমরে গোঁজা তরোয়াল খুলল। ফ্রান্সিসও তরোয়াল খুলল। লক্ষ্য করল ফ্রেডির তরোয়ালটা লম্বায় ওর তরোয়ালের চেয়ে বেশি লম্বা। ফ্রান্সিসের একটু চিন্তা হল। কীভাবে আত্মরক্ষা করবে কীভাবে লড়াই চালাবে তার ছক মনে মনে কষে নিল। শাঙ্কো আর বিস্কোও তরোয়াল খুলল। ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে ওদের মানা করল।

ফ্রেডি একলাফে ফ্রান্সিসের সামনে চলে এল। হাতে খোলা তরোয়াল। ফ্রান্সিস সরে যেতে পারল না। ফ্রেডির তরোয়াল সোজা নেমে এল ফ্রান্সিসের মাথার ওপর। ফ্রান্সিস দ্রুত নিজের তরোয়াল দিয়ে নেমে আসা তরোয়ালটাকে ঠেকাল। তবু ফ্রান্সিস অক্ষত থাকলো না। ফ্রেডির তরোয়াল বাঁ কাঁধ কেটে নামল। রক্ত বেরিয়ে এল। রক্ত দেখে ফ্রান্সিস প্রচণ্ড রেগে গেল। ফ্রেডির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রেডি মার ঠেকাবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। ফ্রান্সিসের তরোয়াল সোজা নেমে এসে ঘা মারল ফ্রেডির বাম বাহুতে। তরোয়াল বাহুতে অনেকটা ঢুকে গেল। ফ্রেডি তরোয়াল ফেলে দিল। ডান হাত দিয়ে বাম বাহুটা চেপে ধরল। ফ্রান্সিসও তরোয়াল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস তরোয়ালের এক কোপে এখন ফ্রেডিকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু ও এবার শান্ত হল। তরোয়াল কোষবদ্ধ করল।

শাঙ্কো ততক্ষণে কোমরের ফেট্টি ছিঁড়ে নিয়ে এল। ফ্রান্সিসের কাটা জায়গায় চেপে বেঁধে দিল। রক্ত পড়া বন্ধ হল।

—ফ্রেডি যাও—যুবকটি বলল।

ফ্রেডি উঠে দাঁড়াল। তরোয়াল কোষবদ্ধ করল। তারপর বাড়ির ভেতরে চলে গেল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে ধরে নিয়ে ফরাসে বসাল। ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই বাইরে ঘোড়ার ডাক শোনা গেল। একটা গাড়ি ঢোকার শব্দ হল। যুবকটি প্রায় ছুটে গেল বাইরের দরজার দিকে।

কবিরাজ ঢুকলেন। একবার ফ্রান্সিসদের ওপর দিয়ে চোখ বোলালেন। কবিরাজের পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা সিল্কের পোশাক। মাথায় হলদে রঙের টুপিমতো, গলায় মুক্তোর মালা। ঘরটায় একটা সুগন্ধ ছড়াল। দাড়ি গোঁফ কামানো। গায়ের রং লালচে।

কবিরাজ ভেতরে চলে গেলেন।

যুবকটি ফরাসের তাকিয়া ঠিকঠাক করল। ওষুধ বোঝাই তাকগুলোতে শিশি বোতল রূপোর কৌটো—এসব গোছগাছ করল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কবিরাজ ঘরে এলেন। পাতা ফরাসের একপাশে কয়েকটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলেন। যুবক ফ্রান্সিসের নাম ডাকলেন। ফ্রান্সিস হাত ঘুরিয়ে বলল আমি সবশেষে। যুবকটি অন্য রোগীকে ডাকল।

কবিরাজ রোগী দেখতে লাগলেন। ওষুধ দিতে লাগলেন। যুবকটি ওষুধ তৈরি করতে লাগল। দিতে লাগল।

রোগী দেখা শেষ হল। রোগীরা চলে গেল। কবিরাজ এবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকালেন। বললেন—আপনাদের মধ্যে রোগী কে?

—আমরা সবাই সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে অনেকক্ষণ না খেয়ে আছি তাই শরীরটা দুর্বল লাগছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? কবিরাজ বলল।

—আপনার সঙ্গে দেখা করবো বলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা তো রোগী নন। তবে আমার কাছে এসেছেন কেন? কবিরাজ বলল।

—আপনার সঙ্গে কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী কথা? কবিরাজ বলল।

—আজ যে সরাইখানায় আমরা আছি সেখান থেকে এক অশ্বারোহী গুন্ডা আমাদের রাজকুমারীকে অপহরণ করেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। কবিরাজ মুখে শব্দ করলেন।

—বোঝা যাচ্ছে কারো নির্দেশে অর্থের বিনিময়ে গুন্ডাটা এই কাজ করেছে। এখন প্রশ্ন কার নির্দেশে এটা ঘটেছে? ফ্রান্সিস বলল।

—কার নির্দেশে? কবিরাজ জানতে চাইল।

—আপনার নির্দেশে। ফ্রান্সিস বলল।

কবিরাজমশাই বেশ চমকে উঠলেন। তারপর সহজভঙ্গীতে বললেন—আমি এসব ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমাকে এসবের সঙ্গে জড়াচ্ছেন কেন? কবিরাজ বলল।

—না জড়িয়ে উপায় নেই বলে। ফ্রান্সিস বলল।

—তার মানে? কবিরাজ বললেন।

—মাজোর্কার রাজা কুয়েক হুয়া পিতামহের রাখা একটা নক্সা পেয়েছিলেন। নক্সাটার গুপ্তধনের অবস্থিতির নির্দেশ আছে। আপনি বেশ চিন্তাভাবনা করে গুপ্তধন আবিষ্কার করেছিলেন। একদিন রাজাকে দেখে যদিও সেদিন আপনার যাওয়ার কথা ছিল না—আপনি অতিথি ঘরে ছিলেন। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—গভীর রাতে একটা থলেতে রাখা বহুমূল্যবান গুপ্তধন বের করে নিজের থলেতে ভরে নিয়ে খুব ভোরে রাজবাড়ি থেকে চলে এসেছিলেন। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—কীভাবে আপনি গুপ্তধন চুরি করেছিলেন সবই বললাম। ফ্রান্সিস বলল।

কবিরাজ বলে উঠলেন—সব মিথ্যে অভিযোগ।

—একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিস বলল—আপনার এই প্রাসাদের মত বাড়ি শুধু কবিরাজী করে হয় না। এর জন্যে যথেষ্ট ধনসম্পদ লাগে। সেই ধনসম্পদ আবিষ্কার করে আপনি রাজা কুয়েক হুয়াকে কিছু বলেন নি। রাজার চিকিৎসাও আর করেন নি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—প্রয়োজন নেই বলে যাই নি। কবিরাজ বললেন।

—তা তো বটেই। কার্যোদ্ধার হয়ে গেছে। কাজেই অসুস্থ রাজাকে আর দেখতে যান নি। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটা আমার খুশি। কবিরাজ বললেন।

—তা তো বটেই। এবার ফ্রান্সিস বলল—আপনার বিরুদ্ধে আমাদের আরো অভিযোগ আছে।

—আমি আর শুনতে চাই না। কবিরাজ বলল।

—আপনাকে শুনতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনাদের তাড়াতে হবে। এবার যুবকটি বলল।

ফ্রেডিকে ডাকো তো। কবিরাজ বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—আপনার ফ্রেডি এখন বিছানায় শুয়ে গোঙাচ্ছে।

—তার মানে? কবিরাজ বললেন।

—তার মানে আমি বলছি। ফ্রান্সিস যুবকটিকে দেখিয়ে বলল—ইনি আমাকে শায়েস্তা করার জন্যে ফ্রেডিকে দিয়ে আমাদের তাড়াতে চেয়েছিলেন। ফ্রেডির সঙ্গে কাজেই আমাদের তরোয়ালের লড়াই হয়েছিল। ফ্রেডি হেরে গিয়েছিল। আমি তাকে হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি। বাহুতে তরোয়ালের ঘা খেয়ে ফ্রেডি আহত হয়েছে মাত্র।

—ও। আপনারা অনেক দূর এগিয়েছেন। কবিরাজ বললেন।

—হ্যাঁ। এবার আমাদের রাজকুমারীকে মুক্তি দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি এই ব্যাপারে কিছুই জানি না। কবিরাজ বললেন।

—উঁহু। এই ব্যাপারটার সঙ্গে আপনি জড়িত। আপনি সব জানেন। রাজকুমারীকে আমরা উদ্ধার করবই। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ সেই চেষ্টাই করুন। কবিরাজ যেন খেঁকিয়ে উঠলেন।

—হ্যাঁ তাই করছি। তবে আপনাকেও আমরা ছাড়ছি না। তার জন্যে এখানে যদি থাকতে হয়—থাকবো। ফ্রান্সিস একটু থেমে বলল—আমরাও যাচ্ছি।

ফ্রান্সিস কবিরাজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে হ্যারি বলল— এখন কী করবে?

—কবিরাজের এই বাড়ির ওপর নজর রাখতে হবে আমাদের। পালা করে নজর রাখতে হবে। কে বা কারা যাচ্ছে কারা আসছে—আমাদের সব দেখতে হবে। থাক গোপনে কথা হবে। এখন জলতেষ্টা পেয়েছে, খিদেও পেয়েছে। সরাইখানায় চল।

—তার আগে এখানে একটা কাজ আছে।

—কী কাজ? শাঙ্কো বলল।

—কবিরাজের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে ঐ দেখ একটা ফুলের দোকান। দোকানটায় এসো। হ্যারি বলল।

ফ্রান্সিসরা ঐ ফুলের দোকানে এল। ফুলওয়ালা ওদের দিকে এগিয়ে এল। বলল—খুব কম দামে ফুল পাবেন।

হ্যারি বলল—আমরা ফুল কিনতে আসিনি। একটা ব্যাপারে কথা আছে আপনার সঙ্গে।

—কী কথা? ফুলওয়ালা বলল।

জানলার ধারের জায়গাটা দেখিয়ে হ্যারি বলল—এখানে তো কিছু থাকে না।

—না। ফুলওয়ালা বলল।

—আপনি রাত্রে দোকানে থাকেন? হ্যারি জানতে চাইল।

—না বাড়িতে থাকি। আমার বাড়ি এখান থেকে ধরুন গে—

ফুলওয়ালাকে থামিয়ে দিয়ে হ্যারি বলল—এবার আপনাকে একটা অনুরোধ—ঐ জায়গাটুকুতে আমরা একটা চৌকি পাতব। দিনে রাতে আমরা একজন একজন করে থাকবো।

—কেন বলুন তো? ফুলওয়ালা বলল।

—সেটাই এখন বলতে পারব না। কয়েকদিন পরে সময়মত বলব। হ্যারি বলল। তারপর শাঙ্কোর দিকে হাত বাড়াল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা সোনার চাকতি বের করে দিল। হ্যারি সোনার চাকতিটা ফুলওয়ালার দিকে বাড়িয়ে ধরল। ফুলওয়ালা অবাক। বলল—মানে—আমি ঠিক—ওকে থামিয়ে দিয়ে হ্যারি বলল—এটা রাখুন। সময়মত আপনাকে সব বলা হবে। তার আগে কোন প্রশ্ন করবেন না। ফুলওয়ালা সোনার চাকতি পেয়ে খুব খুশি। হ্যারি বলল—একটা

কাঠের তক্তা ওখানে রাখবেন। আমরা আসবো বসবো। রাত্রেও থাকবো। আমরাই রাত্রে আপনার পাহারাদারের কাজ করবো।

—ঠিক আছে।—ঠিক আছে। ফুলওয়ালা হাসতে হাসতে বলল।

—এখন চলি। আজ সন্ধ্যে থেকে আমাদের লোক আসবে থাকবে। ঠিক আছে। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। ফুলওয়ালা একগাল হাসল।

ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় এল। ওরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। ঘরে এসে বসল সবাই। ফ্রান্সিস পাহারার জন্যে সবাইকে দায়িত্ব দিল। বলল—সকালে আমি যাবো। দুপুরে বিস্কো। সন্ধ্যে থেকে রাত—হ্যারি। তারপর—শাঙ্কো বলে উঠল—রাত থেকে সারারাত আমি। কাজ ভাগ করে দেওয়া হল। এবার কাজে নামা।

সন্ধ্যেবেলা হ্যারি ফুলের দোকানে গেল। দেখল ফুলওয়ালা ব্যবস্থা করেছে। একটা উঁচু পাটাতন এনে রেখেছে। ফুলওয়ালা হেসে বলল—আসুন—আসুন। হ্যারি গিয়ে পাটাতনটায় বসল। সামনেই একটা ছোট জানলা। জানলা দিয়ে কবিরাজের বাড়ির রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া সবই দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে ভালো নজরদারি চলবে। হঠাৎই দেখল কবিরাজের দারোয়ান বাড়ির বাইরে এল। একটু এদিক ওদিক ঘুরে ভেতরে চলে গেল। তাহলে আমাদের খুব সাবধানে নজর রাখতে হবে।

হ্যারি পাটাতনে আধশোয়া হল। বাইরে নজর রাখল। কবিরাজের বাড়ির রাস্তা গাড়ি ঘোড়া লোকজন দেখতে লাগল।

একটু রাতের দিকে হঠাৎ দেখল কবিরাজের বাড়ি থেকে একটা চারঘোড়ায় টানা গাড়ি বেরিয়ে এল। রাস্তায় এল। তারপর দ্রুত রাস্তা দিয়ে ছুটল। গাড়িতে দুজন লোককে দেখল। একজন কবিরাজ অন্যজনকে চিনল না। দুজনেই সন্ধ্যেবেলার শৌখিন পোশাক পরেছে।

এইবার হ্যারি ভাবল—কবিরাজ গাড়ি ছাড়া বেরুবে না। গাড়ি ছাড়া কবিরাজকে অনুসরণ করা যাবে না। একটা গাড়ি চাই।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো এল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি কেমন নজর রেখেছিলে?

—ভালোই নজর রেখেছি। কিন্তু সমস্যা আছে একটা। কবিরাজ গাড়ি ছাড়া বেরোয় না। আজকে কিছুক্ষণ আগে কবিরাজ আর একজন গাড়িতে বসেছিল। চলে গেল। কেন কাকে কোথায় নিয়ে গেল কিছুই বুঝলাম না।

—হ্যাঁ এই সমস্যাটা হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাই বলছিলাম আমরাও একটা ঘোড়ার গাড়ি সারা দিন রাতের জন্য ভাড়া করে রাখি। তাহলে সহজে কবিরাজের গাড়ি অনুসরণ করতে পারি। তাহলে কবিরাজ কোথায় গেল জানতে পারবো। হ্যারি বলল।

—দাঁড়াও ঐ বেস্টনাট গাছের নীচে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। চলো কথা বলে আসি। ফ্রান্সিস বলল।

ওরা বেস্টনাট গাছের নীচে এল। গাড়োয়ান গাড়ির মধ্যে বসার জায়গায় শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস ডাকল—ও ভাই শুনছো?

গাড়োয়ানের ঘুম ভেঙে গেল। ও ধড়ফড় করে উঠে বসল। হ্যারি বলল—

—ভাই বাইরে এসো। কথা আছে। গাড়োয়ান গাড়ি থেকে নামল।

ফ্রান্সিস বলল—কয়েকদিনের জন্যে তোমার গাড়িটা আমরা ভাড়া করবো। তুমি রাজি কিনা বল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ভাড়া খাটবো। কিন্তু কোনসময় আর কতদিন।

—ধরো কাল থেকে পাঁচদিন।

—সারা দিন?

—হ্যাঁ—সারা দিনরাত।

—ঠিক আছে।

—আজ এখন থেকেই। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। গাড়োয়ান মাথা ওঠানামা করল।

তখনই কবিরাজের বাড়ির সদর দেউড়িতে একটা দুই ঘোড়াটানা গাড়ি এসে থামল। দারোয়ান দরজা খুলে দিল। গাড়িতে দুজনে বসে আছে। একজন স্ত্রীলোক। গাড়ি বাইরে রেখে ওরা নামল। কবিরাজের বাড়িতে ঢুকল।

তখনই শাঙ্কো এল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে সব বলল। গাড়োয়ানকে কিছু দিতে বলল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা সোনার ছোট চাকতি বের করে গাড়োয়ানকে দিল। গাড়োয়ান খুব খুশি।

শাঙ্কো বলল—তোমরা একটা গাড়িতে যাদের দেখলে তার মধ্যে রাজকুমারী নেই তো?

—না নেই। হ্যারি বলল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—এবার কবিরাজের গাড়ি অনুসরণ করা যাবে। তবে গাড়িতে বসে সারা দিনরাত নজর রাখা যাবে না। কবিরাজের দারোয়ানের মনে সন্দেহ হতে পারে। মাঝে মাঝে গাড়িটা চড়ে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে আনতে হবে।

—ফুলের দোকান থেকেও নজর রাখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—শাঙ্কো গাড়োয়ানের কাছে এসে বলল—শোন ভাই। আমি এই ফুলের দোকানে থাকবো। কোন গাড়িকে অনুসরণ করতে হলে তোমাকে ডাকবো। তুমি সবসময় তৈরি থাকবে।

গাড়োয়ান মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

—তাহলে—শাঙ্কো আমরা যাচ্ছি। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরা যেভাবে আটঘাট বেঁধে এগোচ্ছি রাজকুমারীকে ঠিক উদ্ধার করবো। শাঙ্কো আস্তে বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারি চলে গেল।

শাঙ্কো ফুলের দোকানে ঢুকল। ফুলওয়ালা হেসে বলল—আসুন আসুন। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

শাঙ্কো কাঠের পাটাতনটা একটু ডানদিকে ঠেলে রাখল। জানলা দিয়ে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে যে গাড়িটি এসেছিল একজন সুসজ্জিত পুরুষ আর এক স্ত্রীলোক সেও সুসজ্জিতা এসে সেই গাড়িতে উঠল। গাড়ি ছাড়ল। চলল পূবমুখো।

শাঙ্কো পাটাতনে আধশোয়া হল।

রাত বাড়তে লাগল।

একটু রাতেই কবিরাজের গাড়ি এল। দরোয়ান বড় দরজাটা খুলে দিল। গাড়ি ভেতরে ঢুকল। শাঙ্কো দেখল—কবিরাজ একা। তার সঙ্গীটি আসেনি।

শাঙ্কো তারপর সারা রাত পাটাতনে শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগল।

সেইরাতে আর কেউ কবিরাজের বাড়ির বাইরে বেরোল না—ঢুকলোও না।

ভোর হল। ফ্রান্সিস হ্যারি এল। শাঙ্কোকে বলল—মারিয়াকে দেখলে?

—না। শাঙ্কো বলল।

—ভোগাবে। কবিরাজ জানে আমরাই একমাত্র ওর গুপ্তধন চুরির ব্যাপারটা জানি। কাজেই যেমন করে হোক আমাদের এ দেশ ছাড়তে বাধ্য করবে। আমরা মারিয়াকে উদ্ধারের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকবো কাজেই রাজা বা মন্ত্রীকে তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে সময় পাব না। আমাদের একমাত্র কাজ হবে মারিয়াকে উদ্ধার করা। কাজেই মারিয়াকে বন্দী করে রেখে আমাদের মুখ বন্ধ করতে চায়। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে রাজা বা অমাত্যদের কাউকে আমরা কিছু বলতে সাহস পাব না। যদি বলতে যাই রাজকুমারীর বন্দীদশার কথা তাহলে কবিরাজ রাজকুমারীকে হত্যা করতে পারে। কবিরাজ সাংঘাতিক লোক। কাজেই খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। হ্যারি বলল।

শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

—নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে। মারিয়ার কোন হদিশ করতেই হবে। প্রয়োজনে কবিরাজের বাড়িতেও ঢুকবো। মারিয়াকে খুঁজে বের করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যারি বলল—রাজকুমারীকে অন্য কোথাও রাখতে পারে?

—হ্যাঁ। পারে। তাই কবিরাজের গাড়ির পেছনে আমাদের গাড়ি চালাতে হবে। একটা সূত্র নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

কবিরাজের বাড়ির দিকে ফ্রান্সিসরা নজরদারি চালাল।

কোথাও বেরোল না। তার যত যাওয়া আসা সন্ধ্যে থেকে রাত পর্যন্ত। সেদিন সন্ধ্যের কিছু পরে কবিরাজ গাড়িতে চেপে বের হল। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল ঘোড়ার গাড়ির দিকে। গাড়োয়ান নিজের জায়গায় বসে ঝিমোচ্ছিল। হ্যারি এসে বলল—ভাই —জলদি গাড়ি চালাও। হ্যারি উঠে বসতে বসতে গাড়োয়ান গাড়ি চালাল।

হ্যারি সীট থেকে উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আস্তে বলল—সামনের গাড়িটার পেছনে পেছনে চালাও। দরজা বন্ধ করে হ্যারি সীটে বসল।

দুটো গাড়িই চলল।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর কবিরাজদের গাড়িটা একটা বড় বাড়ির সামনে এল। দাঁড়াল। হ্যারি গাড়োয়ানকে আস্তে গাড়ি থামাতে বলল। একটু দূরে হ্যারির গাড়ি থামল।

হ্যারি মুখ বাড়িয়ে দেখল—কবিরাজ নামল। সঙ্গে একজন মহিলাও নামল। বাড়ির বাইরের আলোতে দেখে বুঝল রাজকুমারী নয়।

কবিরাজ আর মহিলাটি বাড়িতে ঢুকে গেল।

হ্যারি অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরে ভাবল এটা কার বাড়ি সেটা জানা যাক।

হ্যারি গাড়ি থেকে নেমে এল। দেখল চারিদিক অন্ধকার। একমাত্র ঐ বাড়িটার বাইরের ফটকে আলো আছে। সেই আলোতেই দেখল সামনে এক পোশাকের দোকান। হ্যারি দোকানে ঢুকল। একজন যুবক হাসিমুখে এগিয়ে এল। হ্যারি বলল—আমি পোশাক কিনবো না। একটা কথা জানতে এলাম—

—বলুন— কী কথা? লোকটি বলল।

হ্যারি বাড়িটা দেখিয়ে বলল—এটা কার বাড়ি?

—মাননীয় সেনাপতির বাড়ি।

—ও। ঠিক আছে।

হ্যারি দোকানের বাইরে এল। হ্যারি বুঝল—কবিরাজ আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। যদি বিদেশীরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাই সেনাপতিকে ভুল বোঝাবে। ফ্রান্সিসদের অভিযোগ ধোপে টিঁকবে না।

ফিরে এসে হ্যারি গাড়িতে বসল।

কবিরাজ ও মহিলাটি বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এল। গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলল। পেছনে হ্যারির গাড়িও চলেছে।

কবিরাজের গাড়ি পূবমুখো চলল। পেছনে হ্যারির গাড়িও চলল।

একটা বেশ বড় বাড়ির সামনে এসে কবিরাজের গাড়ি থামল।

কবিরাজ আর মহিলাটি নামল। বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

হ্যারি গাড়ি থেকে নামল। একটু এদিক ওদিক ঘুরছে তখনই একজন লোককে আসতে দেখল। হ্যারি বলল—একটা কথা বলছিলাম।

—বলুন। লোকটি বলল।

—এই বাড়িটা কার বাড়ি?

—ও। এটা তো মাননীয় মন্ত্রীমশাইয়ের বাড়ি।

—ও। হ্যারি মুখে শব্দ করল। ফিরে এসে গাড়িতে বসল। তাহলে বোঝা যাচ্ছে কবিরাজই গুণ্ডা লাগিয়ে রাজকুমারীকে অপহরণ করিয়েছে। এবার মন্ত্রী ও সেনাপতিকে হাতে রাখছে। গুপ্তধন চুরি রাজকুমারীকে অপহরণ এইসব নিয়ে কথা উঠলে মন্ত্রী ও সেনাপতিই তাকে রক্ষা করবে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কবিরাজ ও মহিলাটি বেরিয়ে এল। গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলল। পেছনে হ্যারির গাড়ি।

কবিরাজ আর কোথাও গেল না। সোজা বাড়ি ফিরে এল। হ্যারিও ফিরে এল।

কবিরাজের গাড়ি তার বাড়িতে ঢুকে গেল। হ্যারি কিছুদূরে গিয়ে গাড়ি থামাল। গাড়ি থেকে নামল।

ফুলের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। তবে দোকানের তালার চাবি ফুলওয়ালা ফ্রান্সিসদের দিয়ে রেখেছিল। হ্যারি তালা খুলে দোকানে ঢুকল। পাতা পাটাতনে বসল। তারপর শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ বাইরে শাঙ্কোর গলা শুনল—হ্যারি। হ্যারি দোকানের দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো এসেছে।

হ্যারি—কী খবর বলো। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি ওর অভিজ্ঞতার কথা বলল। তারপর বলল—এখন আমার মনে হয়, কবিরাজই নিজের বাড়িতে রাজকুমারীকে বন্দী করে রেখেছে।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আমি কবিরাজের বাড়িতে ঢুকবো। মারিয়াকে খুঁজবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মারিয়াকে কবিরাজ নিজের বাড়িতেই বন্দী করে রেখেছে।

—আজ রাতেই যাবে? হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ আজ রাতেই। আমি একাই যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—না, না শাঙ্কোকে নিয়ে যাও। হ্যারি বলল।

—যদি মারিয়াকে পাই তাহলে ওকে নিয়ে পালিয়ে আসতে হবে। তখন একা মারিয়াকে নিয়ে পালাতে কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু শাঙ্কো গেলে একটা বাড়তি দায়িত্ব।

শাঙ্কো বলল—ঠিক আছে ফ্রান্সিস তুমি যা সুবিধেজনক মনে হবে তাই কর।

ফ্রান্সিস কোমরের তরোয়ালটা ভালো করে কোমরে গুঁজল। তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বড় রাস্তাটা পার হল। আকাশে আধ ভাঙা চাঁদ। তাই জ্যোৎস্না খুব উজ্জ্বল নয়। কবিরাজের বাড়ির পেছনদিকে গেল। দেখল এখানেও একটা প্রবেশদ্বার লোহার তৈরি। ফ্রান্সিস প্রবেশদ্বারের কাছে গেল। দেখল। ওঠা যাবে। পারও হওয়া যাবে।

এবার আস্তে আস্তে প্রবেশদ্বারে উঠতে লাগল। প্রবেশদ্বারের মাথায় চড়ল। লোহায় ঘষা লেগে ফ্রান্সিসের হাতে পায়ে কিছু জায়গা কেটে গেল। যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু ফ্রান্সিস আমল দিল না। একটা বাগানে লাফ দিয়ে পড়ল। বাগানের গাছগাছালিতে জায়গাটা বেশ অন্ধকার।

ফ্রান্সিস সামনের দিকে তাকাল। পাথরে তৈরি খাড়া দোতলা। ফ্রান্সিস বাগানের মধ্যে দিয়ে সদর দরজায় এল। ফ্রান্সিস আস্তে দরজাটা ধাক্কা দিল। দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। ফ্রান্সিস দেখল এটা কবিরাজের রোগী দেখার ঘর। কিছুটা এগোতেই একটা দরজা। ভেজানো। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে দরজাটা একটু খুলল। দেখল এটা রাঁধুনীদের ঘর। দুজন শুয়ে আছে। একজন বাড়ির আলোতে মাথায় চিরুনি চালাচ্ছে।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সরে এল। সামনেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। ফ্রান্সিস দোতলায় উঠতে লাগল। দোতলায় উঠে দেখল—পরপর তিনটে ঘর।

প্রথমে ফ্রান্সিস প্রথম ঘরের সামনে এল। দরজা বন্ধ। একটু এগিয়েই একটা জানালা। আধখোলা। ফ্রান্সিস দেখল—ঘরটি সুন্দর সুসজ্জিত। মেঝেয় কার্পেট পাতা। দুটো বিছানা। দুজন শুয়ে আছে। অঘোরে ঘুমচ্ছে। কবিরাজ ও তার পত্নী।

ফ্রান্সিস আরো এগোল। আবার একটা ঘর। ফ্রান্সিস দেখল দরজাটা একটু ফাঁক। ফ্রান্সিস আঙ্গুল দিয়ে দরজার ফাঁক বাড়াল। তখনই একেবারে মুখোমুখি এক গুণ্ডার। গুণ্ডাটা জল খাচ্ছিল। ফ্রান্সিসকে দেখে লাফিয়ে উঠল। সেইসঙ্গে চিৎকার—কে? কে? ওখানে? আর এক গুণ্ডা ঘুমিয়ে ছিল। আগের গুণ্ডার চিৎকার শুনে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস ভাবল—পালাবো। পরক্ষণেই ভাবল মারিয়া এই বাড়িতেই আছে কিনা সেটা জানতে হয়।

ততক্ষণে দুই গুণ্ডা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসও তরোয়াল খুলল। এক গুণ্ডা বলল—তুই কী চাস?

ফ্রান্সিস বলল—তোদের মুণ্ডু।

—তবে রে। একটা গুণ্ডা চেঁচিয়ে বলল।

—আয় তোরা তো কবিরাজমশাইর পোষা গুণ্ডা। তোরা এখানে বহাল তবিয়তে আছিস।

দুটো গুণ্ডাই ফ্রান্সিসকে আক্রমণ করল। ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে ওদের মার ঠেকাতে লাগল। আক্রমণ করল না। তরোয়ালের লড়াই চলল।

ফ্রান্সিস শেষ ঘরটার কাছে এল। উচ্চস্বরে তরোয়াল চালাতে চালাতে ডাকল—মারিয়া—মারিয়া। ঘরটা থেকে কোন শব্দ শুনল না। লড়াই চালাতে চালাতে ফ্রান্সিস আবার হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকল—মারিয়া। মারিয়া। বন্ধ ঘরটা থেকে মারিয়ার দুর্বল গলা শোনা গেল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এবার গুণ্ডাদুটোকে আহত করতে হয়। ফ্রান্সিস এবার একজন গুণ্ডাকে আক্রমণ করল। এতক্ষণ ফ্রান্সিস তরোয়ালের মার ঠেকিয়ে যাচ্ছিল। তাই গুণ্ডারাও ভেবেছিল—ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাতে জানে না।

ফ্রান্সিস প্রথমেই মাথায় কালো কাপড়ের ফেট্টি বাঁধাকে ধরল। ও প্রায় লাফিয়ে এসে মাথায় ফেট্টি বাঁধার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কালো ফেট্টি কিছু বোঝবার আগেই ফ্রান্সিস ওর ডান কাঁধে তরোয়ালের কোপ বসাল। তরোয়াল বসে গেল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা খুলে নিল। কালো ফেট্টি গুণ্ডা বাঁ হাত দিয়ে ডান কাঁধটা ধরে বসে পড়ল।

অন্য গুণ্ডাটার সঙ্গে ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ লড়ল। তারপর অতি দ্রুত একটা পাক খেয়ে প্রচণ্ড জোরে তরোয়াল চালাল। গুণ্ডাটার ঊরুতে তরোয়ালের ঘা পড়ল। ও বসে পড়ল।

ফ্রান্সিস হাঁপাতে লাগল। তখনই বারান্দার অন্ধকার কোনার দিক থেকে কবিরাজের গম্ভীর গলা শুনল।

—তাইলে বর্শার এই মার সামলাও। কবিরাজ বর্শা ছুঁড়লেন। ফ্রান্সিস মাথা নামাতে নামাতে বর্শাটা ওর ঘাড় ছুঁয়ে গেল। কাটা জায়গা থেকে রক্ত পড়তে লাগল। ফ্রান্সিস বর্শাটা তুলে নিল। বলল—এইবার আপনি সামলান। ফ্রান্সিস দেহের সমস্ত

শক্তি নিয়ে বর্শা ছুঁড়ল। অন্ধকারের মধ্যেও নিখুঁত নিশানা। বর্শাটা কবিরাজের বুকে গেঁথে গেল। কবিরাজ উল্টে মেঝেয় পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ মাথা এপাশ ওপাশ করতে করতে মারা গেল।

দুই গুণ্ডা তখন মেঝেয় শুয়ে আছে। একজন গোঙাচ্ছে। অন্যটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে চেষ্টা করছে।

ফ্রান্সিস ওদের কাছে এল। তরোয়াল কোমরে গুঁজতে গুঁজতে। মাথায় কালো ফেট্টিওয়ালাকে বলল—যদি বাঁচতে চাও ঐ ঘরের চাবিটা দাও। কালো ফেট্টিওয়ালা বলল—আমার কাছে নেই। ফ্রান্সিস অন্যটিকে বলল—চাবি কোথায়?

—আমি জানি না।

—তাহলে তো উপায় নেই তোমাদের দুজনকেই হত্যা করতে হয়।

ফ্রান্সিস তরোয়ালের ডগাটা কালো ফেট্টিওয়ালার গলায় ঠেকাল। বলল— চাবি দাও। নইলে মরবে।

ফ্রান্সিস তরোয়ালের চাপ বাড়াল। বলল—তাহলে তুমি মরতে চাও। বেশ—ফ্রান্সিস তরোয়ালটা কালো ফেট্টির গলায় কিছুটা ঢোকাল। কালো ফেট্টি দুহাত তুলে বলল—দিচ্ছি। আমাকে ছেড়ে দিন।

—আগে চাবি চাই। ফ্রান্সিস বলল।

কালো ফেট্টি কোমর থেকে একটা চাবির গোছা বের করল।

দেখে দেখে ফ্রান্সিসকে চাবিটা দেখাল? ফ্রান্সিস চাবির গোছাটা নিয়ে শেষ ঘরটার কাছে গেল। গলা চড়িয়ে বলল—মারিয়া—আমরা এসেছি। দরজা খুলে দিচ্ছি।

ফ্রান্সিস দরজা খুলে দিল। মারিয়া কেঁদে ফেলল। —এখন কান্না নয়। চলো।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে হাত ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামাল। সদর দরজার কাছে এল। দারোয়ান হাঁ হাঁ মুখে শব্দ করতে করতে ফ্রান্সিসদের সামনে এল। বর্শা তুলল। তোমরা চোর।

—তোমার প্রভু কবিরাজমশাই অনেক বড় চোর। ফ্রান্সিস বলল—দরজাটা খুলে দাও।

—না। আমি দরজা খুলবো না।

—মিছিমিছি কথা বাড়াচ্ছো। বাড়ির দোতলায় ওঠ। দেখবে কবিরাজ মারা গেছে গুণ্ডা দুটো এখনও গোঙাচ্ছে।

—না। আমি দরজা খুলবো না।

—অগত্যা তোমাকে একটু আহত করতে হয়। ফ্রান্সিস তরোয়াল খুলল। দারোয়ান বর্শা তুলল। তখনই ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাল। বর্শা দু'টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল।

—এবারে দরজা খোল। ফ্রান্সিস বেশ কড়া গলায় বলল।

দারোয়ান এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল। ও তখনও ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল। অবাক লাগল ওর বর্শাটা এত হালকা?

মারিয়ার হাত ধরে ফ্রান্সিস রাস্তায় এল। ফুলের দোকান থেকে হ্যারি শাঙ্কোরা ছুটে এল। হ্যারি মারিয়াকে বলল—রাজকুমারী আপনি সুস্থ আছেন তো?

—না। জ্বরটরে ভুগেছি। তবে এখন আমার শরীর ভালো হয়ে যাবে। রাজকুমারী একটু ম্লান হেসে বলল।

ফ্রান্সিসরা যখন সরাইখানায় ফিরে এল তখন ভোর হয় হয়। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া তুমি ঘুমিয়ে নাও। মারিয়া চলে গেল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি তুমি যতক্ষণ পারো ঘুমিয়ে নাও। সবাই যতটা পারো ঘুমোও, বিশ্রাম নাও। আমি আর শাঙ্কো ঘোড়াভাড়া করতে যাচ্ছি। তিনটে ঘোড়াতেই আমাদের হয়ে যাবে। একটু বেলায় খেয়ে নেবো। তারপর ঘোড়া চালিয়ে সন্ধ্যে নাগাদ আয়াচুচো পৌঁছব। রাতটা বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা। সারারাত ঘোড়া চালাবো। সকালে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেল নাগাদ পিসকো বন্দরে পৌঁছব।

ফ্রান্সিসের নির্দেশ মেনে সবাই যখন পিসকো বন্দরে পৌঁছল সূর্য ডোবে ডোবে।

জাহাজঘাটায় ভাইকিং বন্ধুরা কয়েকজন জাহাজের রেলিং ধরে গল্পগুজব করছিল। একজন ভাইকিং ঘোড়ায় চড়ে আসা ফ্রান্সিসদের দূর থেকে দেখল। ও চিৎকার করে বলল—ভাইসব ফ্রান্সিসরা আসছে।

ফ্রান্সিসরা জাহাজঘাটায় এল। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—এবারও আমার হাত শূন্য।

—তোমরা অক্ষত ফিরে এসেছো এতেই আমরা খুশি। ভেন বলল।

—o—

স্বর্ন খনির রহস্য

স্বর্ন খনির রহস্য
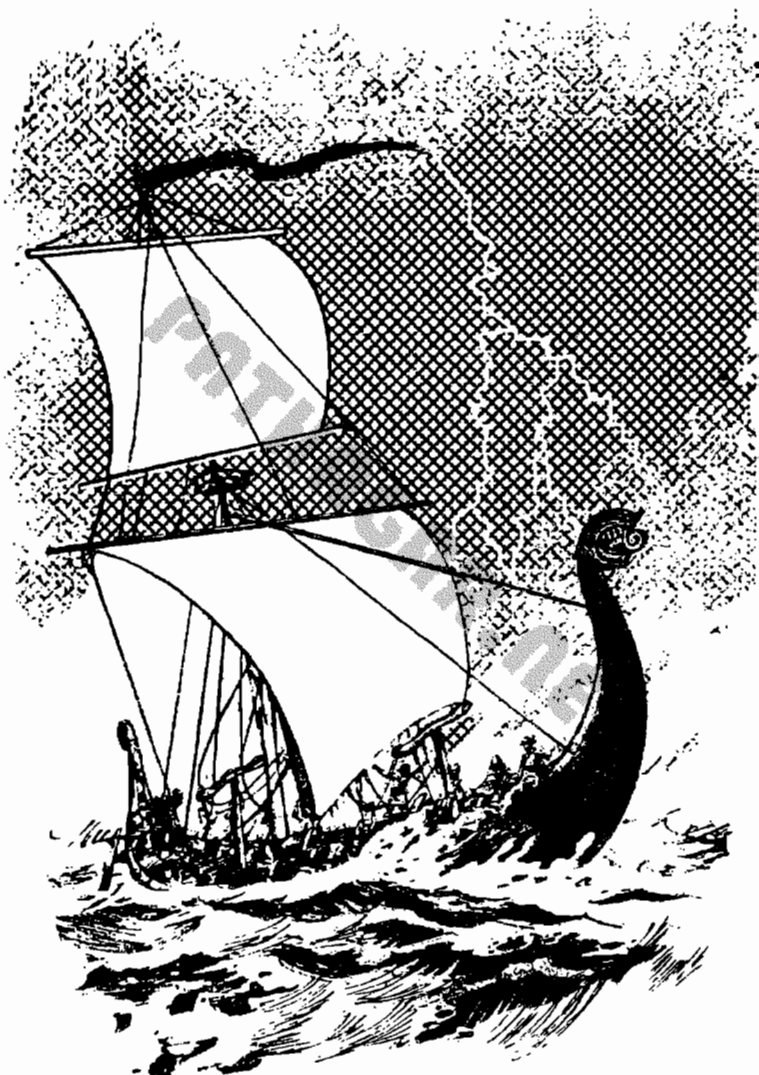
তখন দুপুর। ফ্রান্সিসরা সবেমাত্র খাওয়া-দাওয়া সেরেছে তখন। আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে। জাহাজ চলেছে। মেঘ দেখেই পেড্রো বুঝল প্রচণ্ড ঝড় আসছে। পেড্রো মাস্তুলের মাথা থেকে নেমে এল। ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস শুয়ে ছিল। ফ্রান্সিস বলল—পেড্রো কী হয়েছে?

—প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি আসছে। তুমি ডেক-এ এসো।

—চলো। ফ্রান্সিস উঠে পড়ল। দ্রুতপায়ে ছুটল। ডেকে-এ উঠে এল। ভাইকিং বন্ধুরা এখন ডেক-এ দাঁড়িয়ে আছে। বাতাস পড়ে গেছে। চারদিকের সমুদ্রে প্রায় অন্ধকার নেমে এসেছে। ফ্রান্সিস সমুদ্রের চারদিক দেখে নিল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব ঝড়বৃষ্টি আসছে। পাল নামাও। তারপর ডেক-এ এসে ঝড়ের মোকাবিলা কর।

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতেই ভাইকিং বন্ধুরা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একদল দড়িদড়া খুলে পাল নামাতে লাগল। চারপাঁচজন মাস্তুলে বাঁধা দড়িদড়া খুলতে লাগল। অনেকটা করে দড়ির প্যাঁচ খুলে এল। সেই মোটা দড়িগুলো ধরে কিছু ভাইকিং তৈরি হয়ে দাঁড়াল।

কয়েকজন দাঁড়ঘরে গেল। দাঁড়গুলো আসনের সঙ্গে বেঁধে রেখে এল। ঝড়ের ধাক্কায় দাঁড়গুলো ভাঙবে না।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। যেন কালো আকাশটাকে চিরে ফেলছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ তুলে ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসদের জাহাজের ওপর। ফেনিল জল ডেক-এর ওপর দিয়ে গিয়ে অন্যপাশে পড়তে লাগল। তার সঙ্গেই বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি শুরু হল। একটু পরেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

ডেক-এর ওপর দিয়ে কোনওরকমে হেঁটে ফ্রান্সিস ফ্লেজারের কাছে এল। ফ্লেজার হুইল এদিক ওদিক ঘোরাতে ঘোরাতে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল।

ফ্রান্সিস হুইল ধরে দাঁড়ানো জাহাজ চালক ফ্লেজারকে বলল—সাবধান—জাহাজ যেন ডোবে না। কথাটা এই প্রচণ্ড ঝড়ে ফ্লেজার শুনতে পেল না। ফ্রান্সিস বুঝল সেটা। ফ্রান্সিস এবার ফ্লেজারের কানের কাছে মুখ এনে কথাটা আবার বলল। ফ্লেজার হাতটা একটু উঠিয়ে বলল—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস কথাটা শুনল না। কিন্তু বুঝতে পারল।

ডেক-এর ওপর দাঁড়িয়ে কয়েকজন ভাইকিং মাস্তুলে বাঁধা মোটা মোটা দড়িদড়া টেনে ধরে রইল। ওরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—জাহাজ ডুবতে দেবে না।

কিছুক্ষণ পরে বাতাসের বেগ কমল। তারপরেই বৃষ্টি কমল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাওয়ার সেই তেজ আর রইল না।

ভাইকিংরা ডেক-এর ওপর পড়ে আছে। সারা গা ভেজা যেন চান করেছে। একজন দু'জন করে সবাই উঠে দাঁড়াতে লাগল। ফ্রান্সিসও মাস্তুলে টানা কাছিতে হাত লাগিয়েছিল। ওরও অবস্থা বন্ধুদের মতই, ফ্রান্সিস কেবিনঘরের দিকে চলল। জাহাজ একটা দ্বীপের কাছে চলে এসেছে।

সন্ধ্যের পরে হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস তখন বিছানায় আধশোয়া। মারিয়া কীসব সেলাই করছিল। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

—কোথায় এলাম এটা সবকিছুর আগে জানা দরকার। নইলে হিসেবে গণ্ডগোল হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তা তো ঠিকই। তাহলে আজকে তো আর তীরে নামছো না। হ্যারি বলল।

—না। আজকের রাতটা কাটুক। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। তাহলে কালকে খোঁজ নিতে যাবে। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে কথা বলে সব জানতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটাই ভাল হবে। চলি। হ্যারি চলে গেল।

পরের দিন সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে যাচ্ছে তখনই মারিয়া বলল—তুমি কী স্থির করেছো?

—কী স্থির করেছি সেটা বলার সময় এখনো আসে নি। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া একটু অভিমানভরে বলল—তুমি তো আমাকে আগে থেকে কিছু বলো না।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—এ তোমার অনর্থক অনুযোগ, অভিমান। তোমাকে না জানিয়ে কোন কাজ আমি করি?

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে করো। মারিয়া বলল।

—এ তোমার ভুল বোঝা। এসব নিয়ে মিছিমিছি মন খারাপ করো না। আমি যা ঠিক করি তা আমাদের ভালর জন্যেই। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই এক ভাইকিং বন্ধু খাবার নিয়ে এল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খাবার খেয়ে নিল। তারপর বাইরে এল। ডেক-এ শাঙ্কোকে দেখল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো —তোমার সকালের খাবার হয়েছে?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—সেটাই ভাবছিলাম। যাকগে—চলো তীরে নামি। খোঁজখবর করি। ফ্রান্সিস বলল।

—দিনের বেলাই যাবে? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। রাতে নামলে বিপদে পড়তে পারি। ফ্রান্সিস বলল।

—আর কাকে নেবে? শাঙ্কো বলল।

—হ্যারি এখনও যথেষ্ট দুর্বল। ভাবছি বিস্কোকে নিয়ে যাবো। বিস্কোকে একবার ডাকো তো। ফ্রান্সিস বলল।

একটু পরেই বিস্কো এল।

—বিস্কো—শোন—আমরা তীরে নামবো। জানতে হবে আমরা কোথায় এলাম। তুমি আর শাঙ্কো আমার সঙ্গে থাকবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। বিস্কো মাথা কাত করে চলল।

—দু'জনেই তৈরি হয়ে এসো। তরোয়াল তীরধনুক সঙ্গে নিও না।

শাঙ্কো আর বিস্কো চলে গেল।

ফ্রান্সিসও তৈরি হল।

মারিয়া বলল—এখানে কি নামতেই হবে?

—উপায় নেই। সঠিক জানতে চাই আমরা কোথায় এলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—বিপদ তো হতে পারে। মারিয়া বলল।

—নিশ্চয়ই বিপদ আছে। কিন্তু জীবনের ঝুঁকিটা নিতেই হবে। নইলে সত্যটা জানবো কী করে? ভয় নেই আমরা সাবধানে থাকবো।

শাঙ্কো আর বিস্কো এল। তিনজন ডেক-এ উঠে এল।

তিনজনে জাহাজের দড়ির সিঁড়ি বেয়ে একটা নৌকোয় নামল। শাঙ্কো নৌকোর দড়ি খুলে জাহাজের গায়ে ধাক্কা দিয়ে নৌকো সরিয়ে আনল। তারপর তীরভূমি লক্ষ্য করে নৌকোর দাঁড় বাইতে লাগল।

তীরে পৌঁছল। আর একটা ছোট জাহাজও নোঙর ফেলে আছে। জাহাজের মাথায় উড়ছে পর্তুগালের পতাকা।

যেখানে নামল সেখানে একটু উঠেই পায়ে চলা পথের মতো দেখল। দুপাশে ঝোপ জঙ্গল।

শাঙ্কো নৌকোটা তীরভূমিতে তুলে রাখল। জোয়ার এলে নৌকোটা আর ভেসে যাবে না।

ওরা চলল। পাখির বিচিত্র সব ডাক। রোদও চড়া নয়। হাঁটতে ভালোই লাগছিল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস দেখল দুতিনজন লোক জলাজঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের দেখে ওরা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দেখে বুঝল লোকগুলো এখানে কোন বিদেশিকে দেখবে এটা বোধহয় কল্পনাও করেনি।

ওরা থেমে আছে। ফ্রান্সিস বুঝল ওরা ছুটে পালাবার জন্যে তৈরি। ফ্রান্সিস আস্তে বলল—শাঙ্কো— ছোট। অন্তত একটাকে ধর। তখনই তিনজন বাঁ দিকে দৌড় দিল। শাঙ্কো ওদের চেয়েও দ্রুত ছুটে পেছনেরটাকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে পড়ে গেল। শাঙ্কো লোকটার হাত ধরল। লোকটাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

লোকটা হাঁপাচ্ছে তখন। শাঙ্কোও হাঁপাতে লাগল।

ফ্রান্সিস ওদের কাছে এল। লোকটাকে দেখল। ওর গায়ে মোটা সুতোয় তৈরি পোশাক পরে আছে। মুখচোখে ভয়।

ফ্রান্সিস বলল—ভয় নেই! আমরা তোমার কোন ক্ষতি করবো না। থেমে বলল— এই জায়গার নাম কী?

—গ্যালিগস।

—এটা কোন দেশ?

লোকটি মাথা এপাশ ওপাশ করল। ফ্রান্সিস বুঝল লোকটি দেশের নাম বলতে পারবে না। অতটা জ্ঞানবুদ্ধি ওর নেই। এবার শাঙ্কো বলল—তোমাদের রাজার নাম কী?

—আত্তারিয়া। লোকটি বলল।

—উনি কোথায় থাকেন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—ঐখানে উদিন্না পাহাড়ের নিচে। লোকটি বলল।

ফ্রান্সিসরা কথা বলছে তখনই পেছনের ছোট টিলাটার মাথায় পাঁচ ছ'জন যোদ্ধাকে দেখল। তাদের হাতে বর্শা। ফ্রান্সিস বুঝল—বিপদ। গলা চড়িয়ে বলল— শাঙ্কো বিস্কো পালাও।

ফ্রান্সিসরা দ্রুতপায়ে সমুদ্রতীরের দিকে ছুটল। তখনই দেখল সমুদ্রতীরের দিক থেকে কয়েকজন যোদ্ধা উঠে আসছে। দু'দিক থেকে ফ্রান্সিসরা আটকে গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ডানদিকে। কিন্তু ওরা ডানদিকে দৌড়োতে যাবে তখনই দেখল ডানদিকের জংলা গাছের জঙ্গল থেকে কয়েকজন যোদ্ধা এগিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—আমরা ধরা পড়ে গেছি। পালাবার চেষ্টা করো না। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক।

যোদ্ধারা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসদের ঘিরে ফেলল। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল। টিলার দিক থেকে একজন ন্যাড়ামাথা বলিষ্ঠ লোক এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বুঝল এ-ই দলপতি। দলপতির হাতে একটা লোহার বর্শা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ ভারী।

—তোমরা বিদেশী? দলপতি জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—এই দেশে এসেছো কেন? দলপতি জিজ্ঞেস করল।

—বলতে পারেন বেড়াতে। শাঙ্কো বলল।

—তোমরা জানো—পাহাড়ের ওপারের রাজ্যের রাজা হুয়াল্লারের সঙ্গে আমাদের লড়াই আর কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে। দলপতি বলল।

—না। এখানে আমাদের জাহাজে চড়ে এসেছি ঘণ্টাখানেক হল। ফ্রান্সিস বলল।

—বিশ্বাস করতে পারলাম না। রাজা হুয়াল্লার গুপ্তচর তোমরা। দলপতি বলল।

এই রাজ্যে আমরা যুদ্ধের জন্যে কী সব ব্যবস্থা নিচ্ছি এটাই তোমরা গোপনে জানতে এসেছো। দলপতি বেশ গলা চড়িয়ে বলল।

ফ্রান্সিস গলায় বেশ জোর দিয়ে বলল—আমরা গুপ্তচর নই। আমরা বিদেশি। জাহাজে চড়ে এসেছি। যদি গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খবর পাই তাহলে আমরা থাকবো যতদিন না গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারছি। গুপ্তধন উদ্ধার করে গুপ্তধন যার বা যাদের পাওনা তাদের হতে দিয়ে চলে যাবো। এছাড়া এখানে আসার অন্য কোন কারণ নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা বিশ্বাস করি না। দলপতি বলল।

—তাহলে আমরা নাচার। আপনি যা ভাববার ভেবে নিন। ফ্রান্সিস বলল।

—সব কটাকে বন্দী কর। দলপতি হুকুম দিল।

একজন যোদ্ধা এগিয়ে এল। হাতে দড়ি। প্রথমে ফ্রান্সিসের হাতে দড়ি বাঁধল। ফ্রান্সিস কোন আপত্তি করল না। বরং বলল—আপত্তি করো না। এর সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে। শাঙ্কো বিস্কোর হাতও দড়ি দিয়ে বাঁধা হল।

দলপতির নির্দেশে ছোট পাহাড়টার দিকে চলল সবাই। পাহাড়ের নিচে পৌঁছে ফ্রান্সিসরা দেখল চামড়ার তাঁবু মত। তাঁবুগুলো অনেকটা জায়গা জুড়ে। ফ্রান্সিসদের দেখতেই বোধহয় তাঁবুগুলো থেকে মেয়েরা শিশুরা বেরিয়ে এল।

একটা তাঁবুর কাছে এল সবাই। দলপতি ফ্রান্সিসদের বলল—এইখানে তোমরা বন্দী হ'য়ে থাকবে। যতদিন রাজা বলবেন তত দিন। এবার তাঁবুটায় ঢোক। ফ্রান্সিসরা তাঁবুতে ঢুকল। মোটামুটি প্রশস্ত। টান হয়ে শুলে তাঁবুর বাইরে পা চলে যাবে। তবে তিনজন এঁটে যাবে। রান্নার জিনিসপত্র উনুন এসব রাখা নেই। তবে তিনজন এঁটে যাবে। বন্দীদের জন্যেই রাখা হয়েছে। একটা কাঠের পাটা মেঝেয় পাতা। ওটার ওপরেই তিনজনকে বসতে বলা হ

—জল খাবো। বিস্কো বসতে বসতে বলল। একজন আঙুল দিয়ে কোণার দিকে দেখাল। বিস্কো ওখানে গেল। দেখল একটা চামড়ার থলিতে জল রাখা। ও থলিতে মুখ চেপে জল খেল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোও জল খেল।

—তোমাদের খাবার আসছে। খেয়ে দেয়ে আমাদের রাজা আত্তারিয়ার কাছে যেতে হবে। তোমাদের কী শাস্তি দেওয়া হবে সেটা রাজাই জানাবেন। দলপতি আর কয়েকজন চলে গেল। দু'জন পাহারায় রইল।

কিছুক্ষণ পরে খাবার এল। দু'জন লোক নিয়ে এল। বড় পাতা পেতে দেওয়া হল। তাতে খাবার দেওয়া হল। ফ্রান্সিস বলল—পেট পুরে খাও। ভালো না লাগলেও খাও। তিনজনে চেয়ে চেয়ে খেল। লোকেরা চলে গেল।

বিকেল হল। দলপতি একাই এল। বলল—চল আমাদের রাজার কাছে যেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল—খাওয়ার সময়ও আমাদের হাতের বাঁধন খোলা হল না। বাঁধা দু'হাত নিয়ে খাওয়া যায়? এখনও বাঁধন খোলা হল না।

দলপতি ফ্রান্সিসদের হাতের দড়ি একটা ধারালো ছোট কুঠার দিয়ে কেটে দিল। তাঁবুর বাইরে এল ওরা। দলপতির পেছনে পেছনে চলল।

এলাকার মাঝখানে বেশ বড় একটা তাঁবু। তাঁবুর সামনে এল ওরা। দলপতি তাঁবুর ভাঁজকরা চামড়া সরিয়ে ভেতরে তাকাল। বলল—মাননীয় রাজা—গুপ্তচরদের এনেছি।

—ভেতরে এসো। রাজার বেশ ভারী গলা। দলপতি ফ্রান্সিসদের তাঁবুতে ঢোকবার জন্যে ইঙ্গিত করল।

ফ্রান্সিসরা তাঁবুতে ঢুকল। বড় তাঁবু তাই মেঝেও বড়। একপাশে রাজা আত্তারিয়া কাঠের আসনে বসে আছেন। চোখ নাক মুখ সুন্দর। সুগঠিত দেহ। গলায় নানা রঙের ছোট ছোট পাথর। রাজা বসবার ইঙ্গিত করলেন। ফ্রান্সিসরা বসল।

রাজা বললেন—তোমরা বিদেশি। তবে কেন গুপ্তচরবৃত্তিতে জড়িয়ে গেলে।

—মান্যবর রাজা—ফ্রান্সিস বলল—এটা আমরা বুঝতে পারছি না কে বা কারা আমাদের গুপ্তচর বলে ধরে নিল। মাত্র একরাত হল আমরা এই গ্যালিগসে এসেছি। যে দেশকে আমরা জীবনে কোনদিন দেখি নি সেখানে এসে গুপ্তচরবৃত্তি করতে যাব কেন? কী লাভ আমাদের? আমরা গুপ্তধনের খোঁজখবর নিয়ে চলে যাবো। গুপ্তধনের খোঁজ পেলে থাকবো। গুপ্তধন খুঁজে আবিষ্কার করব। এর বাইরে আমরা কোন কাজ করি না। এখানকার লড়াইয়ে আমরা জড়াতে যাবো কেন?

—অর্থ—অর্থ—প্রচুর অর্থ পাবেন সেই লোভে। রাজা বললেন।

—মাননীয় রাজা—আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না কী অপরিসীম মূল্যবান গুপ্তধন আমরা আবিষ্কার করেছি। তার সামান্য অংশ আমরা আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনে নিয়েছি। কাজেই আমাদের অর্থাভাব নেই। আমরা যথেষ্ট ধনী। সামান্য অর্থের বিনিময়ে গুপ্তচরবৃত্তি করবো আমরা এতটা নীচ নই। রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—তোমাদের কথা শুনলাম। তবে লড়াইয়ের আগে তোমাদের মুক্তি দেওয়া হবে না। ঐ তাঁবুতেই তোমাদের থাকতে হবে। শাঙ্কো বলল—

—সমুদ্রতীরে আমাদের জাহাজ রয়েছে। আমরা বন্দী হয়ে থাকলে বন্ধুরা আমাদের খোঁজে আসবে। তখন আপনার যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই হওয়া অসম্ভব নয়। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের যোদ্ধারা তোমাদের মুক্ত করতে আসুক—হোক লড়াই—দেখা যাক কী হয়। রাজা বললেন।

—মাননীয় রাজা—সেক্ষেত্রে আপনার দুটো লড়াই চালাতে হবে। হুয়াল্লার সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ একদিকে, অন্যদিকে আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে। এরকম লড়াই কি আপনি চালিয়ে যেতে পারবেন?

রাজা একটু ভেবে নিয়ে বললেন—দু' জায়গাতেই আমরা লড়াই চালাবো।

—আপনারা হেরে যাবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। দেখা যাক। রাজা বললেন।

—আপনারা তরোয়ালের নামই শোনেননি। এই যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে বন্ধুরা লড়াইয়ে নামবে। আপনার যোদ্ধারা এই যুদ্ধাস্ত্রের সামনে শুধু বর্শা নিয়ে দাঁড়াতেই পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। রাজা মুখে শব্দ করলেন। ফ্রান্সিস বলল—তার চাইতে আমাদের মুক্তি দিন— আমরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাই।

—না। তোমাদের বন্দী হয়ে থাকতে হবে। রাজা বললেন—রাজা যোদ্ধাকে ইঙ্গিত করলেন ডান হাত তুলে। যোদ্ধা এগিয়ে বলল—চল সব।

ফ্রান্সিসরা তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল। চলল তাঁবুর কয়েদখানার দিকে। তাঁবুতে ঢুকে ফ্রান্সিসরা বসল। শাঙ্কো বলল—পালাবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বোঝো ফ্রান্সিস এখানে লোহার গরাদ নেই।

—হুঁ। কিন্তু পাহারাদারদের দেখে বুঝেছি এরা ভীষণ সতর্ক। পালানো সহজ হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—সেটাই ভেবে উপায় ঠিক কর। বিস্কো বলল।

—কাজটা হল—এখান থেকে যতদূর সম্ভব জোরে ছুটে জঙ্গলে ঢুকে পড়তে হবে। শাঙ্কো বলল।

—সেক্ষেত্রে প্রহরীরা বর্শা ছুঁড়ে মারবে। অল্প আলোতেও ওদের দৃষ্টি চলে। কাজেই নিখুঁত নিশানায় ওরা বর্শা ছুঁড়তে পারবে। আমরা মারাত্মক আহত হব অথবা মারা যাবো। কাজেই অপেক্ষা কর। দেখা যাক রাজা আত্তারিয়া আর হুয়াল্লার সঙ্গে লড়াইটা কবে লাগে। যোদ্ধারা লড়াই নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। আমরা সহজেই পালাতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

প্রহরী রাতের খাবার নিয়ে এল। গোল রুটি আর কী পাখির মাংস। ক্ষুধার্ত দুজনেই গপ্‌গপ্‌ করে খেল। খাওয়া শেষ। প্রহরী চলে গেল।

তিনি দিন কাটল। ফ্রান্সিসরা ফিরছে না। মারিয়া আর বন্ধুরা চিন্তায় পড়ল। শুধু জায়গাটা কী সেটা জানতে গেছে। এইজন্যে এতদিন লাগার কথা নয়। মারিয়ার শুকনো মুখ চোখ দেখে হ্যারি খুব দুশ্চিন্তায় পড়ল। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। বৈদ্য ভেন বয়েসে ফ্রান্সিসদের চেয়ে বড়। ভেনই মারিয়া হ্যারিকে সান্ত্বনা দেয়—কিচ্ছু ভেবো না—ফ্রান্সিসকে আটকে রাখার সাধ্য কারো নেই। হ্যারি একটু সান্ত্বনা পায়। মারিয়া কিছু বলে না।

দিন কয়েক কেটে গেল। ফ্রান্সিসদের পালানো হল না। ওরা গভীর রাতে উঠে দেখেছে প্রহরীরা বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। এরা কি রাতে ঘুমোয় না?

সেদিন শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস—চলো একবার পালাবার চেষ্টা করে দেখি।

—লাভ নেই। উপরন্তু মরে যাব অথবা আহত হবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আবার পালিয়েও যেতে পারি—অক্ষত। শাঙ্কো বলল।

—কতদিন এখানে পড়ে থাকবো? বিস্কো বলল।

—বেশ। চেষ্টা করে দেখা যাক্। ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন রাতের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিসরা শুয়ে পড়ল না। বসে রইল।

রাত গভীর হচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো একবার আকাশটা দেখো তো। চাঁদের আলো কেমন? তাঁবুর বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখল শাঙ্কো। বলল—জ্যোৎস্না আছে। তবে খুব উজ্জ্বল নয়। কুয়াশাঢাকা।

—ঠিক আছে। তৈরি হও। পেছনের জঙ্গলটার দিকে ছুটতে হবে। একবার জঙ্গলে ঢুকতে পারলে—নিশ্চিন্ত। ফ্রান্সিস বলল।

তিনজন উঠে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎই তিনজনে পেছনের জঙ্গলের দিকে ছুটল। প্রহরীরা কতটা সজাগ বোঝা গেল সেটা। দুজন প্রহরী ফ্রান্সিসদের পেছনে ছুটতে ছুটতে একজন বর্শা ছুঁড়ল ফ্রান্সিসদের লক্ষ্য করে। বর্শাটা ফ্রান্সিসের মাথায় প্রায় লেগেছিল। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে ফেলল। বর্শাটা সামনে মাটিতে গেঁথে গেল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল।

আবার বর্শা ছুটে এসে শাঙ্কোর ডান পা ছুঁয়ে মাটিতে পড়ল। মাটিতে গেঁথে গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—শাঙ্কো থেমে যাও। শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। বিস্কো ছুটে চলেছে। মাটিতে গাঁথা বর্শা তুলে নিয়ে মারতে প্রহরীটি দেরি করল। বর্শা ছোঁড়ার আগেই বিস্কো জঙ্গলের প্রথম গাছটা পেরিয়ে গেল। জঙ্গলে ঢুকে গেল। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—বিস্কো—কেউ যেন না আসে। লড়াই নয়।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো নিজেদের কয়েদ তাঁবুতে ফিরে চলল। প্রহরীরাও সঙ্গে সঙ্গে চলল।

দুজনে ফিরে তাঁবুতে ঢুকল। দুজনেই হাঁপাচ্ছে তখন। তাঁবুর মধ্যে ঢুকে ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বসে রইল। ফ্রান্সিস বলল—মুস্কিল হল প্রহরীরা

এখন আমাদের ওপর নজরদারি বাড়াবে। অন্য উপায় ভাবতে হবে। আর ক'টা দিন থাকি। সুযোগ সুবিধেমত পালাবো।

এক সকালে রাজা আত্তারিয়া ফ্রান্সিসদের ডেকে পাঠাল। দলপতি ফ্রান্সিসদের তাঁবুতে এল। বলল- তোমরা এসো। রাজা ডাকছেন।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো সবে সকালের খাওয়া খেয়েছে তখন। চলল দুজনে।

দুজনে রাজার তাঁবুর সামনে এল। দলপতি ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা তাঁবুতে ঢুকল। একটা কাপড়ের গদীতে রাজা বসে আছেন। দুজনকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। ফ্রান্সিস শাঙ্কো বসল। রাজা বললেন—

—সেদিন তোমাদের কথা শুনে মনে হল তোমরা কিছু গুপ্তধন উদ্ধার করেছো। রাজা আত্তারিয়া বললেন।

—হ্যাঁ। তা করেছি। ফ্রান্সিস বলল।

একটু চুপ করে থেকে রাজা বললেন—এই উদিন্না পাহাড়ে একটা সোনার খনিমত আছে। অনেক সোনার পিণ্ড মত আছে। একজন জংলি রাজা কোনভাবে সেই খনির হদিশ জানতো। তার মৃতদেহের কাছ থেকে আমার ঠাকুর্দা একটা গুটোনো চামড়া পেয়েছিল। তাতে নকশা আঁকা। ঠাকুর্দা জংলিটার সৎকার করেছিলেন। তারপর সেই নকশাটা নিয়ে আসেন। রাজা থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন। তারপর থেকে ঐ নকশাটা আমাদের পরিবারের কাঠের ছোট বাক্সে ওটা রাখা ছিল। বাবা দু'একবার চেষ্টা করে নকশাটার সাহায্যে এই উদিন্না পাহাড়ে সোনার খনি আবিষ্কারের জন্যে। কিন্তু পারেন নি। রাজা থামলেন।

তারপর বললেন—আমি নিজেও চেষ্টা করেছি। নকশাটা দেখে দেখে আন্দাজে সোনার খনি খুঁজেছিলাম। কিন্তু কয়েক বছর পর হতাশ হয়ে খনি খোঁজা ছেড়ে দিয়েছিলাম। রাজা থামলেন।

—তাহলে ঐ নকশাটা এখনও আপনার কাছেই আছে। ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ। রাজা মাথা ওঠানামা করলেন।

—নকশাটা একটু দেখবো? ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের নকশাটা দেখাবো বলেই ডেকে পাঠিয়েছি। এই কথা বলে রাজা কোণার দিকে হাত বাড়ালেন। একটা ছোট কালো কাঠের বাক্স বের করলেন। বাক্সটা এনে একটু চাপ দিয়ে বাক্সটা খুললেন। সকালের আলোয় সবই দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা পাথর বসানো আংটি সবুজ পাথরের হার একটা সোনার ছোট ছোরা বেশ কয়েকটা রঙিন পাথর। সব অলংকারের নিচে থেকে এক টুকরো সাদা চামড়া বের করলেন। ফ্রান্সিসকে দিলেন। ফ্রান্সিস নকশাটার

ওপর ঝুঁকে পড়ল। গায় সবুজ রঙে চামড়ায় আনাড়ি হাতে কিছু আঁকা। নকশাটা এরকম—
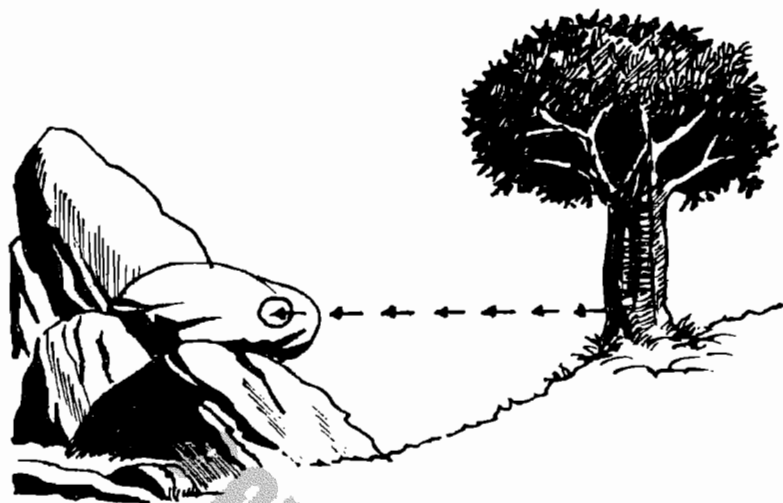
ফ্রান্সিস খুব মন দিয়ে নকশাটা দেখল। বুঝল এই নকশার সঙ্গে এই উদিন্না পাহাড়ের যোগ আছে।

—আপনার পিতা কি এই উদিন্না পাহাড়েই সোনার খনি আছে—এটা ভেবেছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কারণ বাবা বলেছিলেন, পিতামহ বলেছিলেন এই উদিন্নার পাহাড়ের নিচেই জংলির মৃতদেহ দেখেছিলেন। তার কোমরের ফেট্টি থেকেই নকশাটা পেয়েছিলেন। রাজা বললেন।

—তাহলে এই উদিন্না পাহাড়েই রয়েছে সোনার খনি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের তাই বিশ্বাস। রাজা আত্তারিয়া বললে।

—আর খোঁজাখুঁজি করলেন না কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

রাজা একটু থেমে বললেন—উত্তরের রাজা হুয়াল্পা আমাদের যোদ্ধাদের পাহাড়ের ওপরে উঠতে দেয় না। বদলে আমার যোদ্ধারাও ওদের দেখলে তাড়িয়ে দেয়।

—রাজা হুয়াল্পা কি সোনার খনির কথা জানে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ জানে। তাই পাহাড়ের অধিকার নিয়ে কিন্তু আমার পিতার সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলছে। রাজা আত্তারিয়া বললেন।

—আপনার পক্ষেই সোনার খনি খুঁজে বের করা সম্ভব। কারণ আপনার কাছে একটা নকশা রয়েছে। রাজা হুয়াল্পার হাতে কিছুই নেই। তাকে খুঁজতে হলে আন্দাজে খুঁজতে হবে। এই উদিন্না পাহাড় তন্ন তন্ন করে খোঁজা প্রায়

অসম্ভব। কাজেই উদ্ভবত্র রাজা হুয়াল্পার পক্ষে সোনার খনি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। একটু থেমে রাজা বললেন—তাহলে তুমি নকশাটা নিয়ে যাও। ভালো করে দেখে আমাকে ফেরৎ দিও। নকশাটা যেন নষ্ট না হয়। সাবধানে রাখবে। দেখবে। বুঝবে। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস বিস্কো উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস নকাটাটা নিল। বলল—বেশ ভাল করে নকশাটা দেখতে হবে। ততদিন—

—তোমার কাছেই থাক। এই নকশা থেকে চেষ্টা কর যাতে সোনার খনিটা আবিষ্কার করা যায়।

ফ্রান্সিস শাঙ্কো নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এল। নকশাটা নিয়ে ফ্রান্সিস বিছানায় আধশোয়া হল।

দুপুরের খাওয়ার পরও ফ্রান্সিস নকশাটা নানাভাবে দেখতে লাগল। শাঙ্কোও নকশাটা নিয়ে দেখল।

সন্ধেবেলা নকশাটা রেখে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—নকশাটা দেখে তোমার কী মনে হল।

—এই আঁকাবাঁকাটা কী বুঝতে পারছি না। শাঙ্কো বলল।

—ওটা একটা পাতাঝরা গাছ। নকশাটা যখন আঁকা হয় তখন গাছটা চারাগাছ ছিল। এখন নিশ্চয়ই বড় হয়েছে। গাছটা খুঁজে বের করতে হবে। তারপর বল। ফ্রান্সিস বলল।

—বাঁদিকে কীসব যেন উপুর করা রয়েছে। শাঙ্কো বলল।

—ওসব পাথর। তারমানেই ওটা পাহাড়ের নিচের ভাগ। ওটা যদি বাড়াতে থাকো পাহাড় পাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কত বড় পাহাড়? শাঙ্কো বলল।

—এটা উদিন্না পাহাড়। সোনার খনি আছে এই পাহাড়ে। কিন্তু কোথায় সেটা জেনেছিল এক জংলি মানুষ। কিন্তু সেও পারা যায়।

রাজা আত্তারিয়ার পিতামহ ঐ মৃত জংলির কাছ থেকে কিছুই জানতে পারে নি। জংলিটা কোথা থেকে কী করে নকশাটা পেয়েছিল এটা এক রহস্য। ফ্রান্সিস বলল।

—একটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। শাঙ্কো বলল।

—কোন ব্যাপার? ফ্রান্সিস বলল।

—লক্ষ্য করে দেখ—একটা পাথরের ওপরে একটা গোল চিহ্ন। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। দেখছি। ফ্রান্সিস বলল।

—ওটা কী? শাঙ্কো বলল।

—একটা নিশানা। পাথরগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কোন্ পাথরে ঐ চিহ্ন দেখা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার কি তাই মনে হয়। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। রহস্য সমাধানে ঐ গোল দাগটার অর্থ বুঝতে হবে। দেখতে হবে কোন পাথরের গায়ে ঐ চিহ্নটা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—এই চিহ্ন কি পাওয়া যাবে? শাঙ্কো বলল।

—নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। না পেলে খুঁজতে হবে। এই গোল চিহ্নটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখা যাক। শাঙ্কো বলল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস বলল—চল—রাজার সঙ্গে কথা বলে আসি।

—কী কথা? শাঙ্কো বলল।

—মুক্তি চাই—তা নাইলে কিছুই করা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। রাজার কাছে চলল। দলপতি আসছিল। বলল—কোথায় যাচ্ছো?

—রাজার সঙ্গে কথা বলতে। শাঙ্কো বলল।

—তোমরা বন্দী। দলপতি বলল।

—পাহারাদার কিছু বলল না। শাঙ্কো বলল।

—উঁহু। আমাকে না বলে কোথাও যাবে না। চল। দলপতি বলল।

রাজা আত্তারিয়া গদীতে আধশোয়া। গদীটা বোধহয় ভালো শুকনো ঘাসে করা। দুজনকে দেখে রাজা উঠে বসলেন।

—কী ব্যাপার? রাজা বললেন।

—সোনার খনি খুঁজে বের করার দায়িত্ব যদি আমাদের দেন তাহলে আমাদের বন্দী করে রাখা চলবে না। কারণ সেক্ষেত্রে ইচ্ছেমত যে কোন সময় যে কোন জায়গায় যাওয়া যাবে না। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আত্তারিয়া একটু ভাবলেন। তারপর বললেন—এর আগেও এক শ্বেতাঙ্গকে খোঁজ করতে বলেছিলাম। তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। দিন কুড়ি পরে উধাও। ভাগ্যিস নকশাটা আমার কাছেই ছিল। নইলে ওটাও উধাও হয়ে যেত। একটু থেমে রাজা বললেন—এখন প্রশ্ন তোমাদের একেবারে ছেড়ে দিলে ঐ ব্যাপারই ঘটতে পারে কিনা।

—আমরা বিশেষ করে এই উদিন্না পাহাড়েরই ধারে কাছে থাকবো। দূরে কোথাও গিয়ে বোধহয় লাভ হবে না। সোনার খনি এই পাহাড়েই আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক গে। তোমাদের ছেড়েই দেওয়া হল। তবে দুজন প্রহরী তোমাদের ওপর নজর রাখবে। পালাতে গেলেই তোমাদের হত্যা করা হবে। বুঝেছো? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। আমরা পালাবো না। সমস্ত সময়টাই কাটাবো সোনার খনির অনুসন্ধানে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। রাজা বললেন।

শাঙ্কো বলল—আমার আমাদের তাঁবুতে খুবই অসুবিধের মধ্যে আছি। শুনলাম আরো দুজনকে ধরা হয়েছে। আমাদের তাঁবুতেই তাদের রাখা হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের খুবই অসুবিধে হবে। শুধু আমাদের জন্যে একটা তাঁবুর ব্যবস্থা করুন। শাঙ্কো বলল।

—বেশ। করা হবে। অনেক সুবিধে তোমাদের দেওয়া হচ্ছে। কাজের কাজটা করা চাই। রাজা বললেন।

—ভাববেন না। মাত্র একসপ্তাহের মধ্যেই আমরা বুঝতে পারবো গুপ্ত খনি আবিষ্কার করতে পারবো কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। রাজা মাথা নেড়ে বললেন।

রাজা দলপতিকে ডাকল। দলপতি এল। রাজা বললেন—এই দুজনকে থাকবার জন্যে ভালো জায়গা দাও। ভালো খাবার-টাবার দাও।

—ঠিক আছে। সেনাপতি মাথা নিচু করে বলল।

ফ্রান্সিসরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। দলপতি এসে বলল—আমার সঙ্গে চলো। তোমাদের জন্যে একটা ভালো জায়গা দেখছি। হাঁটতে হাঁটতে এক কোণায় চলে এল দলপতি। একটা তাঁবুর কাছে এল।

দলপতি বলল—এখানে আমরা কয়েকজন থাকতাম। এখন একা আমার এক বন্ধু থাকে। তাকে চলে যেতে বলব। তোমরাই শুধু থাকবে।

ফ্রান্সিসরা তাঁবুটায় ঢুকল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মেঝেয় পাতা বিছানাটাও বেশ মোটা। শুকনো ঘাসের। বোঝাই যাচ্ছে।

—এবার ভালো জায়গা পেলে তো। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো বিছানায় বসল। বেশ নরম। ফ্রান্সিস আধশোয়া হল। মাথায় চিন্তা কী করে সোনার খনিটা খুঁজে বের করবে। অবশ্য কাজে নামলে তখনই বোঝা যাবে আমরা সফল হব কিনা।

তাঁবুর ফাঁক দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দলপতি হেসে বলল—

—তোমরা সোনার খনি খুঁজে বের করতে পারবে না। আগেও কেউ পারে নি।

—সব জেনেটেনে বুঝবো—পারবো কি পারবো না। শাঙ্কো বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। স্বাধীনভাবে থাকার হুকুম তো পেয়েই গেছ।

—হুঁ। শাঙ্কো মুখে শব্দ করল। দলপতি চলে গেল।

ফ্রান্সিস বলল—খাওয়ার সময় হয়েছে। চলো আজ দুপুর থেকেই কাজে নামি। জাহাজে মারিয়া আর বন্ধুদের খুব একটা দুশ্চিন্তা হবে না এখানে কয়েকদিন থাকলেও। বিস্কো তো গেছে। ওর কাছেই সব শুনবে। নিশ্চিন্ত হবে।

—কিন্তু আমরা গুপ্তসোনার খনি খুঁজছি এটা কিন্তু বিস্কো জেনে যেতে পারে নি। আমরা কেন ফিরতে দেরি করছি এটা ওরা জানতে পারে নি। ওদের চিন্তা হবেই। শাঙ্কো বলল।

দুপুরে খেতে দেওয়া হল। রুটি আনাজের তরকারির মত আর মাংস। বোঝা যাচ্ছে পাখির মাংস। কিন্তু কোন্ পাখির মাংস সেটা আর জানা হল না। দুজনেই পেটপুরে খেল।

একটু বিশ্রাম করে দুজনে তাঁবু থেকে বেরোল। হাঁটতে শুরু করল উদিন্না পাহাড়ের দিকে। খুব একটা কাছে নয়। পাহাড়টা দেখে যতটা কাছে মনে হচ্ছিল হেঁটে যেতে গিয়ে বুঝল মোটেই তত কাছে নয়।

উদিন্না পাহাড়ের পাদদেশেই যা সবুজের সমারোহ। পাহাড়ের মাঝামাঝি থেকেই রুক্ষ ধূলোটে রঙের পাথর। ফ্রান্সিস বলল—নক্শার চারাগাছটিকে আগে খুঁজে পেতে হবে।

—চারাগাছটা আর চারাগাছ নেই। এখন মহীরুহ—বিরাট গাছ। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। সেটা হিসেবে রাখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে পাহাড়ের ঠিক পাদদেশ দিয়ে চলল। লক্ষ্য একটা বড় গাছ। দুজনে পাহাড়ের গা ঘেঁষে মাথা তুলে দাঁড়ানো বড় গাছ খুঁজতে খুঁজতে চলল।

এরকম দুটো গাছ ওরা পেল। ফ্রান্সিস গাছের কাণ্ড বেয়ে উঠে একটা ডাল ভেঙে রাখল। আর একটা গাছেরই ডাল ভাঙল।

তখন শেষ বিকেল। দুজনেই বেশ ক্লান্ত। বেশ জলতেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু এখানে কোথায় জল?

হঠাৎ পেছনের ঝোপজঙ্গলে খস্খস্ শব্দ উঠল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। মৃদুস্বরে বলল—শাঙ্কো—আমরা বিপদে পড়লাম। ফ্রান্সিসের কথা শেষ হয়েছে মাত্র পেছনে বেশ জোরে সর্সর্ শব্দ উঠল। মুহূর্তে চারপাঁচজন যোদ্ধা বর্শা হাতে ছুটে এল। ফ্রান্সিস দুহাত তুলে বলল—আমরা বিদেশি ভাইকিং। তোমাদের ঝগড়া লড়াইয়ের মধ্যে আমরা নেই।

যোদ্ধারা আস্তে আস্তে বর্শা নামাল। এই যোদ্ধাদের পোশাক অন্যরকম। ওরা ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। বর্শা নামানো।

ফ্রান্সিস বলল—ভাই তোমরা কোন্ রাজার যোদ্ধা?

—উত্তরের হুয়াল্লা রাজার যোদ্ধা আমরা। আমরা উদিন্না পাহাড়ের নিচে পাহারা দিই।

—কেন পাহারা দাও? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—এই উদিন্না পাহাড়ের কোথাও রয়েছে সোনার খনি। দলপতি যোদ্ধা বলল।

—এটা কি সত্যি? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ সত্যি। আমরা দক্ষিণ দিকটা পাহারা দিই না। ওটা দক্ষিণের রাজা আত্তারিয়ার যোদ্ধারা পাহারা দেয়। তোমরা উত্তরে এসেছো কেন? একজন বলল।

—এমনি। আমরা অনেক দেশে গেছি। কত ভালো ভালো মানুষ দেখেছি। আবার নৃশংস মানুষও দেখেছি। তবু সব মিলিয়ে পৃথিবীটা কী সুন্দর। এইজন্যেই মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখবো বলে এখানে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা আর কিছু কর না? দলপতি যোদ্ধা বলল।

—হ্যাঁ গুপ্ত ধনভাণ্ডারের খোঁজ পেলে বুদ্ধি খাটিয়ে তা উদ্ধার করি। ফ্রান্সিস বলল।

—তারপর ধনসম্পদ নিয়ে পালিয়ে যাও। যোদ্ধাটি বলল।

—এ কথাটা অনেকের মুখে শুনেছি। তারা আমাদের বিশ্বাস করে নি। এই নিয়ে কিছু বলবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ বোঝা গেল। দলপতি বলল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল—এদের হাতে দড়ি বাঁধো।

—তাহলে আমরা বন্দী হলাম। কোন অপরাধ না করে। শাঙ্কো বলল।

—রাজা হুয়াল্লা তোমাদের বিচার করবেন। রাজা যা বিচার করবেন তাই তোমাদের মেনে নিতে হবে। দলপতি বলল।

—কখন বিচার হবে? শাঙ্কো বলল।

—কাল সকালে রাজসভায়। দলপতি বলল। তারপর যোদ্ধাদের হুকুম দিল—এই বিদেশি দুজনকে নিয়ে চল। হাত বাঁধা অবস্থায় ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোকে ওরা নিয়ে চলল।

উত্তর দিকে বেশ কিছুটা হেঁটে রাজা হুয়াল্লার দেশে এল। নগরটি একটু বড়ই মনে হল ফ্রান্সিসের কাছে। লোকজনের ভিড় আছে। সন্ধ্যে হয়েছে। দোকানে বাড়িতে কাঁচঢাকা আলো যতটুকু আলো ছড়াচ্ছে।

নগরের মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে দুজনকে কয়েদখানার কাছে নিয়ে আসা হল। দলপতির নির্দেশে প্রহরীরা লোহার দরজা খুলল। ফ্রান্সিসদের ভেতরে ঢোকানো হল। একটু জোর খাটাল দুজন যোদ্ধা। ফ্রান্সিস একবার ওদের মুখের দিকে তাকাল। শাঙ্কো বুঝল ফ্রান্সিস ক্রুদ্ধ হয়েছে। ও বলে উঠল—ফ্রান্সিস ভাই

সংযত হও। ফ্রান্সিস ঘরের এক কোণায় চলে এল। ছড়ানো শুকনো ঘাসপাতার ওপর শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো পাশে বসল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—শাঙ্কো জীবনের কত দিন কয়েদঘরে কেটে গেল—হিসেব করিনি।

—তুমি তো এরকম জীবনই চাও। শাঙ্কো বলল।

—অবশ্যই চাই। এজন্যে আমার কোন দুঃখ নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস তুমি আমাদের মত নও। অন্যরকম। শাঙ্কো বলল।

—হবে। এসব ভাবিনি কোনদিন। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার খুব খিদে পেয়েছে। শাঙ্কো বলল।

—আমারও। পাহারাদারদের বলে দেখতো? ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি। শাঙ্কো উঠে লোহার দরজার কাছে গেল। বর্শা হাতে এক পাহারাদারকে হাতের ইঙ্গিতে ডাকল। প্রথম পাহারাদারটা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। অন্য একজনকে ডাকল। সে এগিয়ে এল। বলল—

—কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

—আমরা দু'জন এইমাত্র এলাম। খুব খিদে পেয়েছে আমাদের। শাঙ্কো বলল।

—সেই রাতে খাবে। এখন নয়। পাহারাদার বলল।

—এটা রাজার হুকুম বোধহয়। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। পাহারাদারটি বলল।

—উনি রাজা মানুষ। খিদে ব্যাপারটা কী উনি জানবেন কী করে। যাকগে—কিছু রুটি চিনি আনো। শাঙ্কো বলল।

—আমি পারবো না। নিয়ম ভাঙলে আমি বিপদে পড়ে যাবো। প্রহরীটি বলল।

—লুকিয়ে চুরিয়ে খাবার দিতে পারো। অবশ্য তোমার যদি ইচ্ছে হয়। শাঙ্কো বলল।

পাহারাদার বর্শা হাতে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছিল। এবার থামল। তারপর শাঙ্কোর মুখের দিকে তাকাল। কী ভাবল। দরজার কাছেই দুটো মশাল জ্বলছিল। পাহারাদারটি আলো থেকে আস্তে সরে গেল। অন্ধকার বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল। হাতে পাতায় জড়ানো রুটি আর চিনি। সঙ্গের পাহারাদার দরজা থেকে সরে যেতেই ও দ্রুত দরজার কাছে এল। তখনও শাঙ্কো দাঁড়িয়ে ছিল। ও শাঙ্কোকে খাবার দিয়েই সরে এল।

শাঙ্কোও পাতায় মোড়ানো রুটি চিনি নিয়ে নিল। পেছন ফিরে ফ্রান্সিসের কাছে এল। এখানে ঘরের কোণায় মশালের আলো তেমন জোরালো নয়। শাঙ্কো আর ফ্রান্সিস রুটি ভাগ করে চিনি দিয়ে খেতে লাগল। একটু আড়াল দিয়ে।

খাওয়া শেষ হল। আর এক কোণায় বড় জালায় রাখা জল তুলে তুলে খেল। খিদেটা একটু কমল।

শাঙ্কো উঠে দরজার কাছে এল। সেই প্রহরীর হাত ধরল। দুজনেই হাসল। শাঙ্কো ফিরে এল। ফ্রান্সিসের পাশে বসল।

রাতের খাওয়া সেরে ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো তখনও বসে আছে। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো ভেবে দেখলাম আগেই পালাবার কথা ভাববো না। চলো দেখি কালকে রাজা হুয়াল্পা কী বলে। নকশাটা দেখালে হুয়াল্পা একেবারে লাফিয়ে উঠবে। সোনার খনি বলে কথা।

—তাহলে রাজা হুয়াল্পা কি আমাদের ছেড়ে দেবে? শাঙ্কো বলল।

—উল্টোটা—আমাদের অন্য ভালো ঘরে থাকতে দেবে। প্রত্যেক দিনই খবর নেবে আমরা কতদূর এগোলাম।

—নক্‌শাটা তো নিয়ে নিতে পারে। শাঙ্কো বলল।

—নক্‌শাটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে অর্থাৎ চোখ বুঁজলেই নকশাটা দেখতে পাই। ফ্রান্সিস বলল।

—তবে তো আমাদের এখানেই থাকতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—যে কদিন থাকবো রাজার হালে থাকবো। সোনার খনির লোভ—কেউ মাথা ঠিক রাখতে পারে না। রাজা হুয়াল্পাও পারবে না।

—কালকে তো আমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাবে। দেখা যাক কী করে রাজা। শাঙ্কো বলল।

পরদিন বেশ ভোরেই ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। দেখল শাঙ্কো চুপ করে বসে আছে। ফ্রান্সিস হেসে বলল—কী হল? এত তাড়াতাড়ি উঠলে?

—ঘুম আসছিল না। নানা কথা ভাবছিলাম। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস উঠে বসল। বলল—চিন্তা তো হবেই। আমরা এখানে বন্দী হয়ে পড়ে আছি, মারিয়া বন্ধুরা জাহাজে। আমাদের ফেরার প্রতীক্ষা করছে। শাঙ্কো ভেবো না সব ঠিক হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

সকালে খাওয়াদাওয়ার পরেই দলপতি লোহার দরজার কাছে এল। পাহারাদার দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকে দলপতি ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল—রাজসভায় চল। তোমাদের বিচার হবে।

ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। দলপতির পেছনে পেছনে বাইরে এল। সবাই চলল একটা বড় বাড়ির দিকে।

—ঐ বড় বাড়িটা বোধহয় রাজবাড়ি। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। দলপতি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

রাজার সভাঘরে ঢুকল সবাই। একটা কাঠের সিংহাসনে রাজা হুয়াল্পা বসে আছেন। পাশে মন্ত্রী অমাত্যরা বসে আছেন। একটু পাশে সেনাপতি বসেছেন।

বিচার চলছিল। রাজা হুয়াল্পা এক পক্ষকে শাস্তি দিলেন। বিচারপ্রার্থীরা চলে গেল।

দলপতি সেনাপতিকে গিয়ে কিছু বলল। তখনও রাজা কাউকে ডাকেননি। সেনাপতি রাজার কাছে এসে কী বলল। রাজা গলা চড়িয়ে বলল—বিদেশিরা এসো। দলপতি ফ্রান্সিসদের এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা এগিয়ে এল। রাজা ফ্রান্সিসদের দেখে বললেন—তোমরা কোন্ দেশ থেকে এসেছো?

—আমরা ভাইকিংদের দেশ থেকে আসছি। শাঙ্কো বলল।

—এখানে কেন এসেছো? রাজা হুয়াল্পা বললেন।

—দেশ দেখতে, মানুষ দেখতে, প্রকৃতি দেখতে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাতে কী লাভ? রাজা একটু হেসে বললেন।

—লাভক্ষতির কথা আমরা ভাবি না। এইসঙ্গে অবশ্য অন্য একটা কাজও আমরা করি। কোন দেশে গুপ্তধনভাণ্ডারের খোঁজ পেলে আমরা সেই গুপ্তধনভাণ্ডার বুদ্ধি খাটিয়ে খুঁজে বের করি। ফ্রান্সিস বলল।

—তারপর সেই ধনভাণ্ডার নিয়ে নিজেদের দেশে পালিয়ে যাও। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

—তা এখানে কি কোন গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছো? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ। এই উদিম্না পাহাড়েই আছে সোনার খনি। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা কী করে জানলে? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

—রাজা আত্তারিয়ার কাছ থেকে। ফ্রান্সিস বলল।

—সেই সোনার খনি কী ভাবে উদ্ধার করা যায় তা জেনেছো? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ জেনেছি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা হুয়াল্পা সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি। ফ্রান্সিস ঘাড় কাত করে বলল।

—সেই সোনার খনি আবিষ্কারের জন্যে কোন উপায় পেয়েছো? রাজা বললেন।

—হ্যাঁ পেয়েছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কী পেয়েছো? রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে নকশাটা বের করে মেলে ধরল।

রাজা হুয়াল্পা প্রায় ছুটে এসে নকশাটা প্রায় কেড়ে নিলেন।

রাজা হুয়াল্পা হা হা করে হেসে উঠলেন। গলা চড়িয়ে বললেন—এই নকশা তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।

—বেশ। কিন্তু শুধু নকশা পেলে কী হবে। নকশার অর্থ তো বের করতে হবে। নকশার রহস্যটা তো ভেদ করতে হবে। রাজা হুয়াল্লা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—তোমরা কি নকশাটার অর্থ বের করতে পেরেছো? রাজা সিংহাসনে বসলেন।

—এখনও সবই অনুমান। প্রকৃত রহস্যটা এখনও ভেদ করতে পারিনি। ফ্রান্সিস বলল।

—তা নকশাটা আমার কাছে থাক। আমার মন্ত্রী, অমাত্যরা রয়েছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই নকশার অর্থটা ভেদ করতে পারবেন। রাজা বললেন।

—এইসঙ্গে আমি বলি আমাদের দুজনকেও অনুমতি দিন নকশার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তোমরাও চেষ্টা কর। মোট কথা সোনার খনি আমার চাই-ই চাই। রাজা গলা চড়িয়ে বললেন।

—তাহলে আমাদের এই অনুমতি দিন—আমরা যখন যেখানে খুশি যেতে পারবো। নকশার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গেলে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তো। আমি সেনাপতিকে বলে দেব। রাজা বললেন।

রাজা হুয়াল্লা সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আজ আর আমি বিচারের করব না। সবাই চলে যাও।

বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। রাজার হুকুম। মানতেই হবে। সবাই আস্তে আস্তে সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সভার পরিবেশ শান্ত হল। রাজা তখন মন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে নকশা দেখতে লাগলেন। মন্ত্রী নিবিষ্ট মনে নকশাটা দেখতে লাগলেন। রাজার নির্দেশে দুজন অমাত্যও মন্ত্রীর কাছে এলেন নকশা দেখতে লাগলেন। ফ্রান্সিস রাজাকে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলল—নকশাটা তো দিয়ে দিয়েছি। তাহলে আমরা এখন যাবো?

—বেশ। যাও। রাজা বললেন।

—কিন্তু কোথায় যাবো? কয়েদখানায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না-না। তোমরা সৈন্যাবাসে থাকবে। ওখানে তোমাদের নজরে রাখা যাবে। রাজা এবার সেনাপতির দিকে তাকালেন। বললেন—সেনাপতি এই দু'জন বন্দীর থাকার জন্যে সৈন্যাবাসের একটা ভালো ঘর দিন। লক্ষ্য রাখবেন যেন পালাতে না পারে।

সেনাপতি মাথা নিচু করে মাথা তুলল। ফ্রান্সিসদের ইঙ্গিত করল পেছনে পেছনে আসার জন্যে।

ফ্রান্সিসরা সেনাপতির পেছনে পেছনে চলল। সৈন্যাবাসে বেশ ভাল ঘর দেওয়া হল ওদের। সেনাপতি বলল—এই ঘরে থাকতে তোমাদের অসুবিধে হবে না। প্রয়োজনে আমার কাছে এসো। সেনাপতি চলে গেল।

লম্বা লম্বা শুকনো ঘাস আর কোন গাছের ছোবড়া দিয়ে তৈরি বেশ পরিপাটি বিছানা।

ফ্রান্সিস ঘরটায় ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো হেসে বলল—ফ্রান্সিস—তোমার এই এক রকম। বিছানা পেলেই শুয়ে পড়।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গভীর চিন্তা করা চলে না। এইজন্যে চাই বিছানা আর সময়। এখানে দুটোই পাবো বলে ভরসা করছি। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরের খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস বলল—বেশ বেলা হয়ে গেছে। আজকে আর উদিন্না পাহাড় দেখতে যাবো না। আজ শুধু বিশ্রাম আর চিন্তা। কালকে থেকে কাজ শুরু করবো।

মনে হয় উদিন্না পাহাড়টাকে বোধহয় দুই রাজা ভাগ করে রেখেছে। উত্তরের রাজা হুয়াম্পার অধীন। দক্ষিণদিকটা রাজা আত্তারিয়ার এলাকা। দুই রাজাই এই ভাগ মেনে নিয়েছে বোধহয়। শাঙ্কো বলল।

হুঁ। তাহলে দুই রাজার কাছ থেকেই অনুমতি নিতে হবে। দুই রাজাই যদি অনুমতি দেয় তাহলে অনেক সমস্যার হাত থেকে বাঁচা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ কথা বলে। শাঙ্কো বলল।

পরের দিন দুপুরে ফ্রান্সিসরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। তারপর চলল। প্রথমে উত্তর দিক থেকে যাবে ফ্রান্সিস এটা ভেবে রেখেছিল।

হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে উদিন্না পাহাড়ের উত্তরে পৌঁছল।

ফ্রান্সিস বলল—প্রথমে দক্ষিণ দিক থেকে দেখেছি একটা বড় ওক গাছ। ঐ গাছটার একটা ডাল ভেঙে রেখেছি যাতে পরে বুঝতে পারি।

উত্তরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলল। খুঁজতে লাগল একটা গাছ। পেল একটা বড় চেস্টনাট গাছ। ফ্রান্সিস গাছটায় উঠে একটা ডাল ভেঙে রাখল।

গাছ থেকে নেমেই দেখল মন্ত্রী আর সেনাপতি কয়েকজন যোদ্ধার সঙ্গে আসছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। মন্ত্রী ওদের কাছে এল। জিজ্ঞেস করল— তোমরাও খোঁজাখুঁজি করছো।

—নকশাটাতে যে ইঙ্গিত পেয়েছি সেটাই সম্বল করে সোনার খনি উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কিছু তথ্য-টথ্য পেলে? মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

—তেমন কিছু না। ফ্রান্সিস বলল।

—আচ্ছা—একটা কথা জানার আছে। মন্ত্রী নকশাটা মেলে ধরে বললেন—

—এই আঁকাবাঁকা জিনিসটা কী?

—আপনার কী মনে হয়? ফ্রান্সিস বলল।

—এটাও একটা নক্‌শা। কিন্তু এই দুর্বোধ্য নকশা ঠিক কী বলছে বুঝতে পারছি না। মন্ত্রী বললেন।

—এটা বড় নকশার একটা অংশ। ফ্রান্সিস বলল।

—পাহাড়টা বুঝেছি। কিন্তু এই নকশাটা বুঝতে পারছি না। মন্ত্রী বললেন।

ফ্রান্সিস সাবধান হল। ভাবল—ওটা যে একটা চারাগাছ একথা বললে মন্ত্রীর সন্দেহ হবে। ধরে নেবে আমরা অনেকটা অর্থোদ্ধার করতে পেরেছি। আমরা বিপদে পড়বো।

ফ্রান্সিস বলল—ঐ ছোট নকশাটা আমরাও বুঝিনি তবে বুঝতে চেষ্টা করছি— ওটা নিয়ে ভাবছি।

—ঠিক আছে—মন্ত্রী বললেন—তোমরা তোমাদের মত খোঁজ আমরা আমাদের মত খুঁজি। হয়তো আমরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হব। মন্ত্রী বললেন।

—তাহলে তো সব চুকেই গেল। ফ্রান্সিস বলল।

—চলি। মন্ত্রীমশাই কথাটা বলে হাঁটতে শুরু করলেন।

ফ্রান্সিস শাঙ্কো আবার পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাছ খুঁজতে লাগল।

আর একটা শিশুগাছ পেল। শাঙ্কো গাছটার একটা ডাল ভেঙে চলে এল। ফ্রান্সিস বলল—

—এই গাছটা পাহাড়ের দক্ষিণাংশে। তার মানে রাজা আত্তাদিয়ার রাজত্বের মধ্যে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা আসছে তখনই আত্তারিয়ার সেনাপতিকে আসতে দেখল। ও বুঝল ওরা দক্ষিণাংশে চলে এসেছে।

সেনাপতি কাছে এল। ফ্রান্সিসকে দেখে বলল—তোমরা রাজা হুয়াল্লার রাজত্ব থেকে চলে গেছ। তোমরা আমাদের রাজা আত্তারিয়ার হয়ে সোনার খনি খুঁজলে না।

—আমরা রাজা আত্তারিয়া আর রাজা হুয়াল্লা দুজনের জন্যেই সোনার খনি খুঁজব। ফ্রান্সিস বলল।

—দুই রাজাকেই সন্তুষ্ট করতে পারবে? সেনাপতি বলল।

—দেখি। সোনার খনি আবিষ্কারের আশায় আছি। আবিষ্কার করতে পারলে তখন দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা ফিরে এল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস গুপ্ত সোনার খনির কিছু হদিশ করতে পারলে?

—গাছ আর পাহাড় এই দুটো ঠিক ঠিক বুঝতে পারলে সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—খুঁজবো—সোনার খনি। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার কিন্তু কখনও কখনও মনে হচ্ছে এই নকশা একটা কাঁচা হাতে আঁকা ছবি। অর্থহীন। শাঙ্কো বলল।

—আমি এটা মানতে রাজি নই। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস নকশাটা বের করল এটা আসল নকশা নয়। ফ্রান্সিস নকল করে রেখেছে এটা। মশালের আলোয় নকশাটা বোঝাতে লাগল। বলল—দুটো জিনিস লক্ষ্য কর। একটা চারা গাছ—নিষপত্র মানে পাতা ঝরা গাছ। দ্বিতীয়টা হল—একটা পাথরের পাটায় গোল চিহ্ন। বোঝাই যাচ্ছে পাথর কুঁদে কুঁদে এই গোল দাগটা করা হয়েছে।

—গোল দাগটা অর্থহীন। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে তো পুরো নকশাটাই অর্থহীন হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—যাই বল—এটা একটা ভূতুড়ে নকশা। শাঙ্কো বলল।

—আমার তা মনে হয় না। কিছুটা এগোই তখন বুঝতে পারবো। এটা ভূতুড়ে নকশা না অর্থ আছে এমন নকশা। ফ্রান্সিস বলল।

—হবে হয়তো। শাঙ্কো বলল।

—এখন ঘুমোও। কালকে খোঁজাখুঁজি আছে। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বিছানায় দুচারবার এপাশ-ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিসরা সবেমাত্র সকালের খাবার খেয়েছে সেনাপতি ঢুকল। বলল—মাননীয় রাজা হুয়াল্পা তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। চল।

—হঠাৎ রাজা ডেকে পাঠালেন—কী ব্যাপার বলুন তো। শাঙ্কো বলল।

—রাজা হুয়াল্পা কেন তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন—আমি জানি না। তবে এখন থেকে তোমরা কয়েদঘরে থাকবে এই খবরটা আমাকে জানানো হয়েছে। আমি এইটুকুই জানি—দেরি না—চল। সেনাপতি বলল।

—কী অপরাধ করলাম—বলতে বলতে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কোও উঠল।

সেনাপতির পেছনে পেছনে ওরা চলল রাজবাড়ির দিকে।

রাজার রাজসভায় এল তিনজনে। তখন বিচার চলছিল। রাজা ফ্রান্সিসদের দেখল। কিছু বলল না। বিচারের রায় দিলেন রাজা। তারপর গলা চড়িয়ে বললেন— আজকে আর বিচার হবে না। সভা এখানেই শেষ।

রাজসভা থেকে লোকেরা চলে যেতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সভায় রইল রাজা মন্ত্রী অমাত্য আর প্রহরীরা। আর রইল সেনাপতি ও ফ্রান্সিসরা।

—তোমাদের কয়েদঘরে পাঠানো হবে। মন্ত্রী বললেন।

—কেন? কী অপরাধ করেছি আমরা? শাঙ্কো বলল।

এবার রাজা হুয়াল্লা বললেন—উত্তর দিকে এক ছোট দেশে আমার এক বন্ধু ওখানকার রাজা। ওখানে গৃহযুদ্ধ চলছে। বন্ধু যোদ্ধা চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছে। ওখানে একশ যোদ্ধা পাঠিয়েছি মাত্র দশদিন আগে। ঠিক এই সময়ই রাজা আত্তারিয়া আমার দেশ আক্রমণ করতে তৈরি হচ্ছে। আত্তারিয়া কী করে জেনেছে যে আমার যোদ্ধা সংখ্যা কমে গেছে। এটা নিশ্চয়ই তোমাদের কাজ। তোমরাই আত্তারিয়াকে খবরটা জানিয়েছো। রাজা আত্তারিয়া এই সুযোগটাই খুঁজছিল। তোমাদের জন্যই রাজা আত্তারিয়া আমার দেশ আক্রমণ করার জন্য তৈরি হয়েছে। বন্ধুকে পাঠানো যোদ্ধারা ফিরে আসার আগেই আত্তারিয়া আক্রমণ করবে।

—আপনি আমাদের ভুল বুঝেছেন। এসব ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের কোনরকম যোগ নেই। একশ যোদ্ধা পাঠিয়েছেন এটা আপনার মুখ থেকেই প্রথম জানলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—মিথ্যে কথা। সব মিথ্যে। তোমরা সব জানো। রাজা বললেন।

—আমাদের বিশ্বাস করুন। ফ্রান্সিস বলল।

—না। তোমাদের আমি বিশ্বাস করি না। হুয়াল্লা কথাটা বলে সেনাপতির দিকে তাকালেন। বললেন—এই দুই গুপ্তচরকে কয়েদখানায় ঢোকাও। সেনাপতি এগিয়ে এল।

একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—কিন্তু সোনার খনির অনুসন্ধান করা—। ফ্রান্সিসদের কথাটা শেষ হবার আগেই রাজা হুয়াল্লা যেন গর্জন করে উঠলেন সোনার খনি—মিথ্যে—আমাকে ভুল বোঝানো হয়েছে। রাজা মন্ত্রীর দিকে হাত বাড়াল। মন্ত্রী নকশাটা রাজাকে দিল। রাজা নকশাটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললেন।

—তাহলে তো আমাদের আর এই দেশে থাকার কোন অর্থ হয় না। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ কিছুদিন দণ্ডভোগের পর তোমরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে—আমার হুকুম। রাজা হুয়াল্লা বললেন।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকাল। তারপর আস্তে বলল—

—মাননীয় রাজা আপনি আমাদের মিথ্যে সন্দেহ করে আমাদের দুঃখ দিলেন। সোনার খনি মিথ্যে নয়। আমাকে অনুসন্ধান করতে দিলে আমি সোনার খনি উদ্ধার করে দেখাতাম আপনাকে ভুল বোঝাইনি। এই উদিন্না পাহাড়েই আছে সোনার খনি।

—ওসব বলে লাভ নেই। তোমাদের দণ্ডভোগ করতেই হবে। রাজা বললেন।

সেনাপতি ফ্রান্সিসদের কাছে এসে বলল—চল।

ফ্রান্সিসরা কয়েদঘরের দরজার কাছে এল। সেনাপতি ইঙ্গিত করল। প্রহরী দরজা খুলে দিল। লোহার দরজা ঢংঢং শব্দে খুলে গেল। ফ্রান্সিসরা ঢুকল। দুজনে পাথরের দেওয়ালে পিঠ রেখে বসল। কেউ কোন কথা বলল না।

রাতের খাবার একটু তাড়াতাড়িই এল। ফ্রান্সিসরা খেয়ে নিল।

দুজনেই ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস পালাতে হবে।

—সে তো হবেই। কিন্তু কয়েকটা দিন অপেক্ষা করি। রাজা আত্তারিয়া এই দেশ আক্রমণ করবেই। আমরা লড়াইয়ের ডামাডোলের মধ্যে পালিয়ে যাবো।

—পালিয়ে কোথায় যাবে? জাহাজঘাটে? শাঙ্কো বলল।

—না। রাজা আত্তারিয়ার রাজত্বে লুকিয়ে থাকবো। তারপর নকশার অর্থ বের করে সোনার খনির হদিশ বের করব। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো আরো কিছুদিন এখানে থাকতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। তা তো হবে। আমি নিশ্চিত নকশাটা সত্যি। ভূতুড়ে নকশা নয়। ফ্রান্সিস বলল।

—অল্প দিনের মধ্যেই সোনার খনি উদ্ধার করতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো—এখন ঘুমোও। শরীর সুস্থ রাখতে হবে। অসুস্থ হয়ে পড়লে সব মাটি। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস আবার শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বসে ছিল। বলল—ফ্রান্সিস কী করবে এখন?

—সোনার খনি খুঁজবো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা হুয়াল্পা তো তোমার দেওয়া নকশা ছিঁড়ে ফেলল।

—তাতে কী? আমার মনে নকশা অমলিন। মনে করলেই চোখের সামনে ভাসে। সোনার খনি আমি আবিষ্কার করবই। শুধু সময়ের অপেক্ষা। একটু পরে বলল—

এরপরেও আমি খোঁজ চালিয়ে যাবো।

—দুই রাজা কি এখনও তোমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করবে? শাঙ্কো বলল।

—হুয়াল্পা চটেছে। আত্তারিয়া আমাকে সুযোগ দেবে। সোনার লোভ কিন্তু সাংঘাতিক। এই লোভ কেউ এড়াতে পারে না। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—সোনার খনির কথা ভুলে যাও। চলো দেশে ফিরি।

—আগেও বলেছি। এখনও বলছি দেশে এখনই ফেরার ইচ্ছে আমার নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক গে—তুমি যা ভালো বোঝো। শাঙ্কো বলল।

—এখন শুধু বিশ্রাম কর। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু ওদের কপালে বিশ্রাম ছিল না। স্বয়ং সেনাপতি কয়েদঘরে এসে হাজির হল। ঢডাং ঢং শব্দ তুলে লোহার দরজা খুলে গেল। সেনাপতি ঢুকল। ফ্রান্সিসদের কাছে এল। গলা চড়িয়ে বলল—মহামান্য রাজা তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। চল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। সেনাপতির পেছনে পেছনে চলল।

মাঠ পার হয়ে রাজবাড়িতে এল। ওরা দেখল আজ রাজসভায় ভিড় নেই। বিচার চলছে। ওরা অপেক্ষা করতে লাগল।

বিচারের কাজ শেষ হল। সবাই চলে গেল। রাজা হুয়াল্পা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকালেন। বললেন, আমি নিশ্চিত যে তোমরা রাজা আত্তারিয়াকে আমাদের রণসজ্জা যোদ্ধাবাহিনী সম্পর্কে সব খবর পৌঁছে দিয়েছো।

—আপনি ভুল কথা বলছেন। আসন্ন লড়াই সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা যাই বল তোমরা যে গুপ্তচরের কাজ করেছো এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। রাজা বললেন।

—তাহলে তো আমাদের মুক্তির কোন আশাই নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা দুজন যে এখনও বেঁচে আছো তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। রাজা বললেন।

—তার প্রয়োজন নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—কেন? রাজা বললেন।

—কারণ আমরা গুপ্তচরের মত নিন্দনীয় কাজ করিনি—করবোও না। ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব কথা বলে কী লাভ? এই কাজটা করার জন্যে তোমাদের মুক্তি দেওয়া হবে। সোনার খনি খুঁজতে দেওয়া হবে।

—গুপ্তখনি পেলে যতটা সোনা পাবো তার অর্ধেক তোমাদের দেওয়া হবে। রাজা ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফ্রান্সিস আস্তে বলল—শাঙ্কো কী করবে?

—মুক্তি তো পাবো। তারপরে দেখা যাক। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে বলল—এধরনের কাজ আমরা কখনও করিনি। কিন্তু আজ এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আমাদের মুক্তির প্রশ্ন। আমরা এখন মনেপ্রাণে চাইছি মুক্তি আর সোনার খনি খুঁজে বের করার কাজ।

—ঠিক আছে। দুটোই পাবে। তাহলে তোমরা আজই যাও। আজই রাতে। দেরি করো না। আমি দুটি কথা জানতে চাই। কোনদিন আত্তারিয়া আক্রমণ করবে আর কবে আক্রমণ করবে।

—বেশ। আমরা এখন সৈন্যাবাসে থাকবার জন্যে যে ঘর পেয়েছিলাম সেই ঘরটায় আমাদের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস পড়ে আছে। সে সব নেব। তারপর রাজা আত্তারিয়ার রাজ্যে যাবো।

—বেশ। তাহলে আমাদের সঙ্গে এসো। সেনাপতি বলল।

সেনাপতির পেছনে পেছনে ওরা কয়েদঘর থেকে বাইরে এল। মাঠ পার হয়ে চলল। সেনাপতি চলে গেল। সঙ্গের এক প্রহরী আগের ঘরটার সামনে এল। দরজার তালা খুলে দিল।

ফ্রান্সিসরা ঘরে ঢুকল। প্রহরী বলল—কিছু প্রয়োজন পড়লে জানাবেন। প্রহরী চলে গেল। বিছানায় বসে শাঙ্কো বলল—কখন রওনা হবে?

—আজ রাতে। খাওয়া-দাওয়ার পর। ফ্রান্সিস বলল।

—ভাবছি কী করে খবরটা বের করবে। শাঙ্কো বলল।

—দেখি চেষ্টা করে। দলপতিকে জিজ্ঞেস করবো ভাবছি। ফ্রান্সিস বলল।

—দলপতি যাতে বলে তার চেষ্টা করতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে। দেখা যাক—খবরটা জানা যায় কিনা।

রাতের খাওয়া হল। একটু বিছানায় শুয়ে নিয়ে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল— শাঙ্কো—চল।

দুজনে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন গভীর রাত। আকাশে ভাঙা চাঁদ। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল নয়। চারপাশ বেশ অন্ধকার। ওরা হাঁটতে লাগল।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। ভালোই লাগছিল হাঁটতে।

ভোর ভোর সময়ে গ্যালিগাস পৌঁছল। তখনও রাস্তায় তেমন লোক চলাচল শুরু হয় নি। ফ্রান্সিস বলল—চল—একটা সরাইখানা খুঁজি। দিনকয়েক থাকতে হবে।

কিছুদূর হাঁটতেই ডানদিকে একটা সরাইখানা দেখতে পেল। ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় ঢুকল। মালিক হেসে বলল—আসুন—আসুন। সব রকম খাবারের ব্যবস্থা আছে।

ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় ঢুকল। মালিক পেছনে পেছনে এল।

—আমরা হাতমুখ ধুয়ে আসছি। সকালের খাবার পাঠিয়ে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—অবশ্যই—অবশ্যই। মালিক হেসে বলল।

—শুনুন—এখানে আমরা দু'চারদিন থাকবো। ব্যবসার কাজে।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। মালিক মাথা ঝাঁকাল।

—কেনাকাটার ব্যাপার—বুঝলেন তো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। মালিক আবার মাথা ঝাঁকাল।

—ঠিক আছে আপনি যান। খাবার পাঠিয়ে দিন। সরাইওলা চলে গেল।

ফ্রান্সিস দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসল। বলল—শাঙ্কো আজ থেকেই কাজ শুরু করি। দেরি করবো না।

—দুপুরের খাবার খেয়েই চল। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ চল। প্রথমে সৈন্যাবাসের এলাকায় চল। কোন যোদ্ধাকে একা পেলে ভেতরের খবরটা নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ চল। শাঙ্কো বলল—তবে আরো কয়েকটা উপায় ভেবে রাখো। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ—হুঁ ভেবেছি। চল—এই উপায়টা কাজে লাগে কিনা দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজার যোদ্ধাদের আবাস রাজবাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। দুজনে অল্পক্ষণেই সেখানে পৌঁছল। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

মাঠে যোদ্ধারা ব্যায়াম ট্যায়াম করছিল। আবাস ফাঁকা। সব যোদ্ধাই মাঠে।

ফ্রান্সিসরা আবাসের বাইরে একটা শিশুগাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছু পরে ব্যায়াম শিক্ষাদান ও যোদ্ধাদের অংশগ্রহণ শেষ হল। কিছু যোদ্ধা আবাসের বাইরে এল। বাইরে একটামাত্র মিষ্টির দোকান। যোদ্ধারা দোকানে ঢুকল। গলা চড়িয়ে দু'তিন জন খাবার খেতে চাইল।

—জলদি চল। ফ্রান্সিস আস্তে বলল। তারপর চলল মিষ্টির দোকানের দিকে।

ফ্রান্সিসরা দোকানে ঢুকল। কিন্তু জায়গা নেই। বাইরে বেরিয়ে এল। একজন যোদ্ধা খাবার বাইরে এনে খাচ্ছিল। ফ্রান্সিস তার কাছে গেল। হেসে উঠে যোদ্ধাটার পিঠে চাপড় মারল।

—তুই সৈন্যদলে আছিস? যোদ্ধা ফ্রান্সিসের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বলল—আমাকে চিনতে পাচ্ছিস্ না। যোদ্ধা তবু তাকিয়ে রইল। হাসি থামিয়ে বলল—না। আমার ভুল হয়েছে। ঠিক আপনার মত দেখতে আমার এক বন্ধু আছে। আপনাকে ভুল করে—কিছু মনে করবেন না।

ফ্রান্সিসের কাণ্ড দেখে শাঙ্কো অনেক কষ্টে হাসি চাপল। ফ্রান্সিস যোদ্ধাকে বলল—আচ্ছা আপনাদের কি রোজই ব্যায়াম করতে হয়?

—দু'বেলা। যোদ্ধাটি বলল।

—কিন্তু ধরুন যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন। তখনও ব্যায়াম করতে হয়? ফ্রান্সিস বলল।

—না। তখন তো যুদ্ধাস্ত্র চালানো। ব্যায়ামের সময় কই। যোদ্ধাটি বলল।

—কোথায় কখন যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন সেটা কি আপনারা রওনা হওয়ার দিন জানলেন—না আগে থেকেই জানেন। ফ্রান্সিস বলল।

—তার ঠিক নেই। তবে আগে থেকে আমরা সেনাপতির ব্যস্ততা দেখে বুঝি। যোদ্ধাটি বলল।

—কোথায় লড়াই করতে যেতে হবে সেটা আগে থাকতে জানেন? ফ্রান্সিস বলল।

—মোটামুটি একটা ধারণা হয়। যোদ্ধাটি বলল।

—এই যে উত্তরের রাজা হুয়াল্পার সঙ্গে আপনাদের লড়াই হবে সেটা কি জানেন? ফ্রান্সিস বলল।

যোদ্ধা ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—আপনি কী করে জানলেন?

—রাজা হুয়াল্পার রাজ্যে বেড়াতে গিয়েছিলাম সেখানেই জেনেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছেন। যোদ্ধাটি বলল।

—কিন্তু সমস্যা আপনারা কবে কখন লড়াইয়ে নামছেন সেটা তো ঐ রাজ্যের যোদ্ধারা জানে না। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। আভাসে কিছু শুনেছেন কী? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আসছে সোমবার রাতে রাজা হুয়াল্পার রাজ্য আক্রমণ করা হবে। যোদ্ধাটি বলল।

—জোর লড়াই হবে তাই না? ফ্রান্সিস বলল।

—তা তো বটেই। যোদ্ধাটি বলল।

—আপনারা কি জানেন রাজা হুয়াল্পা তার এক বন্ধু রাজাকে একশোজন সৈন্য ধার দিয়েছেন। ফ্রান্সিস বলল।

যোদ্ধা এবার একটু হাসল। বলল—আমরা জানি। তাই আক্রমণের জন্য এই সময়টা বেছে নেওয়া হয়েছে।

—অনেক ধন্যবাদ ভাই। আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি। লড়াই লাগবে সেটা জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াতে পারবো। তাই এত কিছু জানতে চাইছি। আবার ধন্যবাদ। চলি। ফ্রান্সিস একটু পা চালিয়ে চলল বড় রাস্তার দিকে। শাঙ্কোও ছুটে এসে পাশে দাঁড়াল।

—এত জোরে হাঁটার কী হল? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—ওদের সেনাপতি মাঠে এসেছে। যোদ্ধাদের কিছু নির্দেশ-টির্দেশ দেবে বোধহয়। সৈন্যদের মধ্যে আমাদের দেখলেই বিপদ। সেনাপতির তখন সন্দেহ হতে পারে। কাজেই পালাও।

দুজন খুব দ্রুত হেঁটে বড় রাস্তায় এল। এবার আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল।

দুজনে শেষ বিকেলে সরাইখানায় পৌঁছল।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। সরাইখানার রাঁধুনি মাংসের বড়া দিয়ে গেল। দুজনে হাপুস হুপুস খেল। বেশ খিদে পেয়েছিল।

—এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—রাজা হুয়াল্পার রাজত্বে যাবো। যে সব খবর সংগ্রহ করেছি সেসব জানালে রাজা হুয়াল্পা খুব খুশি হবে। আমাদের মুক্তি দেবে। সোনার খনি খুঁজতে আমাদের সাহায্য করবে। কারণ সোনার লোভ। খুব কম মানুষই এই লোভ সামলাতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে কয়েকটা দিন এখানে থাকবে? শাঙ্কো বলল।

—না না। আজ রাতেই রওনা হব। মারিয়া বন্ধুরা জাহাজঘাটায় আছে। আমাদের জন্যে খুবই চিন্তা করছে। সব কাজ দ্রুত সারতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে শুয়ে পড়ল। শেষ রাতে রওনা দেবে রাজা হুয়াল্পার রাজ্যের দিকে। কিন্তু সেটা হল না।

সরাইখানার দরজায় কারা চাপড় দিচ্ছে। সরাইওয়ালার গলা শোনা গেল—যা—ই। সরাইখানার মালিক দরজা খুলে দিল। অল্প আলোয় দেখল—স্বয়ং সেনাপতি দাঁড়িয়ে।

মালিক হতবাক। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে বলল—আসুন—আসুন। কী সৌভাগ্য আমার।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। দেশের গণ্যমান্য কেউ একজন এসেছে বোঝা গেল কিন্তু সে কে তা বোঝা গেল না। ততক্ষণে সেনাপতির সঙ্গে আসা যোদ্ধারা তল্লাশী শুরু করেছে। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দ্রুত পেছনের দরজার দিকে ছুটল। দেখল পেছনের দরজা আটকপাটি বন্ধ। যোদ্ধারা ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসরা বাধা দিল না। এরকম নিরস্ত্র অবস্থায় বাধা দিতে যাওয়া মানে মৃত্যু।

যোদ্ধারা ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। সেনাপতি ফ্রান্সিসদের দেখে বলল—অ—তোমরা। রাজাকে আর আমার যোদ্ধাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিলে।

—আমরা পালাই নি। রাজা হুয়াল্পার যোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়েছিলাম। কয়েকদিন কয়েদখানায় কাটাতে হয়েছিল। শাঙ্কো বলল।

—এখানেও কয়েদখানায় থাকতে হবে। অবশ্যই মাননীয় রাজা যদি তোমাদের মুক্তি দেন—সেটা আলাদা কথা। সেনাপতি বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

—যে নকশাটা তুমি দিয়েছো—সেটা আমরা খুব মনোযোগের সঙ্গে তা দেখেছি। বুঝেছি—ওটা জাল নকশা। তুমি আমাদের ধোঁকা দিয়েছো। সেনাপতি বলল।

—আমি বলছি নকশাটা জাল না। আমি সেটা প্রমাণও করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—রাজা আত্তারিয়া বোধহয় তোমাকে সেই সুযোগ দেবে না। সেনাপতি বলল।

—সেই ক্ষেত্রে আমরা জাহাজে ফিরে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—সেই সুযোগটাও তোমাদের হয়তো দেওয়া হবে না। সেনাপতি বলল।

—হাতে তরোয়াল থাকলে আমি শয়তানকেও ভয় করি না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে, আগে দেখা যাক রাজা তোমাদের কি শাস্তি দেন। সেনাপতি বলল।

—আমরা কোন অন্যায় করিনি অপরাধ করিনি যে আমাদের শাস্তি দেবেন। শাঙ্কো বলল।

রাস্তার একটা মোড়ের কাছে এসে সেনাপতি বলল—

—আমাকে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি যাচ্ছি।

সেনাপতি দলপতির দিকে তাকিয়ে বলল—এদের কয়েদখানায় ঢোকাবি। কাল রাজসভায় এদের আনা হবে। সাবধান—পালিয়ে না যায়।

সেনাপতি ডানদিকের রাস্তার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এবার ফ্রান্সিস শাঙ্কোর কাছে সরে এল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল—সামনে দেখ। একটা বিরাট শিশুগাছ। জায়গাটায় অন্ধকার বেশি। লাফ দিয়ে পালাব। রাজা হুয়াল্পার কাছে যাব। লড়াইয়ের ব্যাপারে আমরা যা জেনেছি সব বলবে। পেছন থেকে দলপতি বলল—ফিস্ ফিস্ করে কী কথা হচ্ছে?

—আমার বিয়ের ব্যাপারে। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে বলতে পারো। বিয়ে বলে কথা। দলপতি হেসে বলল।

দুজনেরই হাত বাঁধা। সবাই তখন শিশুগাছের কাছে এসেছে। শাঙ্কো দুহাত তুলে রাস্তা থেকে লাফ দিয়ে শিশুগাছটার গোড়ায় গিয়ে পড়ল।

তখনই দলপতি শাঙ্কোকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল।

বর্শাটা গাছটার গায়ে বিঁধে গেল। শাঙ্কো ততক্ষণে জংলা গাছের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে।

দলপতির নির্দেশমত এক প্রহরী গিয়ে বর্শাটা গাছের গা থেকে খুলে আনল।

দলপতি গলা চড়িয়ে বলল—সব সাবধান। এরা কিন্তু ধুরন্ধর। সুযোগ পেলেই পালাবে।

ভোর হল। তখনও ফ্রান্সিসরা চলেছে।

বেশ বেলায় কয়েদঘরের সামনে পৌঁছল। সেই প্রহরীরা এগিয়ে আসা। সেই ঢডাংঢং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খোলা হল। সেই বন্দী জীবন! কিছুই করার নেই। তবে ফ্রান্সিস ভাবে পালানোর ফন্দী নকশার অর্থ এসব ভাবব।

একটু বেলায় খাওয়াদাওয়া হল। সারা সন্ধ্যে দরজার ফাঁক দিয়ে মাঠের সবুজ ঘাসের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাটাল। একটা চিন্তা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। সেটা হল শাঙ্কোর কথা। পালাতে পেরেছে। কিন্তু পরের কাজগুলো করতে পেরেছে কিনা। রাজা হুয়াল্পাকে সব কথা বলতে পেরেছে কিনা কোথাও আশ্রয় পেয়েছে কিনা। ফ্রান্সিস ভাবল—এখানে তো লড়াই শুরু হবে সামনের সোমবার। লড়াইয়ের সময় মারামারি কাটাকাটি চলবে। সেই সুযোগে ও হুয়াল্পার রাজত্বে চলে যাবে। শাঙ্কোকে খুঁজে বের করবে। তারপর দু'জনে মিলে সোনার খনি আবিষ্কার করবে।

পরদিন একটু সকালের খাবার খাচ্ছে তখনই দলপতি কয়েদঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিসের কাছে গিয়ে বলল—তোমার এক বন্ধু তো পালিয়েছে। তুমি কী করবে?

—রাজা হুয়াল্পার সঙ্গে কথা বলে স্থির করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। যাকগে তুমি রাজসভায় চল। দলপতি বলল।

—চলুন। ফ্রান্সিস বলল।

মাঠ পার হয়ে রাজবাড়িতে এল দুজনে। রাজসভায় ঢুকল। তখন বিচারের কাজ চলছে। ফ্রান্সিস বার বার চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। শাঙ্কোকে দেখতে পেল না। ভেবে পেল না শাঙ্কো কোথায় আছে? শাঙ্কো পালিয়েছে। বন্দী হলে কয়েদঘরেই থাকতে হত। মনে হয় শাঙ্কো যে অবশ্য প্রয়োজনীয় খবর রাজা হুয়াল্পাকে দিয়েছে তাতেই ও ধরা পড়লেও মুক্তি পেয়েছে।

ফ্রান্সিসের ডাক পড়ল। সেনাপতি ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল—এই বিদেশী খনি সম্পর্কে বেশ কিছু জানে। একে বন্দী করতে হবে। ওর কথা ফাঁস হয়ে গেলে সোনার খনি কোনদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

—মাননীয় রাজা—যে সব সংবাদ আপনি জানতে চেয়ে আমাদের পাঠিয়েছিলেন সেই সংবাদ আমার বন্ধু দিয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ দিয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। সেইজন্য তোমার বন্ধুকে যোদ্ধাদের আবাসে রেখেছি। রাজা বললেন।

—আমি বন্ধুর কাছে যেতে পারি। ফ্রান্সিস বলল।

—দুজনে একত্র হলে পালাবে। রাজা বললেন।

—না। পালাবো না। পালাতে হলে অনেক আগেই পালাতাম। ফ্রান্সিস বলল।

কিছু পরে ফ্রান্সিসকে দলপতি কয়েদঘরে নিয়ে এল।

ওদিকে শাঙ্কো তো পালাল। জংলা গাছপালা দুহাতে সরিয়ে সরিয়ে শাঙ্কো একটু দূরেই চলে এল। কান পাতল। দলপতির দল থেকে কারো কোন কথা শুনতে পেল না।

জংলা গাছ সরিয়ে সরিয়ে এল। শরীরের অনেক জায়গা ছড়ে গেছে। দু এক জায়গা কেটেও গেছে।

দুদিকে ভালো করে দেখে শাঙ্কো রাস্তায় নামল।

চলল। আজ আর রাজার সঙ্গে দেখা করা যাবে না। কাল সকালে দেখা করবে রাজসভায় নয়। অন্য কোন ঘরে। লড়াইয়ের যে খবর ও এনেছে সেটা অত্যন্ত গোপনে রাজাকে জানাতে হবে।

একটা সরাইখানা খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি আলগা করে তিনটি স্বর্ণমুদ্রা পেল। যাক দিন কয়েক বেশ চলে যাবে।

ও সরাইখানায় ঢুকল। যে ছোকরা খাবার টাবার দিচ্ছিল। তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। ছোকরাটা এল। শাঙ্কো কাঠের পাটাতনে বসল। দু'পাত্র জল খেয়ে মালিকের কাছে গেল। মালিক হাসিমুখে বলল—আপনি কি—

—হ্যাঁ। থাকবো। খাবো। কতদিন থাকবো সেটা পরে জানাবো।

—ঠিক আছে—ঠিক আছে। সরাইওয়ালা হেসে বলল।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পরে শুয়ে পড়ল। কালকে আসল কাজটা করতে হবে অর্থাৎ লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো দিতে হবে রাজা হুয়াল্লাকে। রাজা কী করে দেখা যাক।

পরদিন। সকালের খাবার খেয়ে চলল রাজবাড়ির দিকে। যখন রাজসভায় ঢুকছে তখনই দেখল সেনাপতি আসছে। শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। সেনাপতি কাছে আসতে শাঙ্কো বলল—মাননীয় সেনাপতি—একটা কথা ছিল। সেনাপতি শাঙ্কোর দিকে তাকাল। চিনল। বলল—তুমি একা। বন্ধু কোথায়?

—ওর সঙ্গে এখনও আমার দেখা হয় নি। শাঙ্কো বলল।

—কিছু বলবে? সেনাপতি বলল।

—গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা কথা রাজাকে বলবো। এই রাজসভায় যেসব বলা যাবে না। অন্য কোন জায়গায় হলে ভালো হয়। শাঙ্কো বলল।

—কোন ব্যাপারে? সেনাপতি বলল।

—লড়াইয়ের ব্যাপারে। শাঙ্কো বলল।

—ও। আমাকে বলা যাবে না? সেনাপতি বলল।

—না। সর্বপ্রথম ব্যাপারটা রাজাকে বলতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—বেশ। অপেক্ষা করো। সভা শেষ হলে রাজাকে মন্ত্রণাঘরে নিয়ে যাবো। সেখানে এসে তুমি তোমার কথা ব'লো। সেনাপতি বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল।

সেনাপতি চলে গেল। শাঙ্কো দাঁড়িয়ে রইল।

রাজসভার কাজ শেষ হল। রাজা আসন থেকে উঠলেন। তখনই সেনাপতি রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। কিছু বলল।

রাজা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। রাজা বাইরের দিকে মন্ত্রণাকক্ষে এলেন। বসলেন।

সেনাপতি শাঙ্কোকে নিয়ে ঢুকল। সেনাপতি আবলুস কাঠের তৈরি আসনে বসল। রাজা শাঙ্কোকে ইঙ্গিতে বসতে বলল।

শাঙ্কো বুঝে উঠতে পারছে না কীভাবে কথা শুরু করবে। ফ্রান্সিস হ্যারির অভাব বেশ অনুভব করছিল। রাজা বলল—

—রাজা আত্তারিয়া সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়েছে এ খবর আমরা জানি। তুমি আর কী সংবাদ এনেছো? রাজা বললেন।

—আগামী সোমবার রাতে রাজা আত্তারিয়া আপনার দেশ আক্রমণ করবে। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। শাঙ্কো বলল।

—হঁ। হাতে সময় নেই। আর কী খবর এনেছো? রাজা বললেন।

আপনি যে একশ যোদ্ধাকে অন্যত্র পাঠিয়েছেন এটা রাজা আত্তারিয়া জানেন। শাঙ্কো বলল।

আর তাই লড়াইয়ের জন্যে এই সময়টা বেচেছে। রাজা বললেন।

হ্যাঁ। শাঙ্কো মাথা ওঠানামা করল।

রাজা সেনাপতির মুখের দিকে তাকালেন। বললেন—আপনি তো রাজা আত্তারিয়ার আক্রমণের দিন কাল সবই জানলেন। আজ থেকেই লড়াই-এর জন্য যোদ্ধাদের তৈরি করুন।

নিশ্চয়ই। আজ দুপুর থেকে লড়াইয়ের জন্য যোদ্ধাদের তৈরি করার কাজ শুরু করবো। সেনাপতি বলল। রাজা একটু ভেবে বললেন।

তোমার নাম কী?

শাঙ্কো। শাঙ্কো বলল।

তোমাকে কিন্তু সৈন্যাবাসে থাকতে হবে। তোমার দেওয়া সংবাদ যদি সত্যি হয় তবে তোমাকে অনেক কিছু দেওয়া হবে। আর যদি মিথ্যে হয় তাহলে তোমাকে সারাজীবন কয়েদঘরে থাকতে হবে। রাজা বললেন।

—ঠিক আছে।—শাঙ্কো বলল।

রাজা উঠে দাঁড়ালেন। রাজা রাজবাড়িতে চলে গেলে শাঙ্কো সেনাপতির সঙ্গে বাইরের মাঠে এল। একজন যোদ্ধা আবাসের দিকে যাচ্ছিল। সেনাপতি ইশারায় ডাকল। যোদ্ধাটি একটু মাথা নুইয়ে কাছে এল। সেনাপতি বলল তোমাদের দলপতিকে এখানে আসতে বল। যোদ্ধাটি চলে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দলপতি ছুটতে ছুটতে এল। একবার মাথা নুইয়ে সেনাপতির সামনে এসে দাঁড়াল। তখনও হাঁপাচ্ছে। সেনাপতি শাঙ্কোকে দেখিয়ে বলল—এ বিদেশি। ওর এক বন্ধুও আছে। যাকগে—একে থাকবার জন্যে একটা ঘর দাও। দেখো যেন ওর কোন অসুবিধে না হয়।

—ঠিক আছে। দলপতি মাথা নুইয়ে বলল।

সেনাপতি চলে গেল। দলপতি শাঙ্কোকে বলল—চল। এদিকে ওদিকে দেখে টেখে দলপতি একটা ভাল ঘরেই শাঙ্কোকে থাকতে বলল। সেনাপতি চলে গেল।

শাঙ্কো ঘরে ঢুকে কাঠের পাটাতনে বসল। প্রথম চিন্তাটাই হল—ফ্রান্সিস কোথায়? ও তো বন্দী হল। সোমবার লড়াই শুরু হলে তবেই ওর সংবাদ সঠিক হবে। তখন নিশ্চয় ওকে আর ফ্রান্সিসকে মুক্তি দেওয়া হবে।

আবার অন্য দিকটাও ভাবা যায়। সোমবার রাতে আক্রমণ না হলে শাঙ্কোকে চিরজীবনের জন্যে কয়েদঘরে থাকতে হবে। তার চেয়ে মৃত্যুও ভালো। শাঙ্কো ভাবল ওকে ধরার আগেই ও পালাবে। লড়াই গোলমালে কে আর ওকে বন্দী করতে আসবে। তখন যে যার জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত। কে আর ওর দিকে নজর দেবে? তবু ওর মন থেকে ভয় গেল না। কী হবে কে জানে।

ফ্রান্সিস কয়েদঘরে আছে—এটা শাঙ্কো শুনেছে। এবার ফ্রান্সিসের সঙ্গে একবার কথা বলতে হয়। এবার এরা কী করবে? ফ্রান্সিস কী ভেবেছে জানতে পারবে। ও নিজের কথাও বলতে পারবে।

পাহারাদার খাবার নিয়ে এল। খাবার খেতে খেতে শাঙ্কো বলল—একবার দলপতিকে ডেকে দাও না।

—এই রাতে উনি আসবেনই না। পাহারাদার বলল।

—তবু বল ভাই যে আমি তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো খাওয়া শেষ করল। পাহারাদার চলে যাচ্ছে তখন শাঙ্কো আর একবার দলপতিকে ডেকে দেওয়ার কথাটা বলল।

শাঙ্কো শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। যদি দলপতি আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝল দলপতি আসবে না। বৃথা প্রতীক্ষা। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে শাঙ্কো ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালের খাবার খাওয়া হয়েছে তখনই দলপতি ঢুকল। বলল—কী ব্যাপার আমার সঙ্গে তুমি দেখা করতে চেয়েছো কেন?

—আমাকে একটা অনুমতি দিতেই হবে। শাঙ্কো বলল।

—কীসের অনুমতি। দলপতি বলল।

—আমার এক বন্ধু কয়েদঘরে রয়েছে। বন্দী। শাঙ্কো বলল।

—ও। হ্যাঁ, হ্যাঁ একজন বিদেশী আছে বটে। দলপতি বলল।

—বন্ধুর সঙ্গে আমি কথা বলবো। অল্পক্ষণ। শাঙ্কো বলল।

—কী নিয়ে কথা বলবে। দলপতি বলল।

—কবে এখান থেকে চলে যাবো। গ্যালিগস বন্দর শহরে আমাদের জাহাজ নোঙর করে আছে। আমাদের জাহাজে যাবো। তারপর স্বদেশের দিকে যাত্রা শুরু করব। শাঙ্কো বলল।

—আগে দেখ—রাজা কী বলেন। তুমি না হয় ছাড়া আছো কিন্তু তোমার বন্ধু তো কয়েদঘরে। ও তো ছাড়া পাবে না। সেনাপতি বলল।

—বন্ধুকে মুক্তি দিতে রাজাকে রাজি করাবো। শাঙ্কো বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। দলপতি বলল।

—এবার আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দিন। শাঙ্কো বলল। দলপতি মাথা নিচু করে কী ভাবল। মাথা তুলে বলল—এরকম অনুমতি দেওয়া খুবই বিপজ্জনক। আমি তোমাদের দেখা করতে অনুমতি দিয়েছি এটা জানাজানি হলে আমি বিপদে পড়বো। সবচেয়ে ভালো হয় প্রহরীদের একজন—নিমতা রাত বারোটার পর একা থাকে। নিমতাকে যদি রাজি করাতে পার তাহলে ও তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। এ ছাড়া অন্য কোনভাবে হবে না। দলপতি বলল।

—ঠিক আছে। আজকেই নিমতার সঙ্গে কথা বলবো। শাঙ্কো বলল।

—দেখ বলে। দলপতি চলে গেল।

শাঙ্কো নিজের ঘরে এল। কী ভাবে নিমতাকে পাওয়া যাবে? বিছানায় শুয়ে পড়ল শাঙ্কো। ভাবতে লাগল কীভাবে নিমতার সঙ্গে কথা বলবে।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর শাঙ্কো শুয়ে পড়ল। একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। শাঙ্কো ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম এল না।

রাত গভীর হচ্ছে। শাঙ্কো মাঝে মাঝেই উঠে দরজায় এসে দাঁড়াতে লাগল। নিমতা কখন একা হয়।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে বাইরে এসে দেখল নিমতা একা কয়েদঘরের সামনে বর্শা হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শাঙ্কো একরকম ছুটে এল নিমতার কাছে। নিমতা শাঙ্কোকে দেখে অবাক—এত রাতে কে এল রে বাবা। পরক্ষণেই বুঝল বিদেশী লোকটা এসেছে। নিমতা বলল— কী ব্যাপার? এত রাতে এখানে এসেছো কেন? শাঙ্কো ডাকল—

—নিমতা?

—হুঁ বল। নিমতা বলল।

—আমার এক প্রাণের বন্ধু এইখানে বন্দী হয়ে আছে। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। নিমতা মুখে শব্দ করল।

—তার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই। শাঙ্কো বলল।

—দলপতির লিখিত হুকুম এনেছো? নিমতা বলল।

—না। শাঙ্কো বলল।

—তবে তো দেখা হবে না। নিমতা বলল।

—বলছি—নিমতা—ভাই তুমি এ কাজ না পারলে আর কেউ পারবে না। রাজা তোমার কথায় ওঠেন বসেন। শাঙ্কো বলল।

—এটা কোত্থেকে শুনলে? নিমতা বলল।

—এসব সবাই জানে। শাঙ্কো বলল।

—তা হতে পারে। অনেক ব্যাপারেই রাজা হুয়াল্লা আমার সঙ্গে কথা বলেন। এই যে শোনা যাচ্ছে রাজা আত্তারিয়া আমাদের দেশ আক্রমণ করবে এই নিয়েও রাজা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। নিমতা বলল।

—তাহলে ভাই তুমি অনুমতিটা দাও। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ। বারান্দায় এসে দাঁড়াও। সাবধান—এই ব্যাপারটা পাঁচকান না হয়। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়াল।

—নাম কী? নিমতা বলল।

—ফ্রান্সিস। শাঙ্কো বলল।

—ও। এবার গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস নামে কে আছো—দরজার কাছে এসো।

ফ্রান্সিস তখনও জেগে। রাতের ঘুমটা কমে গেছে। নিমতার ডাক শুনেই ও তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এল। মশালের আলোয় শাঙ্কোকে দেখে ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওঃ একটা সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচলাম।

—বেশিক্ষণ কথা বলা যাবে না। শাঙ্কো বলল।

—তুমি কী করে বন্দীদশা এড়িয়ে গেলে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—লড়াইয়ের ব্যাপারে সংবাদ দিলাম। রাজা হুয়াল্লা খুব খুশি। আমাকে ভালোভাবে যোদ্ধাদের আবাসে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছেন। শাঙ্কো বলল।

—বলেছো—সোমবার রাতে আত্তারিয়া আক্রমণ করবে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—সে সব বলেই বন্দীদশা এড়াতে পারলাম। শাঙ্কো বলল।

—সময় হয়ে গেছে—সময় হয়ে গেছে—নিমতা কথাটা বলতে বলতে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল। দরজায় লোহার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে শাঙ্কো হাত বাড়াল। ফ্রান্সিস ওর হাত চেপে ধরল। দু'জন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। শাঙ্কোর দু'চোখ জলে ভরে উঠল। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। বলল—শাঙ্কো—মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ো না। মন শক্ত কর।

—সময় হয়ে গেছে—সময় হয়ে গেছে—বলতে বলতে নিমতা তখনও পায়চারি করতে লাগল।

—ফ্রান্সিস—যাচ্ছি। খুবই দুশ্চিন্তায় আছি। সোমবার রাতে যদি রাজা আত্তারিয়া আক্রমণ না করে তাহলে মিথ্যে কথা বলার জন্যে রাজা হুয়াল্লা আমাকে ফাঁসি পর্যন্ত দিতে পারে। শাঙ্কো বলল।

—যদি আক্রমণ না করে তুমি পালিয়ে যেও। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—উত্তরের ভিসিয়াভো রাজ্যে চলে যাবো।

তাহলে চলি ফ্রান্সিস। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো বারান্দা থেকে নেমে এল। চলল নিজের ঘরের দিকে। ফ্রান্সিস নিজের জায়গায় এসে শুয়ে পড়ল।

সোমবার এল। শাঙ্কো দুশ্চিন্তায়। কী হবে কে জানে। রাজা আত্তারিয়া তার যোদ্ধাবাহিনীকে নিয়ে রাজা হুয়াল্পার দেশ আক্রমণ করে কিনা এখন সেইটেই দেখার।

সারাদিন কাটল। সন্ধ্যে থেকে যোদ্ধাদের তোড়জোড় শুরু হল। লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হল যোদ্ধারা।

ওর মধ্যেই ভাগ ভাগ করে যোদ্ধারা খেয়ে এল। শাঙ্কোও খেয়ে নিল।

রাত বাড়তে লাগল।

শাঙ্কো শুতে পারল না। একটা চেয়ে পাওয়া বর্শা হাতে নিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। তারপর ক্লান্ত হয়ে বিছানায় বসে পড়ল।

বেশ কিছু পরে ভোর হল। পাখির ডাক শোনা গেল।

শাঙ্কোর একটু তন্দ্রামত এসেছিল। পাখির ডাক শুনে লাফ দিয়ে উঠল। বাইরে তাকিয়ে দেখল সেনাপতি ঘোড়ায় চেপে এসেছে। গলা চড়িয়ে সার বাঁধা যোদ্ধাদের বলল—তোমরা সেনা ছাউনিতে গিয়ে বিশ্রাম কর। তবে খালি হাতে থেকো না। সঙ্গে বর্শা রাখবে। তরোয়ালও কোমরে ঝোলানো থাকবে যাতে আক্রান্ত হলে আমরা লড়তে পারি। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সেনাপতি বলল—তোমাদের তরোয়াল চালানো শেখা হয়েছে বর্শা আর তরোয়াল দুটোই কাজে লাগাবে। যাও। সেনাপতি থামল।

শাঙ্কো এবার তৈরি হতে লাগল। বাইরের দিকে চোখ রেখে কাপড়জামা বদলাল। দেখল—সকালের খাবার নিয়ে দুজন পাহারাদার আসছে।

শাঙ্কো আর দাঁড়াল না। আস্তে আস্তে মাঠ পার হল। রাস্তায় আসতেই শাঙ্কো খুব দ্রুত হাঁটতে লাগল। এক নজর পেছনে তাকিয়ে দেখল ওর ঘরের সামনে কোন যোদ্ধাই দাঁড়িয়ে নেই। ঠিক তখনই দেখল সেনাপতি ওর ঘরের সামনে এসেছে। সঙ্গে দু'জন যোদ্ধা।

শাঙ্কো প্রায় ছুটে চলল। এক নাগাড়ে হাঁটতে লাগল। একবারও থামল না।

দুপুর হতে শাঙ্কো একটা ছোট শহরমত জায়গায় এল। খাবারের দোকান হাতের কাছেই পেল। দোকানে ঢুকে বসল। কাজের ছেলেটা এল। শাঙ্কো রুটি মাংসের বড়া চাইল। ছেলেটি খাবার নিয়ে এল। ও পরপর দু গ্লাশ জল খেল। তারপর খাবার খেতে লাগল। খাবার শেষ। শাঙ্কো আরো খাবার চাইল। ছেলেটি দিয়ে গেল। সেটাও খেয়ে ফেলার পর ঢক্ ঢক্ করে আরো দু'গ্লাশ

জল খেল। এবার উঠে দাঁড়াল। দোকান মালিকের কাছে এল। একটা সোনার চাকতি দিল। দোকান মালিক সোনার চাকরি রেখে ফেরৎ মুদ্রা দিল। বলল—আবার আসবেন। শাঙ্কো বলল—হ্যাঁ আসবো। এবার বলুন তো সামনে কোন রাজ্য আছে।

—ডিসিয়াডো।

—হেঁটে কতক্ষণে ওখানে পৌঁছবো? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—রাত হয়ে যাবে।

—হুঁ।

শাঙ্কো রাস্তায় নামল। এতদূর দ্রুতগতি রেখে হেঁটে এসে খুবই ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। হাঁটতে লাগল তবু।

যখন ডিসিয়াডো পৌঁছল, তখন বেশ রাত। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে একটা সরাইখানা পেল। সরাইখানায় ঢুকল। মালিক একটা পাটাতনে বসে আছে। হেসে বলল—আসুন।

—খাবো থাকবো। শাঙ্কো বলল। তারপর পাটাতনে বসল। মালিক উঠে দাঁড়াল।

—একটু খোঁজ নিয়ে আসি কেমন খাবার আছে। মালিক বলল। তারপর উঠে দাঁড়াল। ভেতরে চলে গেল। ফিরে এসে বলল—মাংস বেশি নেই। তরিতরকারির খাবার যা আছে বোধহয় আপনার হয়ে যাবে।

—আমি কোথায় থাকবো দেখিয়ে দিন। শাঙ্কো বলল।

মালিক শাঙ্কোকে নিয়ে পেছনের ঘরে এল। প্রায় ছ'সাতজন লোক পাটাতনে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। মালিক বলল—

—যেখানে খুশি শোবেন।

—হুঁ। আমি হাত মুখ ধুতে যাচ্ছি। এসেই যেন খাবার পাই। শাঙ্কো বলল।

—নিশ্চয়ই পাবেন। মালিক দেখে বলল।

পেছনে জলের জায়গাটা মালিক শাঙ্কোকে দেখিয়ে দিয়েই চলে গেল।

শাঙ্কো বেশ ভালো করে হাতমুখ ধুলো। মুখে গলায় ধুলোয় ঢাকা ছিল যেন। শাঙ্কো আস্তে আস্তে ফিরে এল।

—আসুন—আসুন। মালিক একটা পাটাতন দেখিয়ে দিল। শাঙ্কো খেতে বসল। রুটির সঙ্গে মাংস খুব কমই দিল। শাঙ্কো ওসব আর ভাবল না। খেতে লাগল। এক দফা শেষ করে আবার খাবার চাইল। মাংস নেই। তরকারিমত জিনিস খেতে দিল। শাঙ্কো সেটাই গপ্ গপ্ খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ। মালিক ওকে যে শোবার জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছিল—সেখানেই শাঙ্কো এল। তারপর শুয়ে পড়ল।

লোকজনের কথাবার্তায় ওর ঘুম ভাঙল। শাঙ্কো উঠে বসল। হাতমুখ ধুয়ে সকালের খাবার খেতে খেতে মালিকের কাছে এল। বলল—এটাই তো ডিসিয়াডো দেশ।

—হ্যাঁ। আপনি কোত্থেকে এসেছেন? সরাইওয়ালা জানতে চাইল।

—য়ুরোপ থেকে। শাঙ্কো বলল।

—বলেন কি? সরাইওয়ালা চমকে উঠল।

—আমরা নতুন নতুন জায়গায় যেতে ভালোবাসি। বিশেষ করে গুপ্তধনটনের খোঁজ পেলে আমরা তা উদ্ধার করি। এরকম জীবনই আমরা ভালোবাসি। শাঙ্কো বলল।

—ও। তা আপনি একাই—সরাইওয়ালা বলতে গেল তার আগেই শাঙ্কো বলল—

—না-না। আমার বন্ধুরাও আছে। গ্যালিভাস বন্দরে আমাদের জাহাজ নোঙর করে আছে। আমরা গেলেই জাহাজ ভাসাবো স্বদেশের দিকে।

—ও। সরাইখানার মালিকের হাঁ মুখ বন্ধ হল।

ঘাসপাতার বিছানায় শুয়ে শাঙ্কো ভাবতে লাগল কী করবে এখন। রাজা আত্তারিয়া বা রাজা হুয়াল্লার দেশে যাওয়া অসম্ভব। আমাকে ধরতে পারলে ফাঁসিও দিতে পারে। একমাত্র উপায় পালিয়ে পালিয়ে গ্যালিগাস যাওয়া। কিন্তু ফ্রান্সিস মুক্তি পেলেই সব ভাবা যাবে। এখন জাহাজে ফিরে যাওয়ার চেয়েও প্রয়োজন উদিন্না পাহাড়ের সোনার খনি উদ্ধার করা। এই খনি আবিষ্কার না করে ফ্রান্সিস এক পাও যাবে না। তবে ফ্রান্সিসের অভিমত কী সেটা জানা না গেলে কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। এখন সামনে একটাই কাজ—ফ্রান্সিসকে কয়েদঘর থেকে মুক্ত করা। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব? ফ্রান্সিস অবশ্য একটা চেষ্টা করে মুক্তি আদায় করতে পারবে। শাঙ্কো জোরে একটা শ্বাস ছাড়ল। ও দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

সকালের খাওয়া খেয়ে শাঙ্কো তৈরি হল। রাজা রাজসভা সব দেখে আসি। শাঙ্কো মালিকের কাছে এল। বলল—রাজসভা দেখতে যাবো। কী করে যাবো?

—এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান। যেতে যেতে ডানদিকে তাকাতে তাকাতে যাবেন—দেখবেন একটা মধুবিক্রির দোকান। থামবেন। দেখবেন কাঠ আর পাথরের তৈরি একটা বড় বাড়ি। ওটাই রাজবাড়ি।

যাই সব দেখেশুনে আসি। শাঙ্কো বলল। তারপর রাস্তায় এলো। মালিকের নির্দেশমত চলল। বেশ কিছুটা আসার পর দেখল একটা মধুর দোকান। বেশ ভিড় দোকানে।

এবার শাঙ্কো দোকানের উল্টোদিকে তাকাল। ঠিক। কাঠপাথর আর শুকনো ঘাসের ছাউনি। ও চলল। রাজসভার ফটকের কাছে দু'জন বর্শাধারী প্রহরী।

রাজসভাঘরে ঢুকতে যাবে তখনই একজন প্রহরী হাত বাড়িয়ে শাঙ্কোকে আটকালো। বলল—তুমি বিদেশী। এখানে কী চাই?

—আমি রাজসভা দেখতে এসেছি।

—হুঁ। যাও। প্রহরী ওকে ছেড়ে দিল।

শাঙ্কো রাজসভার কাছে এল। রাজার বিচার করা চলছে। রাজা একটু বয়স্ক। গায়ে ঢোলা আলখাল্লার মত দামি কাপড়ে তৈরি। গলায় দামি ছোট ছোট পাথর। মাঝখানে একটা মুক্তো বসানো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজসভার কাজ শেষ হল। শাঙ্কো চলল সদর দরজার দিকে। তখনই দেখল একজন প্রহরী ছুটে এল শাঙ্কোর কাছে।

—এই বিদেশী—প্রহরী ডাকল। শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রহরীটা বলল—

—চল। মাননীয় রাজা ডাকছেন।

শাঙ্কো অবাক। এখানে তো সরাইওয়ালা ছাড়া আমাকে কেউ দেখেই নি। সেখানে স্বয়ং রাজা ওকে ডাকবে এতো কল্পনাই করা যায় না। শাঙ্কো বলল—চল।

রাজা ব্রাপেন-এর সামনে এসে শাঙ্কো মাথা একটু নোয়াল।

—তুমি বিদেশি? রাজা ব্রাপেন জিজ্ঞেস করলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নাম শাঙ্কো। শাঙ্কো বলল।

—তুমি কি এখানে একা এসেছো? রাজা বললেন।

—না। আমার বন্ধুরাও আছে। শাঙ্কো বলল।

—কী মতলব নিয়ে এসেছো? রাজা বললেন।

—আমরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেই ভালোবাসি। আর একটা কাজ আমরা করি কোন গুপ্তধনের খবর পেলে আমরা সেই গুপ্তধন উদ্ধার করি।

—হুঁ। শোন আমার গুপ্তচরেরা ছড়িয়ে আছে। তাদের মারফৎ সব খবরই আমি পাই। যেমন—গতরাতে তুমি একটা সরাইখানায় ছিলে। তার কাছেও বলেছো যে তোমরা গুপ্তধন খোঁজো। তেমন খবর পেলেই তোমরা তা উদ্ধার করতে লাগো। ঠিক কিনা?

শাঙ্কো একটু অবাক হল। রাজা তাহলে ওদের খবরও জানে। বলল—

—হ্যাঁ। আপনি ঠিকই বলেছেন। শাঙ্কো বলল।

—তোমরা উদিন্না পাহাড়ের সোনার খনি আবিষ্কার করার চেষ্টায় আছো। রাজা বললেন।

—হ্যাঁ—রাজা আত্তারিয়া এই খোঁজাখুঁজির ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবেন। শাঙ্কো বলল।

—সেই জন্যেই তোমাকে আমাদের কয়েদখনায় বন্দী করে রাখবো। রাজা বললেন।

—আমার বন্ধুরা তো আছে। শাঙ্কো বলল।

—আমি তাদের জানতেও দেব না। কেউ বুঝতেও পারবে না যে তুমি আসলে বন্দী। রাজা বললেন।

—ঠিক বুঝলাম না। শাঙ্কো বলল।

—মানে তুমি সকাল থেকে সারাদিন এখানে ওখানে নির্দেশমত কাজ করবে। সন্ধ্যে হলেই কয়েদখানায় তোমাকে ঢোকানো হবে। রাজা বললেন।

—তারপর? শাঙ্কো বলল।

—কেউ বুঝতেও পারবে না তুমি বন্দী। রাজা বললেন।

—আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন কেন? শাঙ্কো বলল।

—না-না। তোমাকে মরতে দেওয়া হবে না। জীবিত তোমাকেই আমার প্রয়োজন। রাজা বললেন।

—আমি তো সোনার খনি সম্পর্কে কিছুই জানি না। শাঙ্কো বলল।

—জানবে। তোমাকে সময় আর সুযোগ দেওয়া হবে। রাজা বললেন।

শাঙ্কো কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

—সোনার খনি সম্পর্কে কী জানতে পেরেছো? রাজা বললেন।

—এটা আমার এক প্রাণের বন্ধু ফ্রান্সিস সব জানে ও। শাঙ্কো বলল।

—সে কোথায়? রাজা বললেন।

—রাজা ওয়াল্লার কয়েদঘরে। শাঙ্কো বলল।

—তোমাদের ফ্রান্সিসকে এখানে আনার ব্যবস্থা করছি। রাজা বললেন।

—পারবেন? শাঙ্কো বলল।

রাজা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—কয়েদীঘরের প্রহরীরা সব যীশু না। একটা সোনার আধখানা চাকতি দিয়েই তোমার বন্ধু মুক্তি পাবে। আমি সেই ব্যবস্থা করছি। তুমি যদি চাও তোমার বন্ধুকে প্রহরী এখানে পৌঁছে দিয়ে যাবে। রাজা বললেন।

—না—না। ও একা এলেই হবে। আপনার রাজত্বে আসতে পারলেই হল। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। তাই হবে। তোমার বন্ধু আসুক। তারপর গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য তোমাদের কাজে নামতে হবে। রাজা বললেন।

—বেশ। তবে আমার ঐ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেই আমি আমাদের মত বলবো। শাঙ্কো বলল।

—খুব ভালো কথা।

রাজা ব্রাপেন আস্তে দুহাত দিয়ে শব্দ করলেন। একজন ন্যাড়ামাথা লোক রাজার কাছে এল। মাথা একবার নুইয়ে সম্মান জানাল।

—শোন—রাজা বললেন—এ একজন গুপ্তচর। অনেক কঠিন কঠিন কাজ করেছে। এবার ওকে বল তোমার বন্ধু কোন কয়েদঘরে বন্দী হয়ে আছে। দেখতে কেমন পোশাক কেমন এসব বলে দাও।

শাঙ্কো সব বলল। গুপ্তচর মাথা নেড়ে বলল—ঠিক আছে।

গুপ্তচর রাজা ব্রাপেনকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চলে গেল।

শাঙ্কো অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। ও নিজে এখানে পড়ে আছে। ফ্রান্সিস একা। সহজে পালাতে পারবে না। সময় লাগবে। আর জাহাজে ফিরতে দেরি করা চলবে না। রাজকুমারী, বন্ধুরা দুশ্চিন্তায় পড়বে। যা হোক—এখন তো এই রাজা ব্রাপেন ফ্রান্সিসকে মুক্ত করিয়ে আনতে পারে কিনা দেখি।

ওদিকে দু'দিন পরে ফ্রান্সিস রাতে কয়েদঘরে শুয়ে আছে। রাত বাড়ছে। ওর ঘুম আসছে না এখন মাঝে মাঝেই ওর বিনিদ্র রাত কাটে।

রাত গভীর। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। হঠাৎ দেখল এক পাহারাদার আস্তে দরজা খুলল। পাহারাদার সোজা ওর কাছেই এল। মুখ নুইয়ে বলল—তুমিই তো ফ্রান্সিস?

—হ্যাঁ। কেন? কী ব্যাপার? ফ্রান্সিস বলল।

—আমার পেছনে পেছনে এসো। কোনরকম শব্দ করবে না।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। পাহারাদারের পেছনে পেছনে দরজার কাছে এল। পাহারাদারটি আস্তে দরজা খুলে দিল। দুজনে বাইরে এল। পাহারাদার বলল—কোনরকম শব্দ না করে পালিয়ে যাও। ও দেখল একজন পাহারাদার পাথরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুচোখ বোঁজা।

ফ্রান্সিস বারান্দা থেকে নিচে নামল। তারপর দ্রুত প্রায় ছুটে চলল মাঠের শেষের দিকে। জ্যোৎস্না কুয়াশা ঢাকা। তার জন্যে আশপাশ সব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

মাঠ ছাড়িয়ে রাস্তায় এল। ফ্রান্সিস বেশ হাঁপাচ্ছে তখন।

একসময় থামল। ভীষণ হাঁপাতে লাগল।

তখনই দেখল সেই প্রহরী ছুটে আসছে। গলা চড়িয়ে বলল—ভয় পাবে না। আমি বন্ধু।

ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে রইল। প্রহরী কাছে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—তুমি বিভাদাভিয়া যাবে। ঐখানে তোমার এক বন্ধু আছে।

—নাম কী? শাঙ্কো?

—তা জানি না। বিভাদাভিয়া যেতে হলে এই রাস্তা দিয়ে যাবে। এই একটা রাস্তাই সোজা গেলে বিভাদাভিয়া পাবে। এই রাস্তা ওখানেই শেষ। প্রহরী চলে গেল।

ফ্রান্সিস হাঁটতে লাগল।

যেতে যেতেই ভোর হল।

রোদ ছড়ালো। চারদিক আলোয় আলোময় হয়ে উঠল। চারদিকে টানা শস্যক্ষেত। চাষীদের বাড়িঘরদোর।

দুপুর হল। খিদেও পেয়েছে। জল তেষ্টাও পেয়েছে। এক চাষীর বাড়ির সামনে এল। দরজায় আস্তে শব্দ করল। ভেতর থেকে কে বলল—কে?

—আসুন। কথা হবে। ফ্রান্সিস বলল। দরজা খুলে গেল। এক মহিলা দাঁড়িয়ে। বলল—বলুন—কী কাজে এসেছেন।

—আমি বেশ দূর থেকে হেঁটে আসছি। যাবো বিভাদাভিয়া। বড্ড খিদে পেয়েছে। যদি—

—আসুন—আসুন। আপনি আমাদের অতিথি। মহিলাটি সরে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস ঢুকল। দরজা বন্ধ করে মহিলাটি এসে বলল—এই ঘরে আসুন। একটা ঘরে ফ্রান্সিস ঢুকল। কাঠের পাটাতন পাতা।

—শুয়ে বিশ্রাম করুন। মহিলাটি চলে গেল।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সারারাত হেঁটেছে পরিশ্রম হবেই। একটা চিন্তা হল। আমি কত হাজার মাইল পার হয়ে এখানে এসেছি। কত রকম মানুষ দেখলাম। কত মানুষ আমাকে অতিথি বলে সাদরে গ্রহণ করেছে। দ্বীপ দেশ এর পার্থক্য আছে কিন্তু মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি দয়াহীন কুচক্রী মানুষ যেমন আছে তাদের চেয়ে হাজারগুণ ভালো মানুষেরাও আছে।

কিছুক্ষণ পরে মহিলাটি ফ্রান্সিসকে খেতে দিল। এক গোঁফওয়ালা মধ্যবয়সী লোক ঘরে ঢুকল। বলল—পেট পুরে খাবেন। পাতে যেন কিচ্ছু পড়ে না থাকে। ফ্রান্সিস হেসে বলল—আমি খুব ক্ষুধার্ত। আমাকে পেট পুরে খেতেই হবে।

খাওয়া শেষ। মহিলাটি বলল এবার একটু শুয়ে বিশ্রাম করে এখানেই থাকুন রাতটা।

—উপায় নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে বিভাদাভিয়াতে পৌঁছুতে হবে। আচ্ছা—চলি। ভদ্রলোক বললেন—ফেরার পথে এখানে খেয়ে যাবেন।

—ঠিক আছে।

ফ্রান্সিস বাড়ির বাইরে এল। আবার হাঁটা। পরের দিনটাও পথে কাটল। সন্ধ্যের সময় বিভাদাভিয়ায় পৌঁছল। নগরে ঢুকছে তখনই একজন ওর কাছে এল। বলল—আপনি বিদেশি? ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—হ্যাঁ।

—আপনি ফ্রান্সিস?
—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।
—শাঙ্কো আপনার বন্ধু? লোকটি বলল।
—হ্যাঁ—হ্যাঁ—শাঙ্কো কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।
—আমার সঙ্গে আসুন। লোকটি বলল।
—আপনি কে? মানে—ফ্রান্সিস বলল।
—ভয়ের কিছু নেই। আপনি আমাদের রাজা ব্রাপেন-এর অতিথি। লোকটি বলল।
—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।
একসময় দুজনে বড় মাঠটায় এল। চলল কয়েদঘরের দিকে। কয়েদঘরের কাছাকাছি পৌঁছতেই শাঙ্কো চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো। ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। দুজনের চোখেই জল।
রাজা ব্রাপেন-এর কাছে খবর পৌঁছল। রাজা ব্রাপেন ঘোড়ায় চড়ে এলেন। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে ঘোড়া থামালেন। শাঙ্কোকে বললেন—
—কী? তোমার বন্ধুকে পেয়েছো?
—হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। শাঙ্কো বলল।
—আর কী চাও? রাজা ব্রাপেন জানতে চাইলেন।
—যোদ্ধাদের আবাসে আমাদের জন্যে একটা ঘর দিন। শাঙ্কো বলল।
—বেশ। আর কী চাও? রাজা ব্রাপেন জানতে চাইলেন।
—এখন কিছু চাইবার নেই। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানাবো সব।
—বেশ। রাজা ব্রাপেন বিরাট মাঠটা পার হয়ে চলে গেলেন রাজবাড়ির দিকে। শাঙ্কো বলল।
দলপতিকে শাঙ্কো দেখল। দলপতি এগিয়ে এসে বলল—এবার তোমাদের একটা ঘর দিতে হবে। আমার সঙ্গে এসো।
দলপতি মাঠ পার হতে লাগল। পেছনে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো। দলপতি একটা ঘর দেখিয়ে বলল—এটাই তোমাদের ঘর। দলপতি চলে গেল।
ঘরে ঢুকল দুজনে। মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। ঘাসের বিছানায় বসল দুজনে। শাঙ্কো আস্তে আস্তে ওর সব কথা বলল। ফ্রান্সিস বলল—আমার তো কয়েদঘরে দিনরাত কেটেছে। বলবার মত তেমন কিছু নেই। তবে ঠিক বুঝছি না এই রাজা ব্রাপেন আমাকে নিয়ে এল কেন?
—আমি বলেছিলাম তাই।
—আমার মনে হয় রাজার নিশ্চয়ই কিছু কাজ আছে যেজন্যে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে।

—হ্যাঁ রাজা ব্রাপেনের লক্ষ্য—সোনার খনি দখল করা। ফ্রান্সিস বলল।

—এখনও তো সোনার খনির হদিশই পাওয়া গেল না। এখনই তার দখল চাই? শাঙ্কো বলল।

—সোনার লোভ—বুঝতেই পারছো। এখন আমরা কী করবো? ফ্রান্সিস থামল। তারপরে বলল—

—সমস্ত ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে—এরকম—সোনার খনি উদ্ধার করতে চাইছে—এই রাজা ব্রাপেন আর হুয়াল্লা আর আত্তারিয়া। কিন্তু আমরা একটা নকশা পেয়েছি। একমাত্র রাজা হুয়াল্লাই আমাদের কাছ থেকে নকল নকশাটা পেয়েছে। অন্য দুজন কোন খোঁজই জানে না। ওরা চায় আমরা উদ্ধার করি আর সোনার খনি ওদের দিয়ে দিই। খনি উদ্ধার করতে পারলে কোন রাজাকে খনির অধিকার দেব জানি না। তখন এই ব্যাপারটা নিয়ে সাংঘাতিক সমস্যা দেখা দেবে।

—তাহলে তুমি কীভাবে সমস্যার মোকাবিলা করবে। কোন পথে সমস্যাটার সমাধান করবে।

—ঠিক আছে—ঠিক কর কোন রাজার জন্যে আমরা খনি অনুসন্ধান করতে যাবো? ফ্রান্সিস বলল।

—খনি উদ্ধার করে এই রাজা ব্রাপেনকেই দাও।

—কিন্তু খনিটা রয়েছে উদিন্না পাহাড়ে। ঐ পাহাড়ের দক্ষিণভাগের রাজা আত্তারিয়া আর রাজা হুয়াল্লা উত্তরভাগের রাজা। এই রাজা ব্রাপেন উদিন্না পাহাড়ের থেকে বেশ দূরে রাজত্ব করেন। সোনার খনি উদ্ধার করে যদি এই রাজা ব্রাপেনকে দিই—এই রাজা ব্রাপেনকে হুয়াল্লার রাজত্বের মধ্যে দিয়ে আসতে হবে। রাজা হুয়াল্লা এই রাজা ব্রাপেনকে আসতেই দেবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—তা ঠিক। সোনার লোভ। শাঙ্কো বলল। একটু হেসে ফ্রান্সিস বলল—সমস্যার শেষ এখানেও নয়। আগে চল—খনি উদ্ধার করি। তারপর অবস্থাই বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে।

কিছু পরে দুজন প্রহরী খাবার নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা পেট পুরে খেল।

সন্ধ্যের সময় রাজা ব্রাপেন এলেন। ঘোড়ায় চড়ে। ঘোড়া থেকে নেমে ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢুকলেন। ফ্রান্সিস শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। রাজা ব্রাপেন বললেন—কী? তোমরা শলাপরামর্শ করেছো?

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

—কী সিদ্ধান্তে এসেছো? রাজা ব্রাপেন জানতে চাইলেন।

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল—আমরা স্থির করেছি যে সোনার খনির সন্ধান শুধু আপনাকে দেব।

—আরো তো দুই রাজা রয়েছে। ব্রাপেন বললেন।

—সোনার খনি উদ্ধারে তাদের কাছে কোন সাহায্য চাইবো না।

—সেটা সম্ভব নয়। উদিন্না পাহাড় ঐ দুই রাজা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে। রাজা ব্রাপেন বললেন।

—বলতে চাইছি—ঐ দুই রাজার অগোচরে আমরা সোনার খনি খুঁজবো উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তা কি পারবে? রাজা বললেন।

—আমরা রাতের বেলা খুঁজবো। কেউ জানতেও পারবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখ চেষ্টা করে। ব্রাপেন ঘর থেকে চলে যেতে যেতে বললেন—সেনাপতিকে বলা আছে। উনি তোমাদের সবরকমভাবে সাহায্য করবেন।

—ধন্যবাদ আপনাকে। শাঙ্কো বলল। রাজা ব্রাপেন চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস বিছানায় বসল। শাঙ্কোও বসল। এবার শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস।

—বল?

—এভাবে আগে থেকেই বলে সোনার খনির মালিকানা রাজা ব্রাপেনকে দিয়ে দিলে? শাঙ্কো বলল।

—উপায় নেই। ব্রাপেন আমাদের সব ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। তাঁকেই সোনার খনির অবস্থান জানাবো। সোনার খনির উদ্ধারের পর কাকে মালিকানা দেব এই নিয়ে অনেক ভাবতে হবে। সেই ভাবনাটা আগেই শেষ করে রাখলাম। এখন বুঝে শুনে এগোতে পারবো। ফ্রান্সিস বলল।

—সমস্যাটা আছে একটা। সোনার খনি আছে উদ্দিন্না পাহাড়ে। ঐ পাহাড়ের রাজা দুজন—আত্তারিয়া আর হুয়াল্পা। ব্রাপেন নয়। সোনার খনির রহস্য মিটে গেলেও ব্রাপেন সব জেনেও কিছু করতে পারবে না। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। এটা ঠিক। কিন্তু সোনার খনির হদিশ পেয়ে ব্রাপেন রাজা হুয়াল্পার রাজত্ব আক্রমণ করবে। হুয়াল্পাকে যুদ্ধে হারাতে পারলে সোনার খনি ব্রাপেনের হাতের মুঠোয় এসে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি জেতে তবে তো। শাঙ্কো বলল।

—আছে আছে আরও পথ আছে। ব্রাপেন হুয়াল্পার সঙ্গের দল করবে। লক্ষ্য দুজনে মিলে রাজা আত্তারিয়ার রাজত্ব দখল করা। তখন সোনার খনি হাতে এসে যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—সব জেনে হুয়াল্লা ঠিক সোনার খনির ভাগ চাইবে। তখনই হবে সমস্যা। দুই রাজার মধ্যে লড়াইও লেগে যেতে পারে। শাঙ্কো বলল।

—সেটা দুই রাজার ব্যাপার। ততদিন আমরা এখানে বসে থাকবো না। নিজেরা সব মিটিয়ে নিলে ভাল। তা না হলে লড়াই চলবে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। শাঙ্কোও শুয়ে পড়ল।

—আসল কথা তো খনি উদ্ধার। তারপর অন্যসব কথা। ফ্রান্সিস বলল।

—তা তো বটেই। এখন সোনার খনির খোঁজে নামতে হবে। আর দেরি করবো না। কালকেই চলো। দুপুরে খেয়েদেয়ে রওনা দেব। শাঙ্কো বলল। তারপর বলল—

—কয়েকটা দরকারি জিনিস তো নিতে হবে।

—হ্যাঁ। মোটা দড়ি দুটো তেলেভেজা মশাল চকমকি পাথর। ফ্রান্সিস বলল। রাতের অন্ধকারে আমাদের সব কাজ সারতে হবে।

—একটা শস্যটানা গাড়ি পেলে ভালো হয়। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। যাওয়া আসার ভাড়া দিলে মনে হয় ওরকম গাড়ি পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে দুজনে বেরুলো দড়িটড়ি কিনতে। সেসব কেনা হল। এবার একটা শস্যটানা গাড়ি। বাজারের কাছেই দেখল ওরকম দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কো গাড়োয়ানের কাছে গেল। গাড়োয়ান একজন এগিয়ে এল।

ফ্রান্সিস বলল—শোন ভাই আমরা দুজন আজ দুপুরে উদিন্না পাহাড়ে যাবো। তুমি নিয়ে যেতে পারবে?

অতদূর যাবো। আমাকে আবার ফিরতে হবে তো। গাড়োয়ান বলল।

—তোমাকে যাওয়া আসার ভাড়া দেব। শাঙ্কো বলল।

গাড়োয়ানটি হেসে বলল—যাবো। তবে রাস্তায় খাওয়া দাওয়া—

—সব পাবে। একটা সোনার চাকতি দেব। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে আপনারা কখন আসবেন? গাড়োয়ান জানতে চাইল।

—দুপুরে খেয়ে দেয়ে। তুমি এখানে চলে এসো।

—ঠিক আছে। গাড়োয়ান মাথা কাত করে বলল।

দুজনে সৈন্যাবাসে ফিরে এল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দুপুরের খাওয়াটা তাড়াতাড়ি করল। দরকারি সব জিনিস নিল। সৈন্যদের ব্যবহারের জন্যে একটা চামড়ার থলি দেওয়া হয়। শাঙ্কো সেটাই দলপতির কাছে চাইল। দলপতি ওরকম থলি পাঠিয়ে দিল। থলিতে ভরা হল সব।

তখনই দলপতি ঘরে ঢুকল। বলল—তাহলে আপনারা যাচ্ছেন।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো বলল।

—কীভাবে যাচ্ছেন? দলপতি জানতে চাইল।

—রাজা হুয়াল্লার রাজত্বের মধ্যে দিয়ে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে কীসব খনিটনির কথা শুনলাম সেখানে যাবেন না? দলপতি জানতে চাইল।

—ন্নাঃ! এখন তো নয়। দেখি পরে সময় পেলে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে চলল বাজারের দিকে। বাজারে এসে দেখল গাড়োয়ান গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখে হাসল।

আগে গাড়িতে চামড়ার থলিটা রাখল। তারপর দু'জনে গাড়িতে উঠল। ফ্রান্সিস বলল—এরকম গাড়িতে একবার চড়বার প্রয়োজন পড়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে মনে হল গায়ের হাড়টার যেন খুলে গেছে।

—এটা তো শস্যটানা গাড়ি। এই গাড়িতে একমাত্র শস্যই থাকে। সেখানে মানুষ চড়লে তো বিপত্তি হবেই।

গাড়োয়ান গাড়ি ছেড়ে দিল। খোয়া ফেলা রাস্তা দিয়ে ঠকাম্‌ঠক্ শব্দ করতে করতে গাড়ি চলল।

সন্ধ্যের মুখে। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস—একটু নেমে দাঁড়াই। গায়ের সব হাড় ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ফ্রান্সিস হেসে উঠল। এখনও অনেকটা যেতে হবে। হয়তো আর নামাই হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—না না। রয়ে সয়ে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে যাবো। শাঙ্কো বলল।

—দেখা যাক কোন বাজার টাজার পাই কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই গাড়িটা একটা বাজারের কাছে এল। দুচারটে দোকান। সব দোকানে মোটা মোমবাতি জ্বলছে। শাঙ্কো বলল—গাড়োয়ান ভাই দেখো তো খাবারটাবার কিছু পাওয়া যায় কিনা।

গাড়োয়ান গাড়ি থামাল। নেমে খোঁজ নিতে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বলল—গোল কাটা রুটি আর মাংসের বড়া পাওয়া যাচ্ছে।

শাঙ্কো কোমর থেকে একটা ছোট সোনার চাকতি বের করল। গাড়োয়ানকে বলল—ছটা রুটি আর ছটা মাংসের বড়া আনো।

তিনজনেরই খিদে পেয়েছে বেশ। গাড়োয়ান পাতায় করে খাবার নিয়ে এলো। তিনজনেই গোগ্রাসে খেতে লাগল। শাঙ্কো নিচে নেমে ঘুরে ঘুরে খাবার খেল।

আবার গাড়ি চলল।

রাত হল।

ফ্রান্সিস বলল—রাত বেশি হবার আগেই খেয়ে নিতে হবে। বেশি রাত হলে কোথাও দোকান খোলা পাবো না।

গাড়ি চলল।

ফ্রান্সিস গাড়োয়ানকে বলল—ও ভাই—একটু নজর রেখো—কোথাও বাজার-টাজার দেখতে পাও কিনা।

গাড়ি চলল।

গাড়োয়ান বলল—সামনেই বেশ বড় বাজার।

—থামাও। শাঙ্কো বলল।

গাড়ি থামল। তিনজনেই নামল। বেশ বড় খাবারের দোকান পেল। দোকানে ঢুকল। বেশ ভিড়। একটা পাটাতনে বসল। দুটো করে সেদ্ধ ডিম আর মাখন দিয়ে ভাজা রুটি। সুস্বাদু খাবার। তিনজনেই পেট পুরে খেল।

সবাই গাড়িতে উঠল। আবার গাড়ি চলল।

সারারাত গাড়ি চলল। ঘোড়াটাকে খেতে দেওয়া হল।

পরের দিন দুপুর নাগাদ গাড়ি রাজা হুয়াল্পার রাজত্বে পৌঁছল। ফ্রান্সিস দুপুরের খাওয়া খেয়ে এই গাড়িতেই উদিন্না পাহাড়ের তলায় যেতে চাইল। কিন্তু শাঙ্কো বলল—রেহাই দাও ভাই। আমি বাকি রাস্তা হেঁটে যাবো।

—বেশ তাই চলো। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস গাড়ি থামাল। নামল দুজনে। ফ্রান্সিস গাড়োয়ানকে প্রাপ্য মূল্য দিল। গাড়োয়ান গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

দুজনে সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলল। বেশ বেলা হয়েছে। খিদেও পেয়েছে। একটা বেশ বড় সরাইখানা পেল। ঢুকল দুজনে। সরাইওয়ালা ওদের দেখে বলল—আসুন। ভালো খাবেন, ভালো থাকবেন।

ওদের পাটাতনে জায়গা দেখিয়ে সরাইওয়ালা বলল—এখানে বিশ্রাম করুন। খাবেন তো?

—নিশ্চয়ই। একটু তাড়াতাড়ি। শাঙ্কো বলল।

দুজনে বসল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিসদের তাড়াতাড়িই খেতে দেওয়া হল।

দুজনেই পেট পুরে খেল।

পাটাতনে দুজনে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে শুয়েছিল। হঠাৎই চোখ খুলল। বলল—শাঙ্কো।

—বলো।

—এত ছুটোছুটি করছি। সোনার খনি খুঁজে পাবো? ফ্রান্সিস বলল।

—চেষ্টা তো করি। দেখা যাক। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

ঘরে নতুন একজন ঢুকল। শাঙ্কো মোমবাতির আলোয় দেখল রাজা ব্রাপেনের দলপতি। ব্যবসায়ীর পোশাকে। ফ্রান্সিস তখনও চোখ বুঁজে আছে। দেখে নি। শাঙ্কো দ্রুত উঠে বসল। দলপতি হেসে বলল—

—আমিও এখানে উঠেছি। দলপতির গলা শুনে ফ্রান্সিস চোখ খুলল। দলপতিকে দেখে ফ্রান্সিসও অবাক। দলপতি পাটাতনের বিছানায় বসল। বলল—সেনাপতিরই আসার কথা ছিল। উনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাকে আসতে হল।

—আপনি কেন এসেছেন? শুয়ে থেকেই ফ্রান্সিস বলল—

—মাননীয় রাজা বললেন—তোমাদের সঙ্গে থেকে তোমাদের সাহায্য করতে। দলপতি বলল।

—আমাদের সাহায্যের দরকার নেই। শাঙ্কো বলল।

—এ কি একটা কথা হল। আপনারা কত কষ্ট করে খনি আবিষ্কার করতে এসেছেন। আপনাদের সাহায্য না করলে চলে। দলপতি বলল।

—বলছি তো আমাদের আপনার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। ব্যাপারটা হল আপনারা আপনাদের কাজ করবেন। আমি শুধু দেখবো। খনি আবিষ্কার হলে কীভাবে সেটা করলেন এটা জেনে রাখা। আপনারাই বলেছেন খনির মালিকানা আমাদের মহামান্য রাজা ব্রাপেনকে দেবেন। দলপতি বলল।

—হ্যাঁ। বলেছি। সে কথা আমরা রাখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তবে আমাকে কেন সরিয়ে দিতে চাইছেন? দলপতি বলল।

—ঠিক আছে। চলুন আমাদের সঙ্গে। কিন্তু কোন কারণেই আমাদের বিরক্ত করবেন না। ফ্রান্সিস বলল।

—না—না। আমি গাছের গুঁড়ির মত চুপ করে থাকবো। আমার শুধু জানার দরকার কীভাবে উদ্ধার করলেন। দলপতি বলল।

—হুঁ। যা বললাম, মনে রাখবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়ই। দলপতি বেশ জোর দিয়ে বলল।

এবার দলপতি বলল—আমার ঘোড়াটার দানা পানির ব্যবস্থা করে আসি। দলপতি চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল।

ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো আর কোন কথা বলল না। দলপতি ভুঁড়ি ফুলিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। একটু পরেই নাক ডাকতে শুরু করল।

ফ্রান্সিস উঠে বসল। শাঙ্কোও উঠে বসল। ফ্রান্সিস বলল—এই অশ্বডিম্ব তো ঘুম থেকে উঠবেই না।

—আমি ঘুমোই নি। দলপতির ভাঙা গলা শোনা গেল।

ফ্রান্সিসরা হতবাক।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো আবার শুয়ে পড়ল। দলপতির নাক ডাকা বন্ধ হয়েছে।

ঘণ্টা খানেক পরে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো উঠে বসল। তৈরি হতে লাগল। কী করে দলপতি বুঝল সেটা। সে উঠে বসল। বলল—এখনই যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। শাঙ্কো বলল।

—দলপতি উঠে দাঁড়াল।

—কোথায় যাবেন? দলপতি বলল।

—আপনাকে বলেছি না যে চুপ করে থাকবেন। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে—ঠিক আছে। দলপতি মাথা এপাশ করে বলল।

শাঙ্কো চামড়ার থলিটা নিল। তিনজনে চলল। প্রায় দু'ঘণ্টা হাঁটার পর উদিন্না পাহাড়ের নিচে এল। রাস্তায় নেমেই ফ্রান্সিস লক্ষ্য করেছে চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। চারদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো ঘুরে দেখতে হবে কোন কোন গাছের ডাল আমি ভেঙে রেখেছি। ওরা খুঁজতে শুরু করল। পেল একটা বড় গাছ। ফ্রান্সিস শাঙ্কোর থলে থেকে দড়ি বের করল। শাঙ্কোকে বলল—দড়িটার এক কোণা গাছটার কাণ্ডে জড়াও। শাঙ্কো তাই করল। ফ্রান্সিস দড়ির অন্য মুখ টেনে নিয়ে চলল। পাহাড়ের গায়ের পাথরের স্তূপের ওপর রাখল। কিন্তু এখানে ছোট ছোট পাথরই বেশি।

ফ্রান্সিস ফিরে এসে বলল—এখানে পাথরের চাঁই নেই। সবই ছোট পাথরের টুকরো।

ফ্রান্সিসরা আবার চলল পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে।

আবার চলা শুরু করল দুজনে। পেছনে দলপতি। দলপতি বুঝে উঠতে পারছে না ওরা এটা কী করছে। তবু কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে রইল।

আর একটা ডালভাঙা গাছ পাওয়া গেল। চেস্টনাট গাছ। গাছটার কাণ্ডে শাঙ্কো দড়ি ধরল। অন্য মুখটা নিয়ে ফ্রান্সিস পাহাড়ের ধারে হেঁটে হেঁটে উঠতে লাগল। তখনই ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল বেশ কয়েকটা বড় বড় পাথরের চাঁই আছে। ফ্রান্সিস দড়ির মুখটা নিয়ে প্রথমে পাথরের চাঁইয়ের ওপর উঠল। দড়িটা টান করে ধরে প্রথম পাথরের চাঁই পেল দুটো। তার প্রথমটায় একবার ধরল। কিন্তু দড়িটা বেঁকে যাচ্ছে। ঠিক সোজা সমান হচ্ছে না। আর কিছুটা উঠল। রাখল একটা ছোট চাঁই। দড়িটা সোজা করল ফ্রান্সিস। দড়িটা টানা লম্বালম্বি হল। এই চাঁইটা একেবারে চেস্টনাট গাছের সঙ্গে লম্বালম্বি।

তখনই ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। শাঙ্কো দলপতিকে ধরে টেনে গাছের আড়ালে নিয়ে গেল। ফ্রান্সিস পাথরের চাঁইটার ওপর শুয়ে পড়ল।

রাজা হুয়াল্লার দু'জন পাহারাদার ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল।

ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল—বোধহয় পাথরের চাঁইটা পেয়েছি। এখানে এসো। শাঙ্কো দড়ি নিয়ে এল। দলপতি এসে ওদের পেছনে দাঁড়াল। ঔৎসুক্য চেপে রাখতে পারল না। বলে ফেলল—শুধু তো দড়ি টানাটানি করছেন। সোনার খনি কোথায়? ফ্রান্সিস শাঙ্কো কোন কথা বলল না।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো পাথরের চাঁইয়ের খাঁজে ধরে পাথরের চাঁইটা তুলতে লাগল। কিছুটা তুললও। কিন্তু ছেড়ে দিতে হল। বেশ ভারি। এবার শাঙ্কো দলপতিকে বলল—হাত লাগান। দলপতি এগিয়ে এল। এবার তিনজনে মিলে চাঁইটা তুলতে লাগল। আস্তে আস্তে চাঁইটা উল্টে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—একসঙ্গে টানো। সময় নিয়ে গলা একটু নামিয়ে বলে উঠল—ওল্টাও। পাথরের চাঁইটার ওপরে গোল চিহ্ন কুঁদে তোলা নেই।

তিনজনেই কমবেশি হাঁপাতে লাগল। শাঙ্কো বলল—আমাদের হিসেবে ভুল হয়ে গেছে।

—কোন জায়গায় ভুল হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী ভুল হয়েছে? শাঙ্কো বলল।

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—আবার দড়িটা গাছ থেকে লম্বালম্বি টানি। দেখা যাক কোন পাথরের চাঁইয়ের মাথায় দড়িটা লাগছে কিনা।

—বেশ। দেখ। শাঙ্কো বলল।

আবার গাছটা থেকে দড়ি টানা হল। আবার সেই উল্টে ফেলা পাথরের চাঁইয়ে এসে লাগল। কিন্তু সেই পাথরের বুকে কোন চিহ্ন নেই। ফ্রান্সিস বলে উঠল— নকশা দেখেই ভেবেছিলাম গাছ আর পাথরের চাঁইয়ের মধ্যে যোগ আছে। এছাড়া অন্য কোনভাবেই খনিতে পৌঁছোনো যাবে না।

—গাছটা কি আমরা ঠিক চিনেছি? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। নকশায় আঁকা হয়েছে একটা ছোট গাছ। কতদিন আগের কথা কে জানে। ছোট গাছটি আর ছোট নেই। অনেক বড় হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল। এবার দলনেতা বলল—এইসব এলাকায় দেখেছি এক ধরনের গাছ আছে যাদের বাড় নেই। ঐ পাঁচ ছয় হাত। তার বেশি কখনও বাড়ে না।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল। তারপর মুখ তুলে বলল—সেই বামন গাছ কি এখানেও আছে?

—নিশ্চয়ই আছে। এই অঞ্চলেই আছে। অন্য কোথাও ঐ বামন গাছ দেখি নি। দলপতি বলল।

—আবার সব নতুন করে ভাবতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—অমনি বামন গাছ তো এখানেও থাকতে পারে। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস বলল—নিশ্চয়ই আছে। নকশায় একটা চারাগাছের মত গাছ আছে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর চাঁইয়ের ওপর দিয়ে নামতে নামতে বলল—চল সেই বামন গাছ খুঁজতে হবে।

তিনজনেই পাথরের চাঁই থেকে নেমে এল। পাহাড়ের ধার দিয়ে বামন গাছ খুঁজতে লাগল। একটা ছোট গাছ পেল। ফ্রান্সিস দলপতিকে জিজ্ঞেস করল—এটা কি বামন গাছ?

দলপতি দেখেটেখে বলল—না। আরো দেখুন।

চলল বামন গাছের খোঁজ। একটা ছোট গাছ একটু দূর থেকে দেখে শাঙ্কো বলে উঠল—ঐ যে বামন গাছ। রাস্তার ধারে।

ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। গাছটা দেখল। এবার নিশ্চিন্ত হল। এটা একটা বামন গাছ। পাতা ঝরে গেছে। শুকনো ডালগুলো উঁচিয়ে আছে। ফ্রান্সিস একবার চোখ বুঁজল। চোখ খুলে বলল—নকশায় ঠিক এরকম গাছই আঁকা। শাঙ্কোকে ডেকে বলল—এই গাছটায় দড়ির একটা দিক ধর। শাঙ্কো তাই করল। ফ্রান্সিস দড়ি টেনে নিয়ে চলল। পাহাড়ের ধারে উঠল। মাত্র একটা বড় পাথরের চাঁই পেল। বাকি সব ছোট ছোট পাথরের টুকরো।

ফ্রান্সিস পাথরের চাঁইটা ঘুরে ঘুরে দেখল। তারপর দড়িটা রেখে পাথরের চাঁইটায় হাত লাগাল। শাঙ্কোও হাত লাগাল। দুজনে চাঁইটা ওঠাবার চেষ্টা করল। পারল না। একটু উঠেই চাঁইটা পড়ে গেল।

দলপতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

শাঙ্কো দলপতিকে বলল—আসুন। হাত লাগান। হাতে ধুলো না লাগিয়ে সোনার খনি পাবেন তা হয় না। দলপতি এল। এবার তিনজনে মিলে পাথরের চাঁইটা টানল। আস্তে আস্তে পাথরের চাঁইটা শব্দ করে উঠে গেল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল স্পষ্ট কুঁদে-তোলা দাগ। ঠিক চিহ্নটা পাওয়া গেল।

এবার ফ্রান্সিস চামড়ার ঝোলা থেকে চকমকি পাথর বের করল। একটা মশালও বের করল। অন্য মশালটা শাঙ্কোকে দিল। বেশ হাওয়া বইছিল। তার মধ্যেই ফ্রান্সিস চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালল। মশাল জ্বলে উঠল। শাঙ্কোর হাতের মশালটাতেও আগুন ধরিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস দড়ির এক মাথা কোমরে বাঁধল। তারপর জ্বলন্ত মশালটা গুহার অন্ধকার গর্তে ছুঁড়ে দিল। একটু ভেতরে মশালটা পড়ল। দেখা গেল গুহামত। একজন মানুষ ঢুকতে পারে এরকম গুহা।

ফ্রান্সিস গুহামুখ দিয়ে নামতে লাগল। মশালটার কাছে পৌঁছে আবার মশালটা ছুঁড়ল। মশালটা পড়ে গেল। ফ্রান্সিস বুঝল মশালটা নিচে কোথাও পড়ে গেল। নিশ্চয়ই নিচে গহ্বরমত কিছু আছে। ফ্রান্সিস বুক দিয়ে প্রায় হিঁচড়ে টেনে চলল। বুকে পিঠে এবড়ো খেবড়ো পাথরের গা লাগছে। কেটেও গেছে বোধহয়।

কিছুটা এগোতেই দেখল গুহা। নিচে একটা গোলামত জায়গা। মশালটা ওখানেই পড়েছে। ফ্রান্সিস গুহামুখ থেকে বেরিয়ে গোলমত জায়গাটায় নামল। বেশি নিচে নয়।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ হাঁপালো। ততক্ষণে শাঙ্কোও নেমে এল। দলপতি নামল না। অবশ্য দলপতি ওর ভুঁড়ি আর মোটা শরীর নিয়ে গুহার মধ্যে দিয়ে আসতে পারতো না। তাই ও নিজেই সাহস করে নামেনি।

দুজনে জ্বলন্ত মশাল তুলে ধরল। দেখা গেল ডানপাশে একটা বড় ঘরের মত জায়গা। দুজনে মশাল নিয়ে সেখানে ঢুকল। দেখল একপাশে স্তূপীকৃত পিণ্ডের মত। একটা পিণ্ড তুলে নিল ফ্রান্সিস। একটা পিণ্ড তুলল। মশালের আলোয় পাথরের গায়ে সোনালি গুঁড়ো চিক্ চিক্ করে উঠল। বুঝল—পাথরের গায়ে গুঁড়ো সোনা। এইসব পাথরের গায়ের সোনা পাথর গালিয়ে বের করা হয়।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—শাঙ্কো এইসব পাথর গালালেই সোনা পাওয়া যাবে।

পাথরের স্তূপ দেখে ডানদিকে ঘুরল। দেখল সোনার পিণ্ড ডাঁই করে রাখা। মশালের আলো পড়তে পিণ্ডমত সোনা চিক্‌চিক্ করে উঠল।

শাঙ্কো হেসে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। ফ্রান্সিস বলে উঠল—কী পাগলামি করছো। এখানে সামান্য শব্দ হলেও ওপরে শোনা যাবে।

—এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—ওপরে উঠবো।

—এত সোনা—নেবে না? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। জামা খোল। জামায় যতগুলি পিণ্ড নেওয়া যায় ততটাই নাও।

দুজনে জামা খুলল। সোনার পিণ্ডমত যা পাওয়া গেল তাই খোলা জামায় বেঁধে দিল।

দুজনে মশাল নিয়ে গুহামুখের দিকে চলল। মশাল ছুঁড়ে দিয়ে প্রথমে ফ্রান্সিস গুহায় ঢুকল। মশালের কাছে গিয়ে আবার ছুঁড়ে দিল মশালটা। সেই আলোয় বুক পিঠ বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। গায়ে জামা নেই। এবড়ো খেবড়ো পাথরের ঘষা খেল। কেটে গেল পিঠ বুক। রক্ত পড়তে লাগল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দুজনেরই এক হাল।

গুহামুখ থেকে দুজনে বেরিয়ে এল। দেখল ওল্টানো পাথরে দলপতি বসে আছে। ওরা উঠতেই দলপতি এগিয়ে এল। বলল—সোনার খনি পেয়েছেন?

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। সোনার একটা পিণ্ড জামার পুঁটুলি থেকে বের করে দলপতিকে দিল। চাঁদের আলোয় সোনার পিণ্ডটা ঝিক্‌মিক্ করে উঠল। দলপতির মুখ হাঁ।

ফ্রান্সিস বলল—এখানেই পিণ্ডগুলো চামড়ার ঝোলায় ঢেলে রাখো। দুজনেই চামড়ার ঝোলায় সব সোনার পিণ্ড ঢেলে রাখল। ফ্রান্সিস একটা সোনার পিণ্ড দলপতিকে দিল। বলল—জামার ভেতরে রাখুন। দলপতি খুশিতে লাফিয়ে উঠল।

—এবার পাথরের চাঁই ওল্টাতে হবে। হাত লাগাও। ফ্রান্সিস বলল।

তিনজনে পাথরের চাঁইটা ঠেলে তুলে গুহামুখে উল্টে রাখল। গোল দাগটা ঢাকা পড়ে গেল।

ফ্রান্সিস দলপতিকে বোঝাল—গুহার মুখটা পাথরের চাঁই দিয়ে ঢেকে দিলাম। গোল দাগটা দেখা যাবে না। আমরা ঐ গুহামুখ থেকে গুহা পার হলাম। বেশ সরু গুহা। তবে বুক দিয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে যাওয়া যাবে। তারপরেই একটা বড় জায়গা। একটা বেশ বড় ঘরের মত। প্রথমে পাওয়া যাবে স্তূপীকৃত সোনা মেশানো পাথর। সেইগুলো আর এক দফা গলালে সোনা পাওয়া যাবে। অঢেল সোনা।

ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল—বাঁদিকে একটা ঘরমত পাবেন। ওখানে পাথরগুলো থেকে সোনার পিণ্ড তৈরি করে রাখা হয়েছে। স্তূপীকৃত পড়ে রয়েছে সেইখান থেকে আমরা কিছু সোনার পিণ্ড নিয়েছি। এবার অসংখ্য সোনার পিণ্ড পাবেন। এই হল সোনার খনির রহস্য।

দলপতি মুখ হাঁ করে শুনল।

—সরাইখানায় চলো। ফ্রান্সিস বলল। ভোর হল। ভোরের নিস্তেজ রোদ ছড়ানো চারপাশে। একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল।

ফ্রান্সিস গাছটার কাণ্ড থেকে বাঁধা মোটা দড়িটা খুলে নিয়ে ঐ গাছটার তলাতেই বসল। চকমকি পাথর মশাল সব গাছটার নিচে রেখে দিল। তারপর গাছটার একটা ভাঙা ডাল দেখিয়ে বলল—একটা ডালভাঙা গাছ। এটা দেখলেই বুঝবেন এখানেই আছে সোনার খনি। একটু হেসে বলল—

—চলো—সরাইখানায় যাবো।

তিনজনে চলল শহরের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরে এলো।

সরাইখানায় উঠল।

সকালের খাবার খেতে খেতে শাঙ্কো দলপতির দিকে তাকিয়ে বলল—এখন আপনি কী করবেন?

—দুপুরের খাবার খেয়ে আমি আমার রাজত্বে চলে যাবো। এখানে কী কী করেছি গুপ্ত সোনার খনি আপনারা কীভাবে পেলেন—সেসব মহামান্য রাজাকে বলবো। তারপর মহামান্য রাজা যা করতে চান করবেন। আমার কর্তব্য এইটুকুই ছিল। তা আমি পালন করেছি। দলপতি বলল।

ফ্রান্সিস ডাকল—শাঙ্কো—আমরা কী করবো। যে কাজটা করবো বলে স্থির করেছিলাম তা তো হয়ে গেল।

—চলো আমরাও দুপুর নাগাদ বেরিয়ে পড়ি। একটা শস্যটানা গাড়ি পেলে ভালো হত। খুব তাড়াতাড়িই গ্যালিগস বন্দর শহরে পৌঁছে যেতাম।

—না-না, মাফ কর ফ্রান্সিস। শস্যটানার গাড়িতে আমি আর উঠছি না। কী অবস্থা হয়েছিল আমার। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—ঠিক আছে—হেঁটে চল। কিন্তু অনেক দেরি হবে পৌঁছোতে।

—হোক। গাড়িতে যাবো না। শাঙ্কো বলল।

—বেশ বাবা তাই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরের খাওয়া খেল তিনজনে। ফ্রান্সিসরা একটু শুয়ে বসে বিশ্রাম করল। দলপতি আর বসল না। নিজের দেশের দিকে রওনা হল। ঘোড়াটা এক ছোকরা নিয়ে এল। সেনাপতি তাকে কিছু মূল্য দিল।

—আপনার রাজাকে বলবেন সোনা বিক্রি করে উনি অনেক অর্থ পাবেন। ঐ সব অর্থ দিয়ে গরীব প্রজাদের উন্নতির জন্য ব্যয় করবেন। দলপতি হেসে বলল—বলবো। দলপতি ঘোড়ায় উঠলেন। উত্তরমুখো ঘোড়া ছোটাল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্রান্সিসরাও তৈরি হল। সব গোছগাছ করে রাস্তায় এলো। শেষ দুপুরে রওনা হল গ্যালিগস বন্দর শহরের দিকে।

বেশ রাত তখন। ফ্রান্সিসদের ভাগ্য ভাল। একটা ছোট বাজারমত পেল। একটি দোকানে রুটি মধু পেল। দুজনে পেট পুরে রুটি খেল। দারুণ খিদে পেয়েছিল। খিদে মিটল। রাতের খাওয়াটা হয়ে গেল। খেয়েটেয়ে শাঙ্কো বলল—চলো দেখি— রাতে কোথাও থাকার জায়গা পাওয়া যায় কিনা। এই দোকান সেই দোকানে জিজ্ঞেস করল। একজন দোকানদার বলল—একটু দূরে একটা ওক গাছের নিচে একটা মাংস ডিমের দোকান আছে। ওরা কিছু মূল্যের বিনিময়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। গিয়ে দেখুন।

মুরগী ডিমের দোকান খুঁজে পেল। দোকানদারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দোকানদারের চেহারা লিকলিকে। কিন্তু গলার স্বর গম্ভীর। বলল—কী চান? মুরগী না ডিম।

—আমরা কিছুই চাই না। শুনলাম আপনার কাছে নাকি খালি ঘরটর আছে। অর্থের বিনিময়ে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে দিন। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা রাত কাটাবার জায়গা পাচ্ছেন না—এই তো। দোকানি বলল।

—হ্যাঁ। মড়ার মত ঘুমোবো। কারো কোন অসুবিধার সৃষ্টি করি না।

—ঘুমের মধ্যে নাক ডাকো? দোকানি বলল।

—না। শাঙ্কো মাথা নাড়ল।

—বলছেন। কিন্তু নাক ডাকলেই বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। দোকানি বলল।

—বেশ তো। শাঙ্কো হেসে বলল।

—তাহলে আসুন। দোকানি বলল।

দোকানদার দোকানের পেছনে এল। দোকানের লাগোয়া একটা ঘর। বুনো খড়ে তৈরি।

ঘরের মধ্যে ঢুকল দোকানি। মোমবাতির আলোয় দেখা গেল তিন চারজন লোক শুয়ে বসে আছে। ওপাশটা খালি। ওখানে দুটো কাঠের পাটাতন পাতা। জায়গাটা দেখল। দোকানদার গম্ভীর গলায় বলল—এই জায়গাটায় থাকবেন। ভাড়াটা আগে দিন। দুটো লোক ভাড়া না দিয়ে শেষ রাতে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে আমি অগ্রিম নেওয়া শুরু করেছি।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল। কোমরের ফেট্টি থেকে দুটো ছোট সোনার চাকতি বের করল। দোকানিকে দিল। দোকানি খুব খুশি। সাধারণত রুপোর চাকতি দেয় সব। এ একেবারে সোনার চাকতি। দোকানি চলে গেল।

ঘরের মেঝেয় রাখা কয়েকটা কাঠের পাটাতন। দুজনে পাটাতনের ওপর বসল। তারপরে ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল।

ওরা কিছুক্ষণ পরে দোকানির কাছ থেকে জল চেয়ে খেল। তারপর শুয়ে পড়ল।

দুজনেই অত্যন্ত ক্লান্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল ফ্রান্সিসের। শাঙ্কো তখনও ঘুমিয়ে। ফ্রান্সিস আর ওকে ডাকল না। ঘুমোক। কিছুক্ষণ পরে শাঙ্কোর ঘুম ভাঙল। উঠে বসল। হাতমুখ ধুল দুজনে। তারপর সকালের খাবার খেতে চলল। সামনের দোকানেই পেল মাছভাজা আর আধ হাত লাঠির মতো রুটি। দুজনে বেশ ভালোই খেল।

ওরা আর দাঁড়াল না। মুরগীর দোকান থেকে জিনিসপত্র নিয়েই এসেছিল। দুজনে চলা শুরু করল। দুপুরে এক চাষীর বাড়িতে অতিথি হল। পেট পুরে রুটি আনাজের ঝোল খেল।

সন্ধ্যেবেলা। ফ্রান্সিস বলল—একটু রাতে বাজার টাজার গেলে রাতের খাওয়া খাবো। তারপর সারারাত হাঁটবো। রাতে যাবার কোন সমস্যা হবে না।

—শরীর অত ধকল সহ্য করতে পারবে? শাঙ্কো বলল।

—খুব পারবে। জাহাজে পৌঁছে পাক্কা দুই দিন শুধু খাবো আর ঘুমুবো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে যখন গ্যালিগস বন্দর শহরে পৌঁছল তখন বেশ রাত। দুজনে জাহাজঘাটায় এল। ওদের জাহাজটা যেখানে দেখে গিয়েছিল সেখানেই আছে।

জাহাজের কাছে এসে দেখল পাটাতন তুলে রাখা হয়েছে। সমুদ্রের পার থেকে শাঙ্কো দুহাতের চেটো গোল করে ডাকল—হ্যারি, বিস্কো। জাহাজে কারো কোনো সাড়া নেই। আবার ডাকলো। সাড়া নেই। শাঙ্কো পথ থেকে একটা ইটের টুকরো তুলে জাহাজ লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। জাহাজের গায়ে লেগে ঢিলটা জলে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস বলল—দাঁড়াও—জাহাজের ডেক-এ ঢিল ফেলতে হবে। রাত হয়েছে। গরমের দিন। কেউ না কেউ ডেক-এ নিশ্চয়ই শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস ঢিল তুলে ছুঁড়ল। ঠিক ডেক-এই পড়ল ঢিলটা। কারো গায়ে লেগেছে নিশ্চয়ই। কার চিৎকার শুনল—কে রে ঢিল ছোঁড়ে।

শাঙ্কো চিৎকার করে বলল—রেলিঙের ধারে আয়। নইলে আবার ঢিল ছুঁড়বো।

ভাইকিং বন্ধুদের কয়েকজন রেলিং-এর কাছে এল। শাঙ্কো আবার চিৎকার করে বলল—ফ্রান্সিস আর আমি এসেছি। পাটাতন পেতে দে।

এইবার ভাইকিংরা বুঝল ফ্রান্সিস শাঙ্কো ফিরে এসেছে। ওরা চিৎকার করে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। জাহাজের রেলিং-এর ধারে ভিড় করে দাঁড়ালো ওরা। পাটাতন পেতে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো পাটাতন দিয়ে হেঁটে ডেক-এ উঠে এল। আবার ধ্বনি উঠল—ও—হো—হো।

বন্ধুরা কেউ কেউ ছুটে এসে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোকে জড়িয়ে ধরল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের কাছে এল। মুখ চোখ শুকনো। চোখের নিচে কালচে ভাব। শরীরও কিছুটা শীর্ণ। ফ্রান্সিস সবই দেখল। বলল—আমি অভিযানে বের হলে তুমি যদি ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করে ফেল তাহলে আমাকে তো এখন দেশে ফিরে যেতে হয়।

—আর দুশ্চিন্তা করবো না। এখন থেকে মন শক্ত করবো। মারিয়া আস্তে বলল।

দুজনে কেবিনঘরের দিকে চলল। ফ্রান্সিস যেতে যেতে রাঁধুনি বন্ধুকে পেল। বলল—প্রায় উপোস করে আছি। যা হোক কিছু খেতে দাও। শাঙ্কোকেও দিও।

ওদিকে শাঙ্কো তখন বন্ধুদের কাছে হাত পা নেড়ে ওদের স্বর্ণখনি অভিজ্ঞতার কথা বলছে।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া নিজেদের কেবিনঘরে এল। ফ্রান্সিস বিছানায় বসল। বলল—একবার শাঙ্কোর কাছ থেকে চামড়ার ঝোলাটা নিয়ে এসো তো। মারিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

একটু পরে ঝোলাটা নিয়ে এল। ফ্রান্সিস হাত ঢুকিয়ে একটা সোনার পিণ্ড তুলল। মারিয়া অবাক হল না। এরকম গুপ্তধন ও আগেও দেখেছে। ফ্রান্সিস বলল—এই স্বর্ণভাণ্ডারের কে মালিক জানতে পারিনি। কাজেই কিছু সোনার পিণ্ড আমরা নিয়ে এলাম।

—কীভাবে আবিষ্কার করলে?

—সেটা শোন। আসলে ওটা ছিল সোনার খনি। সোনার গুঁড়ো মেশানো পাথর গালিয়ে সোনা বের করা হত।

তারপরে ফ্রান্সিস সোনার খনির কথা বলতে লাগল। মারিয়া সেই উদ্ধারের কাহিনী শুনতে লাগল।

হীরক সিন্দুকের সন্ধানে

তখন সকাল হয়েছে। নজরদার পেড্রো মাস্তুলের মাথায় ওর জায়গা ছেড়ে নিচে নেমে এল। চলল ফ্রান্সিসের কাছে।

পেড্রো ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের দরজায় টোকা দিল। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়েই বলল—এসো। পেড্রো ঢুকল। বলল—ফ্রান্সিস—একটা অদ্ভুত ঘটনা।

—কী ঘটনা? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—এরকম ঘটনা। ভয়ের কথা।

—সোজা বল না বাপু—ঘটনাটা কী?

—এখানে ছোট্ট বন্দর মত দেখলাম।

—আরো জাহাজ নোঙর করে আছে?

—হ্যাঁ। তবে একটা মাত্র জাহাজ।

—বেশ এবার বলো।

—কী আর বলবো। অদ্ভুত ঘটনা।

ফ্রান্সিস এবার সত্যিই রেগে গেল। গম্ভীর স্বরে বলল—এখনও বলো অদ্ভুত ঘটনাটা কী? নইলে বিদেয় হও।

—মাস্তুল থেকে দেখলাম একটা ছোট জাহাজ নোঙর করা আছে। অদ্ভুত ব্যাপারটা হল জাহাজটায় জনপ্রাণী নেই। মানুষ তো দূরের কথা একটা ঘোড়াও নেই।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল—হয়তো বন্দরে নেমে খেতে টেতে গেছে।

—আমি ঘণ্টা পাঁচেক এক নাগাড়ে নজর রেখেছি। কেউ জাহাজটায় উঠলোও না নামলোও না।

—হ্যাঁ, এটা একটু ভাববার কথা। ফ্রান্সিস বলল—তবে ভয় পাওয়ার মত কিছু নয়।

—তাহলে কী করবে এখন? পেড্রো বলল।

—ঐ জাহাজটায় যেতে হবে। কী ব্যাপার সেটা জানতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কে কে যাবে? পেড্রো জানতে চাইল।

—হ্যারি আর শাঙ্কোকে ডাকো। ওরাই যাবে। জাহাজের লোকদের সঙ্গে কথা বলবে—জানবে আমরা কোথায় এলাম।

পেড্রো হ্যারি আর শাঙ্কোকে ডাকতে গেল।

একটু পরেই হ্যারি আর শাঙ্কো এল। হ্যারি বলল,

—কী ব্যাপার ফ্রান্সিস?

—পেড্রো একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছে। তীরের কাছে একটা জাহাজ নোঙর করে আছে। পেড্রো দেখেছে জাহাজটা থেকে কোন মানুষ বেরোয় নি, ঢোকেও নি। জাহাজে কোন জনপ্রাণী নেই।

হ্যারি ব্যাপারটা ভাবল। বলল—ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুতই। এখন আমরা কী করবো?

—জাহাজটায় যেতে হবে। লোকজন আছে কিনা দেখতে হবে। যদি কাউকে পাওয়া যায়। তাহলে বুঝতে পারবো দেশের দিকে যাচ্ছি কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কোকে নিয়ে যাবো। হ্যারি বলল।

—তাই যাও। এখনই যাও। দেরি করো না। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এই ব্যাপারটা কী হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

—ঠিক বুঝতে পারছি না! জাহাজটায় গিয়ে উঠলেই সঠিক জানা যাবে—রহস্যটা কী।—ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কোকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। হ্যারি বলল।

কিছু পরে হ্যারি আর শাঙ্কো তৈরি হয়ে এল। দড়ির মই দিয়ে ছোট নৌকোয় নামল। শাঙ্কো নৌকো চালাল জাহাজটার দিকে।

জাহাজটার কাছে আসতে বেশি দেরি হল না। শাঙ্কো নৌকোটা জাহাজের গায়ে লাগাল। হালের কাছে দড়ি ধরে শাঙ্কো আগে উঠল। পেছনে উঠল হ্যারি।

জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। সবকিছুই মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হ্যারি দেখল জাহাজের মাথায় পোর্তুগালের পতাকা উড়ছে। তার মানে পর্তুগীজদের জাহাজ।

প্রথমে হ্যারি জাহাজটার ডেকে উঠে এল। হ্যারি আশ্চর্য এক দৃশ্য দেখল। জাহাজের ডেক-এ পাঁচ-সাতজন জাহাজী শুয়ে আছে। শাঙ্কোও উঠে এসে এই দৃশ্য দেখল। দুজনেই অবাক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সবাই মৃত। মৃত জাহাজীদের গায়ে পোর্তুগীজ পোশাক। বোঝা যাচ্ছে সবাই পোর্তুগীজ। কিন্তু ওদের শরীরে কোথাও অস্ত্রাঘাত নেই। শাঙ্কো মৃতদেহগুলোর কাছে গেল। না। ওদের গায়ে কোথাও রক্ত লেগে নেই। তাহলে ওরা কিভাবে মারা গেল?

হ্যারি বলল—শাঙ্কো—বোঝা যাচ্ছে না এরা কিভাবে মারা গেল। আশ্চর্য ব্যাপার।

—এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—চলো। তীরে নামি। লোকজনের দেখা পাই কিনা। হ্যারি বলল।

হ্যারি আর শাঙ্কো জাহাজ থেকে নৌকোয় নামল। একটু এগিয়ে তীরভূমিতে এল। চলল পায়ে চলা পথ ধরে। হাঁটতে হাঁটতে হ্যারি বলল—শাঙ্কো—একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো?

—কী? শাঙ্কো বলল।

—এই মৃতদের সবারই মুখচোখ খুব ফোলা। এর কারণ বুঝছি না। হ্যারি বলল।

—যে অসুখে ওরা মারা গেছে, সেটা একই অসুখ। শাঙ্কো বলল।

হ্যারি বলল—এখন জানা দরকার ঐ প্রাণঘাতী অসুখটা কী?

পায়ে চলা রাস্তাটা বনভূমিতে ঢুকেছে। ওরা বনে ঢুকল। এতদূর আসার সময় কোন ঘরবাড়ি দেখল না।

বন থেকে বেরিয়ে এসে সামনেই দেখল দু'তিনটে পাথরের বাড়ি। ওপরে শুকনো গাছের আচ্ছাদন।

সামনের প্রথম বাড়িটার কাছে গেল ওরা। দরজায় টোকা দিল। কিন্তু ভেতরে কোন সাড়াশব্দ নেই। শাঙ্কো আবার টোকা দিল। ভেতর থেকে কোন সারা শব্দ পাওয়া গেল না।

হ্যারি এগিয়ে এসে দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। আলোছায়ার মধ্যে দিয়ে দেখল—বিছানায় দুজন নারী পুরুষ শুয়ে আছে। একটা ছেলেও পাশে শুয়ে আছে। দেখে বোঝা গেল—এরা সবাই মৃত। হ্যারি কাছে গিয়ে দেখল—সবারই মুখ ফোলা। তাহলে জাহাজে আর এখানে সবাই একই অসুখে মারা গেছে।

দুজনে বেরিয়ে এল। হ্যারি বলল—চলো ঐ বাড়িটায় যাই। অন্য একটা বাড়িতে ওরা এল। দরজা খোলা। দেখল তিনটি বড় মানুষ আর একটি শিশু মরে পড়ে আছে। এদেরও মুখচোখ ফোলা। কী অসুখ হয়েছিল এদের? হ্যারি ভাবল। শাঙ্কোকে বললোও কথাটা।

আরও কয়েকটা পাথরের বাড়ি এদিকে ওদিকে আছে। হ্যারি বলল—শাঙ্কো কী করবে?

—বোঝাই যাচ্ছে—এক মারাত্মক অসুখে এখানে থাকতো যারা তারা সবাই মারা গেছে।

—ঠিক। যে বাড়িতেই যাবো সেখানেই মৃত মানুষ দেখবো। চলো জাহাজে ফিরি। ওরা ঘরের বাইরে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তখনই ঘরটার অন্ধকার কোণা থেকে একটা বড় আকারের মাছি উড়ে এল। হ্যারির ঘাড়ে বসল। হ্যারি মাছিটাকে দেখল। মাছিটার সারা শরীর গভীর নীল। পাখা কালো। হ্যারি হাত দিয়ে মাছিটা তাড়াতে গেলে তখনই মাছিটা হুল ফোটাল। ছুঁচ ফোটার মত লাগল। হ্যারির ঐ হুল ফোটানো জায়গাটা অবশ হয়ে গেল। হ্যারি চেঁচিয়ে

বলল—শাঙ্কো জলদি। পালাও। হ্যারি এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মাছিটা শাঙ্কোর দিকে দ্রুত উড়ে এল। শাঙ্কো এক লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে এল। দেখল মাছিটা অন্ধকার কোণায় উড়ে যাচ্ছে।

—পা চালাও। হ্যারি বলল। দুজনে ছুটে চলল সমুদ্রতীরের দিকে।

নৌকো বেয়ে ওরা জাহাজে উঠল। ফ্রান্সিস রেলিঙে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। সঙ্গে মারিয়া। হ্যারি আর শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। দুজনেই একটু হাঁফাচ্ছে তখন। হ্যারি যা যা ঘটেছে বলল। অবশেষে বলল—পেটটা নীল, পাখা কালো এরকম মাছি আমি কখনও দেখিনি। এগুলোর হুলও আছে। আমাকে ঘাড়ের কাছে হুল ফুটিয়েছে। জায়গাটা অসাড় হয়ে গেছে।

—এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার। তুমি এখন কেমন বোধ করছো? ফ্রান্সিস বলল।

—অসাড় ভাবটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। ভীষণ দুর্বল লাগছে। ফ্রান্সিস পাশে দাঁড়ানো বিস্কোকে বলল—ভেনকে ডেকে আনো। একটু পরেই ভেন এল। হ্যারিকে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে ওর শরীরটা টিপে টিপে দেখল। নাড়ি টিপে দেখল। বলল—হ্যারির শরীর গরম। জ্বর আসছে। কথা হচ্ছে; তখনই হ্যারি আস্তে আস্তে ডেক-এ বসে পড়ল।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। হ্যারিকে কেবিনঘরে জড়িয়ে ধরে নিয়ে চলল। ভেনকে বলল—ভেন কেবিনঘরে চল। হ্যারিকে ওষুধ দাও।

ভেন বলল—ওষুধ নিয়ে আসছি।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো হ্যারিকে ধরে ধরে ওর কেবিনঘরে নিয়ে এল।

হ্যারি আর বসে থাকতে পারল না। শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসরা কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ঐ কেবিনঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল। মারিয়াও ছিল তাদের মধ্যে।

ভেন ওর ওষুধের বোয়াম পুঁটুলি এসব নিয়ে এল। ভেনকে মাছির হুলের কথা বলা হয়নি। হ্যারি বুঝল ভেনকে এটা জানানো দরকার। হ্যারি বলল—ভেন একটা বাড়িতে ঢুকেছিলাম। অন্ধকার কোণা থেকে একটা বেশ বড় নীলরঙের মাছি উড়ে এসে আমাকে হুল ফুটিয়েছিল।

—এটা তো আগে বলোনি। ভেন বলল।

—বিশেষ গুরুত্ব দিই নি। হ্যারি বলল।

—না-না। ওটাই আসল কথা। এই জ্বর দুর্বলতার কারণ ঐ নীলমাছি।

ভেন কিছুক্ষণের মধ্যেই ওষুধ বানাল। ফ্রান্সিসকে বলল—তিনটে বড়ি দিলাম। এখন একটা খাইয়ে দাও অন্য দুটি দুপুর রাতে খাওয়াবে। মারিয়া এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসকে বলল—ওষুধ আমাকে দাও। আমি খাওয়াবো। ফ্রান্সিস মারিয়াকে বড়ি তিনটি দিল।

মারিয়া জল এনে একটা হলুদ রঙের বড়ি হ্যারিকে খাওয়াল। হ্যারির কপালে গলায় হাত দিয়ে দেখে বলল—জ্বর আছে।

ভেন চেটে খাওয়ার জন্যে মারিয়াকে ওষুধ দিল। তারপর বলল—হ্যারির মাথায় জল দিতে হবে। জ্বর কমাবার জন্যে। মারিয়া বলল—বালতি আর বড় গ্লাশ জোগাড় করতে।

ভেন বেশ আস্তে বলল—ফ্রান্সিস বাইরে এসো। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। দেখল—হ্যারি চোখ বুঁজে শুয়ে আছে।

ঘরের বাইরে এসে ভেন বলল—হ্যারিকে মারাত্মক নীলমাছি হুল ফুটিয়েছে। হ্যারির বাঁচবার আশা নেই।

—বলো কি? ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল।

—হ্যারিরা জাহাজে, বাড়িতে মৃত মানুষ দেখেছে; সবাই এই নীলমাছির হুল ফোটানোর জন্যে মারা গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস দু'হাতে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে উঠল। ভেন বলল—একটা ব্যাপার বলা যায় যে হ্যারিকে একটা নীলমাছি একবারই হুল ফুটিয়েছে দুবার হুল ফোটালে এতক্ষণে মারা যেত। হ্যারির ওষুধগুলো খাইও। এখন ওষুধ কতটা কাজ করে তাই দেখার।

—তবে কি হ্যারি সুস্থ হবে?

—দেখা যাক। আমার কয়েকটা কথা জানার আছে। তুমি শাঙ্কোকে পাঠিয়ে দাও। মুখ চোখ মুছে যাও। তুমি কেঁদেছো এটা হ্যারি যেন না বুঝতে পারে। যা বললাম তা কাউকে বলবে না। বিশেষ করে রাজকুমারীকে তো বলবেই না।

ফ্রান্সিস চলে গেল। একটু পরেই শাঙ্কো এল। বলল, তুমি আমাকে—

—হ্যাঁ। তোমার কাছ থেকে কিছু জানার আছে।

—বেশ। বলো। শাঙ্কো বলল।

—মাছিটা হ্যারির শরীরের কোথায় হুল ফুটিয়েছিল? ভেন জানতে চাইল।

—ঘাড়ে। শাঙ্কো বলল।

—একবারই তো হুল ফুটিয়েছিল? ভেন বলল।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো বলল।

—দুবার নয়? সে আবার জানতে চাইল।

—না। শাঙ্কো বলল।

—মাছিটা কোথা থেকে এসেছিল? ভেন জানতে চাইল।

—ঘরটার অন্ধকার কোণা থেকে। শাঙ্কো বলল।

—তার মানে মাছিটা অন্ধকারে ছিল। ভেন বলল।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো বলল।

—হুল ফোটানোর পর হ্যারি কী বলেছিল? ভেন জানতে চাইল।

—ঘাড়টা যেন অবশ হয়ে গেল। হ্যারি বলেছিল। শাঙ্কো বলল।

—হুঁ বুঝলাম। ভেনের মুখ গম্ভীর হল।

ভেন হ্যারির কেবিনঘরে ঢুকল। বলল—ফ্রান্সিস একটু বাইরে এসো। ফ্রান্সিস ঘরের বাইরে এল। ভেন বলল—আমার যা সন্দেহ হয়েছিল তাই ঘটেছে। এক ধরনের মাছি আছে। প্রাণঘাতী মাছি। মানুষের গায়ে দুবার হুল ফুটোলে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই মাছিগুলো দিনের বেলায় অন্ধকার জায়গায় থাকে। সন্ধ্যের বেশ পরে—অন্ধকার জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। প্রায় সারা রাত উড়ে বেড়ায়। মানুষ, ঘোড়ার গায়ে হুল ফুটিয়ে দেয়। তাতে মানুষ ঘোড়া মারা যায়। ভোর হতেই বনের মধ্যে অন্ধকার জায়গায় লুকিয়ে থাকে। একটু থেমে বলল—হ্যারিরা যে জাহাজটায় জাহাজীদের মৃত দেখে এসেছে লোকজনের বাড়িতেও মৃত মানুষ দেখে এসেছে তারা সবাই এই মাছিদের হুল ফোটানোর জন্যে মারা গেছে। একটু থেমে ভেন বলল—আমাদের একমাত্র হ্যারি ছাড়া আর কারো গায়ে হুল ফোটাতে পারে নি। আমরা এখনও নিরাপদ। তুমি যত শিগগির সম্ভব জাহাজ ছাড়ো। এই তল্লাট ছেড়ে পালাও।

—ঠিক আছে। আমি বলছি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস ঘরের সামনে দাঁড়ানো এক বন্ধুকে বলল—ভাই তুমি সবাইকে খবর দাও যেন সবাই ডেক-এ আসে। বন্ধুটি চলে গেল।

কিছু পরে শাঙ্কো এল। বলল—ফ্রান্সিস চলো। সবাই এসেছে। মারিয়া এগিয়ে এসে বলল—আমি যাবো?

—না তুমি হ্যারিকে দেখ। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। দেখল বন্ধুরা এসেছে। ফ্রান্সিস বলতে লাগল—ভাইসব—আমরা একটা সাংঘাতিক সমস্যায় পড়েছি। এই অঞ্চলে এক ধরনের হুলওয়ালা নীল রঙের মাছি আছে। মানুষের শরীরে এরা হুল ফোটায়। একবার কামড়ালে মানুষ বাঁচে। কিন্তু দুবার কামড়ালে তার মৃত্যু অবধারিত। আমাদের বন্ধু হ্যারিকে সেই মাছি একবার হুল ফুটিয়েছে। হ্যারি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এই মাছিরা দিনের বেলা অন্ধকার জায়গায় আত্মগোপন করে থাকে। সন্ধ্যে হলেই বেরোয়। ফ্রান্সিস থামল।

তারপর বলল—কাজেই আমরা স্থির করেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এই তল্লাট ছেড়ে পালাবো। রান্না হয়ে এসেছে। চান খাওয়া সেরে আমরা জাহাজ চালাবো। দেখি—কোন বন্দর পাই কিনা। ফ্রান্সিস চুপ করল। বন্ধুরা সবাই চলে গেল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—তা হলে পালানোটাই স্থির করলে?

—এ ছাড়া কোন উপায় নেই। খাওয়া দাওয়া হলেই জাহাজ ছেড়ে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসরা খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল। পেড্রো মাস্তুলের মাথায় উঠে গেল। দাঁড়ঘরে দাঁড়িরা গিয়ে লম্বা বৈঠায় হাত লাগাল। সব পাল খুলে দেওয়া হল। জাহাজ কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্রুত চলতে লাগল।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে দেখতে এল। মারিয়া হ্যারির কপাল থেকে জল-পট্টিটা খুলে রাখল। ফ্রান্সিসকে বলল—ভেন বলেছে—লক্ষণ খুব ভাল। হ্যারির জ্বর অনেক কমে গেছে। তবে এখনও সম্পূর্ণ ছেড়ে যায় নি। তবে কমের দিকে। হ্যারি ডান হাতটা ফ্রান্সিসের দিকে বাড়াল। ফ্রান্সিস ওর হাতটা জড়িয়ে ধরল। হ্যারি শুকনো মুখে অল্প হাসল। ফ্রান্সিস বলল—

—কিছ্ছু ভেব না। ভেন আমাকে বলেছে তুমি তাড়াতাড়িই সুস্থ হবে। ভেন-এর ওষুধ কাজ করছে।

—ফ্রান্সিস—কী ভয়ানক জায়গা থেকে আমরা পালিয়ে আসতে পেরেছি। মারিয়া বলল।

—সেটা বলতে। খুব বেঁচে গেছি আমরা। এখন হ্যারি সুস্থ হলেই নিশ্চিন্ত হবো। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি একবার মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, রাজকুমারী যে আমার জন্যে কতকিছু করছেন—এ জন্যে—

—ওসব থাক। হ্যারি তুমি ভালো হয়ে উঠবেই। আমার মন বলছে। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি মৃদু হাসল। বন্ধুদের শুভেচ্ছায় হয়তো ও সুস্থ হবে। হ্যারি এটাই ভাবে।

সেদিন ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে। হঠাৎ হ্যারির আবার জ্বর এলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভীষণ প্রচণ্ড জ্বর এল।

ফ্রান্সিসের কাছে খবর গেল। ফ্রান্সিস ছুটে এল। হ্যারির কপালে গলায় হাত বুলিয়ে যেন বুঝতে পারল—ভীষণ জ্বর। হ্যারি কেমন আচ্ছন্নের মত শুয়ে রইল। ফ্রান্সিস ভেনকে ডেকে পাঠাল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভেন ওর ওষুধপত্র নিয়ে চলে এল। হ্যারির মুখ গলা দেখল। নাড়ি দেখল। বিড়বিড় করে বলল—মারাত্মক সময়টা কেটে গেছে। এখন তো সুস্থ হওয়ার কথা।

ভেন বসে ওষুধ তৈরি করতে লাগল। মারিয়াকে ওষুধ বুঝিয়ে দিল। কখন কোনটা খেতে হবে বলল। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখল এক কোনায় শাঙ্কো বসে আছে। নিজে উঠে শাঙ্কোর কাছে এল। বলল—বাইরে এসো। শাঙ্কো ভেন-এর পেছনে পেছনে বাইরে এল। ভেন গলা নামিয়ে বলল,

—হ্যারির অবস্থা ভালো নয়। ফ্রান্সিসকে ডাকো। আমি এখানে দাঁড়ালাম।

শাঙ্কো দ্রুত ছুটে গেল। একটু পরেই ফ্রান্সিসকে সঙ্গে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—ভেন কী হয়েছে?

—হ্যারির অবস্থা ভালো নয়। নাক মুখ ফুলতে শুরু করেছে। যতদূর আমার বিদ্যেয় কুলোয় করেছি। এখন একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দেখাতে হবে।

—কিন্তু এখন এখানে কোথায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক পাবো? পাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—উপায় নেই। সামনেই যে বন্দর পাবে সেখানে খুঁজে নিতে হবে। কালকে সকালের মধ্যেই কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দেখাও। আমার যা সাধ্য আমি করেছি। ভেন বলল।

—তাহলে ভেন আজ রাতের মধ্যেই যে করে হোক কোন বন্দরে পৌঁছতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। দেরি করো না। জাহাজ চালাও। আমি ওষুধ তৈরি করতে যাচ্ছি। ভেন চলে গেল।

ফ্রান্সিসের পিঠে আলগা চাপড় মেরে ভেন চলে গেল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—সবাইকে ডেক-এ আসতে বল। আমি কিছু বলবো। শাঙ্কো দ্রুত চলে গেল। বন্ধুদের ফ্রান্সিসের কথা বলল।

অল্পক্ষণের মধ্যে বন্ধুরা সব ডেক-এ উঠে এল। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ। জ্যোৎস্না পড়েছে সমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের ওপর। ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটেছে।

ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল—ভাইসব। আমরা খুবই বিপদে পড়েছি। হ্যারির আবার জ্বর এসেছে। ভীষণ জ্বর। ভেন চিকিৎসা করছে। ভেন কিছুক্ষণ আগে আমাকে বলল—যদি কাল সকালের মধ্যে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে না পাওয়া যায় তবে হ্যারি—ফ্রান্সিস দুহাতে চোখ বন্ধ করল। একটু ফুঁপিয়ে উঠল। বলল—তবে হ্যারি বাঁচবে না।

শ্রোতা বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। বিস্কো বলল—তাহলে এখন আমরা কী করবো?

—যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ চালিয়ে একটা বন্দরে পৌঁছতে হবে। তারপর হ্যারির ভাল চিকিৎসা কালকে সকালের মধ্যে। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—একজন দাঁড় টানতে চলে যাও। অন্যদল সব পাল খুলে দিয়ে পালগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেশি করে বাতাস ধরাবে। পেড্রো—ফ্রান্সিস থামল। দেখল পেড্রো মাস্তুল বেয়ে উঠছে। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল।

সব ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো—।

সবাই কাজের জায়গায় চলে গেল। একদল পাল ঠিক করতে লাগল। আর কয়েকজন হাল ঠিক রাখল। অন্য দল দাঁড়ঘরে চলে গেল।

ফ্রান্সিস জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে এল।

বলল—ফ্রেজার—জাহাজ যাতে চূড়ান্ত গতিতে যায় তার ব্যবস্থা করেছি। এবার তোমার কাজ—যে ভাবে পারো জাহাজের গতি বাড়াও। ফ্রেজার মাথা কাত করে বলল—ঠিক আছে।

তখন আস্তে আস্তে জাহাজের গতি বাড়তে লাগল। বেগবান বাতাসে পালগুলো ফুলে উঠল। জাহাজ পূর্ণগতিতে চলল।

শাঙ্কো দাঁড়িদের ঘরে এল। দেখল বন্ধুরা প্রাণপণে দাঁড় টানছে। দুসারি দাঁড়িদের মাঝখানে গিয়ে শাঙ্কো দাঁড়াল। তারপর হাততালি দিয়ে দিয়ে শরীর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো—। ওপরে ডেক থেকে ভেসে এল—ও—হো—হো— ধ্বনি।

জাহাজের গতি অনেক বেড়ে গেল।

দাঁড়ঘরে শাঙ্কো তখন দাঁড় টানার দ্রুত ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে শরীর দোলাতে লাগল। আর মুখে শব্দ করতে লাগল—ও—হো—ও—হো! মাস্তুলের মাথায় বসে থাকা পেড্রো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক দেখতে লাগল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল। সমুদ্রের বুকের অনেক দূর দেখা যাচ্ছে। আজ সমুদ্রের বুকে কুয়াশা কম।

দ্রুতগতিতে জাহাজ চলল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—একজন একজন করে খেয়ে এসো। জাহাজের গতি যেন কমে না।

গভীর রাত তখন। দাঁড়িরা কেউ কেউ পরিশ্রমে কাতর হয়ে শুয়ে পড়ছে। সেখানে অন্যেরা এসে বসছে। দাঁড় বাওয়া চলছে। ওদিকে পাল টেনে টেনে মুখ ঘুরিয়ে বাতাস বেশি আসছে পালে। ফ্রেজার হুইল ঘুরিয়ে চলেছে।

রাত শেষ হয়ে আসছে। আকাশ সাদাটে হয়ে গেছে। তারাগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস সারা জাহাজ ঘুরে ঘুরে বন্ধুদের উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে।

পূব আকাশে লাল রঙের ছোপ।

মাস্তুলের ওপর থেকে পেড্রো চেঁচিয়ে বলল—ডাঙা দেখা যাচ্ছে, ডাঙা। জাহাজে ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো—। ওদের আনন্দের ধ্বনি।

সূর্য উঠল। ভোরের আলো সমুদ্রে জাহাজে ছড়াল। দূরে ডাঙা দেখা গেল।

ফ্রান্সিস দাঁড় ঘরে এল। দেখল বন্ধুরা কেউ কেউ ঘরের মধ্যেই শুয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—দাঁড় বাওয়া আস্তে কর। জাহাজ ডাঙায় গিয়ে ধাক্কা মারতে পারে।

জাহাজের গতি কমল। আস্তে আস্তে গিয়ে জাহাজঘাটায় গিয়ে থামল।

শাঙ্কো জাহাজ থেকে পার পর্যন্ত কাঠের তক্তা পেতে দিল। ফ্রান্সিস তক্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে নামবার সময় বলল—শাঙ্কো—আমি আগে চিকিৎসক খুঁজে বের করছি। তোমরা ততক্ষণ অপেক্ষা করো।

ফ্রান্সিস পারে নামল। বেশ বড় বন্দর। আট দশটা জাহাজ নোঙর করে আছে। চারদিকে তাকাল একবার। কোন দিকে কোথায় যাবে চিকিৎসকের খোঁজে এটা বুঝে উঠতে পারছিল না।

রাস্তার ধারের দোকানপাট খুলে গেছে। লোকজনের ভিড় বাড়ছে। ফ্রান্সিস এদিন-ওদিক ঘুরতে লাগল। এক প্রৌঢ় ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করল—এখানে ভাল চিকিৎসক কোথায় পাবো? ভদ্রলোক ফ্রান্সিসের মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে

রইল। বুঝল—ফ্রান্সিস বিদেশি। ভদ্রলোক হাত তুলে বললেন—ঐ যে চেস্টনাট গাছটা দেখছেন—তার পাশেই একটা ওষুধের দোকান আছে। ওরা বলতে পারবে।

ফ্রান্সিস চেস্টনাট গাছটা দেখল। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দেখল—সাইনবোর্ড—ওষুধের দোকান। ফ্রান্সিস দোকানে ঢুকল। এক যুবক বসে আছে।

ফ্রান্সিস বলল—বলছিলাম—এখানে চিকিৎসক পাবো।

—হ্যাঁ পাবেন বই কি।

—তিনি কোথায়?

—বাড়িতে আছেন। ঘন্টাখানেক পরে আসবেন।

—আমার রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। আমি এক্ষুনি তাঁকে দেখাতে চাই। তাঁর বাড়িটা কোথায় বলুন।

—দেখুন গিয়ে কথা বলে। যুবকটি বলল—তারপর আঙ্গুল তুলে একটা ছোট গীর্জা দেখাল। বলল—ঐ গীর্জার পেছনেই চিকিৎসকের বাড়ি।

—খুব উপকার করলেন। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ছুটল গীর্জার দিকে।

গীর্জার সামনে এল। পেছনে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে। সেটা ধরে গীর্জার পেছনে এল। দেখল একটা কাঠের কাঠ পাথরের বাড়ি। ফ্রান্সিস বন্ধ দরজায় টোকা দিল একবার। ভেতরে কারু সাড়াশব্দ নেই। আবার ঠুকলো।

—কে? একজনের গম্ভীর গলা শুনল।

—আমি চিকিৎসকের কাছে এসেছি। তাঁকে বড় দরকার। ফ্রান্সিস বলল।

দরজা খুলে গেল। একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। পাকা দাড়ি গোঁফ। বললেন—আমিই চিকিৎসক। বলুন।

—আমরা জাতিতে ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। নাম শুনেছি। চিকিৎসক বললেন।

—আমরা জাহাজে এসেছি। আমার বন্ধু খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনি তাঁকে বাঁচান। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করে অসুস্থ হল? চিকিৎসক বললেন।

—আমি বন্ধুকে নিয়ে আসতে যাবো। বন্ধুকে এনে সব বলবো। এখন কোথায় আপনাকে দেখাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—দোকানে নিয়ে আসুন। ঘন্টাখানেক পরে। চিকিৎসক বললেন।

—না-না-না। আমরা এখানেই নিয়ে আসছি। দেরি করতে সাহস পাচ্ছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। আসুন। চিকিৎসক বলল।

—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়াল। তারপর রাস্তার মানুষের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটল জাহাজঘাটার দিকে।

জাহাজে উঠল। দেখল বন্ধুরা সব দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল— চিকিৎসক পেয়েছি। তোমরা একটা দুহাত পাশে এরকম একটা কাঠের তক্তা নিয়ে এসো।

ছুটতে ছুটতে হ্যারির কেবিনঘরে এল। দেখল মারিয়া জলভেজা ন্যাকড়া হ্যারির কপালে আলগোছে চেপে ধরে আছে।

—জ্বর কমেছে? ফ্রান্সিস বলল।

—কিছুটা কমেছে। মারিয়া বলল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল—নাকমুখ ফুলে যাচ্ছে।

—ঠিক আছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। তুমি জাহাজেই থাকো। তোমার মুখ চোখ—কয়েক রাত জেগে আছো। হ্যারিকে শুশ্রূষা করছো।

—আমার জন্যে ভেবো না। তুমি শিগগির চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাও। মারিয়া বলল।

শাঙ্কো বিস্কোরা কয়েকজন ঘরে ঢুকল। হাতে করে নিয়ে এসেছে চওড়া কাঠের পাটাতন। ওরা পাটাতনটা বিছানার কাছে নিয়ে এল। দু'তিনজন হ্যারিকে ধরে এনে পাটাতনে শুইয়ে দিল। তারপর তুলে কাঁধে নিয়ে হাতে ধরে পাটাতনটা তুলে বাইরে এল। ফ্রান্সিস হ্যারির মুখের দিকে তাকাল। অবিন্যস্ত মাথার চুল। চোখ দুটো কোটরে। হ্যারি চোখ বুঁজে আছে। ফ্রান্সিস তাকিয়ে থাকতে পারল না। আবাল্য বন্ধু—কত সুখ দুঃখের স্মৃতি! ফ্রান্সিস অনেক কষ্টে কান্না চাপল।

হ্যারিকে নিয়ে ফ্রান্সিসরা ডেক-এ এলো। তারপর কাঠের পাটাতনে শোওয়া হ্যারিকে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘাটে নামল।

রাস্তার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিসরা চলল।

ফ্রান্সিস বলল—একটু তাড়াতাড়ি চল। শাঙ্কোরা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত চলল।

গীর্জার পেছনে চিকিৎসকের বাড়ির সামনে এল। দরজায় আঙ্গুল ঠুকল। একটা অল্পবয়সী ছেলে দরজা খুলল।

—তোমার কর্তা কোথায়?

—আসছেন। আপনারা এই ঘরে আসুন। ছেলেটি পাশের ঘরটায় এল। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। দেখল মেঝেয় কয়েকটা কাঠের পাটাতন পাতা তার ওপর শুকনো ঘাসের বিছানা। ওরা হ্যারিকে ধরাধরি করে ঐ বিছানায় শুইয়ে দিল।

ফ্রান্সিসরা কেউ কেউ ঘরের বাইরে গেল। শাঙ্কো বিস্কো দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস বিছানার পাশে রাখা একটা কাঠের আসনে বসল।

হ্যারি দুর্বলকণ্ঠে ডাকল—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি হ্যারির মুখের ওপর ঝুঁকল। বলল—হ্যারি—কেমন আছো? হ্যারি দম নিয়ে নিয়ে বলল—আমি—বাঁচবো না।

ফ্রান্সিস আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিসের দুচোখে জলধারা নামল। শাঙ্কো ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরে বলল— ফ্রান্সিস—ফ্রান্সিস তুমি কেঁদো না। ফ্রান্সিস হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখের জল মুছল।

তখনই চিকিৎসক ঢুকলেন। পরনে জোব্বা। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বন্ধুরা দরজায় এসে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে চিকিৎসক বললেন—কিভাবে অসুখ হল এটা বলবেন বলেছিলেন। এখন বলুন।

ফ্রান্সিস বলল—জাহাজে চড়ে আমরা আসছিলাম। একটা জায়গায় এলাম। সমুদ্রতীর। একটা জাহাজ নোঙর করে আছে। দেখলাম। আশ্চর্য—জাহাজের সব মানুষ মরে পড়ে আছে। এই রোগী আর একজন বন্ধু তীরে এসেছিল। একটা বন পার হয়ে দুটো পাথরের বাড়ি দেখেছি। দুজনে বাড়ি দুটোয় গিয়ে দেখেছিল সব লোকজন ঘরে মরে পড়ে আছে। তখনই ঘরের অন্ধকার কোনা থেকে কয়েকটা নীলরঙের বড় বড় মাছি আমার এই বন্ধুর ঘাড়ে হুলমত ফুটিয়ে দেয়। জাহাজে ফিরে এসে বন্ধুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে।

—ক'বার হুল ফুটিয়েছিল। চিকিৎসক জিজ্ঞেস করলেন।

—একবার। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। চিকিৎসক বললেন—আশা আছে।

ফ্রান্সিস প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল—আমার বন্ধুটি বাঁচবে তো।

—হ্যাঁ। বাঁচবে। চিকিৎসক বললেন। তারপর গলা চরিয়ে ডাকলেন—

—হিবু? ছেলেটি এসে দাঁড়াল। চিকিৎসক তাকে কয়েকটা ওষুধ আনতে বললেন। ফ্রান্সিসরা ঐ ওষুধের নাম জীবনেও শোনে নি।

একটু পরে হিবু দুটো বোয়াম আর একটা পুঁটুলি নিয়ে এল। একটা ছোট পাথরের পাটা আর হামান দিস্তা। একটু পরে একটা কাঠের গ্লাশে জল নিয়ে এল। চিকিৎসক ওষুধ তৈরি করতে লাগলেন। গোল শুকনো ফল হামান দিস্তায় গুঁড়ো করে বড়ি বানালেন। হিবু সাহায্য করতে লাগল। চিকিৎসক হিবুকে দুটো বড়ি একসঙ্গে খাওয়াতে দিলেন। হিবু হ্যারির মুখের কাছে এল। হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাশটা এনে বলল—দুটো বড়ি খেয়ে নিন। হ্যারির কোন সাড়া নেই।

—আপনারা তো বন্ধু। ডেকে ওষুধটা খাওয়ান।

ফ্রান্সিস হিবুর কাছে থেকে বড়ি দুটো নিল। হ্যারির মুখের কাছে মুখ এনে ডাকল—হ্যারি। হ্যারি চুপ। কোন কথা নেই। ফ্রান্সিস বার তিনেক ডাকতে হ্যারি চোখ মেলে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—এই বড়ি দুটো খেয়ে নাও। হাঁ কর, আমি জল ঢেলে দিচ্ছি। বড়ি দুটো খেয়ে নাও। চিকিৎসক বলেছেন তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। হ্যারি কিছু বলল না। মুখ হাঁ করল। ফ্রান্সিস মুখে জল ঢালল। পর

পর দুটো বড়ি মুখে দিল। হ্যারি খেয়ে নিল। এতক্ষণে ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

এবার চিকিৎসক হিবুকে সব বুঝিয়ে দিল। কাঠের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। শাঙ্কো কোমরে গোঁজা একটা সোনার চাকতি বের করে চিকিৎসকের হাতে দিল। চিকিৎসক নিয়ে জোব্বার পকেটে রাখলেন। ফ্রান্সিস বলল—দয়া করে আমার বন্ধুকে একটু অভয় দিয়ে যান। ও খুবই ভেঙে পড়েছে।

—হুঁ। চিকিৎসক মুখে শব্দ করলেন।

—হ্যারি—হ্যারি—চিকিৎসক কী বলছেন শোন।

ফ্রান্সিস বলল—নীল মাছির হুল ফোটানোর কথা।

—রোগীর চোখ মুখ ফোলা দেখেই বুঝতে পেরেছি। চিকিৎসক বললেন। চিকিৎসক এবার হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার বিপদ কেটে যাবে। আপনি সুস্থ হবেন। হ্যারি ম্লান হাসল। চিকিৎসক বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। হিবু নিজের কাজ করে চলল।

এবার হিবু বসে বসে ওষুধ বানাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ওষুধ তৈরি করল। বোঝা গেল এই ওষুধ তৈরির কাজটা ও ভালোই শিখেছে। শাঙ্কো হাত বাড়িয়ে ওষুধগুলো নিল।

হিবু—ফ্রান্সিস বলল—তোমার কাজ তো হয়েছে এবার আমাদের সঙ্গে আমাদের জাহাজে এসো।

—না—না। আমার কত কাজ। হিবু মাথা নেড়ে বলল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ইঙ্গিত করল। শাঙ্কো কোমরের ফেট্টি থেকে একটা ছোট স্বর্ণমুদ্রা বের করে হিবুর দিকে বাড়াল। হিবু ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর বলল—এই সোনার চাকতি আমাকে দিচ্ছেন কেন?

—চিকিৎসককে আমরা তাঁর প্রাপ্য দিয়ে থাকি। তোমাকেও দিলাম।

এবার হিবু সোনার চাকতিটা নিল। বলল—আমি আসছি। ও বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

কিছু পরে পোশাক পাল্টে এল হিবু। বলল—চলেন। কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি চলে আসব।

শাঙ্কোরা হ্যারির পাটাতনটা ধরল। আস্তে আস্তে তুলে কাঁধে নিল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তা দিয়ে চলল। ফ্রান্সিসদের বিদেশী পোশাক দেখে কেউ কেউ চেয়ে চেয়ে দেখল।

পথে আসতে আসতে ফ্রান্সিস বলল—হিবু এই বন্দরের নাম কি?

—ভালপেরাইসো বন্দর। সংক্ষেপে বলি প্যারাইসো।

—এটা কোন্ দেশ?

—চিলি।

ফ্রান্সিস আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। হ্যারিকে নিয়ে সবাই জাহাজঘাটায়

এল। হ্যারিকে নিয়ে সাবধানে জাহাজে উঠল। মারিয়া আর সব বন্ধুরা ছুটে এল। ফ্রান্সিস মারিয়া আর বন্ধুদের বলল—চিকিৎসক ওষুধ দিয়েছে। বলেছে হ্যারির অসুখ সেরে যাবে। ভয়ের কিছু নেই।

মারিয়া কেঁদে ফেলল। ফ্রান্সিস এসে সান্ত্বনা দিল। বলল—রাত জেগে জেগে তোমার শরীরের অবস্থা খারাপ হয়েছে। এসব নিয়ে আর ভেবো না। দেখ এই ছেলেটি হিবু নাম—চিকিৎসকের ওষুধ বানায়।

—এই বাচ্চা ছেলেটা? মারিয়া হেসে বলল।

—হ্যাঁ। তারপর ফ্রান্সিস বলল—হিবু—তুমি কখনও কোন রাজকুমারী দেখেছো?

—না—না। তবে গল্পের বইয়ে ছবি দেখেছি। কী সুন্দর দেখতে। কী সুন্দর মাথার চুল। কী সুন্দর মুকুট পরা। হিবু বলল।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—ইনিও আমাদের দেশের রাজকুমারী। মারিয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল—না—না্না। ফ্রান্সিস একবার মারিয়ার দিকে তাকাল। মারিয়া মাথা নিচু করে আছে। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া—হিবুকে যে জন্য এনেছি সেটা কর আগে। হ্যারির ঘরে চল।

তিনজনে হ্যারির ঘরে এল। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া—হিবুর কাছ থেকে ওষুধটা কখন কবার খেতে হবে এসব বুঝে নাও।

—ওষুধগুলো বের করুন। হিবু বলল। শাঙ্কো ওষুধগুলো নিয়ে এল। হিবু বলল কতটা ওষুধ খাওয়াতে হবে। কয়বার খাওয়াতে হবে এসব মারিয়াকে বোঝাল। মারিয়া ওষুধগুলো নিজের কাছে রাখল।

ফ্রান্সিস হ্যারির কাছে এল। হ্যারি তখন তাকিয়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি একটু ভালো লাগছে?

—ঠিক—কিছুই—বুঝতে—পারছি না। হ্যারি দুর্বল কণ্ঠে বলল।

—ওষুধ পড়বে। কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি সুস্থ হবে। দুশ্চিন্তা করো না।

—না—চিন্তা করে—কী হবে। যা হবার তাতো হবেই। হ্যারি আস্তে আস্তে বলল।

এবার হিবু বলল—এখানে আমার কাজ হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি।

—বেশ যাও। দরকার হলে তোমাকে যেন পাই। শাঙ্কো বলল।

—তা পাবেন বৈকি। তারপর হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল—ঠিক সময়ে ওষুধ পড়েছে। প্রথমে আপনার মুখ ফুলে যাওয়াটা কমে যাবে। তারপর আর কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সেরে যাবেন। হিবু কেবিন ঘরের বাইরে এল। শাঙ্কো সঙ্গে এল। জাহাজঘাটায় নামিয়ে দিয়ে শাঙ্কো বলল—এই জায়গার নাম তো প্যারাইসো বন্দর।

—হ্যাঁ। হিবু মাথা কাত করে বলল।

—আর কোন নগর আছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। উত্তর দিকে সান্তিয়াগো নগর। পূবে তালকানগর।

—অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। শাঙ্কো বলল।

হিবু জাহাজ থেকে নেমে লোকজনের ভিড়ে হারিয়ে গেল।

শাঙ্কো ভাবছিল। এখন ওরা কি করবে? শাঙ্কোর নিজেকে খুব দুর্বল বলে মনে হতে লাগল। আমরা এখানেই থাকবো কি দেশের দিকে জাহাজ চালাবো—এটা ফ্রান্সিস হ্যারির কাছ থেকে জানতে হয়। কিন্তু ফ্রান্সিসদের কাছে যেতে পারল না। দুর্বল শরীর নিয়ে নিজের কেবিনঘরে এল। খাবার সময় বলব। এখন থাক।

শাঙ্কো বিছানায় শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। পাশের বিছানা থেকে এক ভাইকিং বন্ধু ডাকল—শাঙ্কো—শাঙ্কো। শাঙ্কো জাগল না। বন্ধুটি আর শাঙ্কোকে জাগাবার চেষ্টা করল না।

বেলা বাড়ল। বন্ধুটি স্নান সেরে এল। এসে দেখল—শাঙ্কো বিছানায় বসে আছে। বন্ধুটি বলল—যাও স্নান সেরে এসো। খেতে যাবে তো?

—আমি স্নান করবো না। শাঙ্কো বলল।

—খাবে তো? বন্ধুটি বলল।

—হ্যাঁ—খাবো।

—তাহলে—হাতমুখ ধুয়ে খেতে চলো। বন্ধুটি বলল।

—না আমি স্নান করে খেতে যাবো। শাঙ্কো বলল।

—বেশ তাই কর। তবে দেরি করো না। বন্ধুটি বলল।

—একটা কথা বলছি। শাঙ্কো বলল।

—কী? বন্ধুটি বলল।

—ভাবছি—আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা হ্যারিই দেখতো। আজ হ্যারি অসুস্থ।

—তুমিই তো বলছিলে চিন্তার কিছু নেই। হ্যারি সুস্থ হবে। একটু সময় লাগবে এই যা।

শাঙ্কো স্নান করতে চলল। কিছুক্ষণ পরে স্নান করে এল। জামাটামা পাল্টে মাথার চুল আঁচড়ে খেতে চলল।

তখন বিকেল। শাঙ্কো হ্যারিদের ঘরে এল। দেখল—মারিয়া হ্যারির মাথার কাছে বসে আছে। হ্যারিকে হাওয়া করছে। শাঙ্কো মারিয়ার দিকে তাকাল। ভাল করে রাজকুমারীকে দেখল—রাজকুমারীর গায়ে দুধে আলতা রংটা নেই। কেমন তামাটে হয়ে গেছে।

ফ্রান্সিস ঘরে পায়চারী করছে। বিস্কো দাঁড়িয়ে আছে।

শাঙ্কো দেখল—হ্যারি চলে গেছে। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল।

বলল—একটা কথা ছিল।

—বল। ফ্রান্সিস বলল।

—এখন কী করবে? শাঙ্কো বলল।

—পায়চারি করতে করতে এতক্ষণ সেই কথাই ভাবছিলাম। শাঙ্কো তুমি কী করতে চাও বল। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি আর কী বলবো। শাঙ্কো বলল।

—তোমার মতটাই বলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি আর এখানে পড়ে থাকতে রাজি নই। শাঙ্কো বলল।

—আমি আর হ্যারি ছাড়া আর সবাই দেশের দিকে যেতে চায়। ফ্রান্সিস বলল।

—খুবই স্বাভাবিক। এতদিন হয়ে গেল। শাঙ্কো বলল।

—যাত্রা শুরুর আগে প্রতিবারই আমি বলেছি—সমুদ্রপথে চরম সমস্যায় পড়তে পারি আমরা। খাদ্য নেই, জল নেই। তখন হতাশ হওয়া চলবে না। 'দেশে চল' 'দেশে চল' বলে ঘ্যানঘ্যান করতে পারবে না। দাঁত চেপে সব সহ্য করতে হবে। যারা সব সহ্য করে থাকতে চাইবে তারাই থাকবে। যারা দেশে চলে যেতে চাইবে তাদের কোন বন্দরে নামিয়ে দেব। স্বর্ণমুদ্রা দেব যাতে তাদের পথে কোন অর্থকষ্টে পড়তে না হয়। বল—এর বেশি আমি কী করতে পারি। ফ্রান্সিস থামল। বলল—রাতে খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে সবাইকে ডেক-এ উঠে আসতে বল। আমি কিছু বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল। তারপর হ্যারির কাছে এল। হ্যারির ডান হাতটা জড়িয়ে ধরল। বলল—হ্যারি তোমার কষ্ট কমেছে? দুর্বলস্বরে হ্যারি বলল—কিছুটা কমেছে ওষুধ খেয়ে।

—কিছ্ছু ভেবো না। দিন কয়েকের মধ্যেই সুস্থ হবে। তবে শরীরের দুর্বলতাটা আস্তে আস্তে যাবে। শাঙ্কো বলল।

—দেখি। হ্যারি পাশ ফিরতে চেষ্টা করল। মারিয়া ঝুঁকে পড়ে হ্যারির পিঠটা আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে দিল। হ্যারি কাত হয়ে শুল।

ভাইকিং বন্ধুরা সব ডেক-এ এসে জড়ো হল। একটু পরে ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে দেখাশুনার জন্যে মারিয়াকে রেখে এসেছে।

আকাশে চাঁদ অনুজ্জ্বল। ছেঁড়া কাপড়ের মত ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ উত্তরমুখি সার বেঁধে উড়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বলতে শুরু করল—ভাইসব—হ্যারি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এ দেশীয় চিকিৎসককে দেখানো হয়েছে। চিকিৎসকের দেওয়া ওষুধ হ্যারিকে খাওয়ানো হচ্ছে। চিকিৎসক বলেছেন—তাঁর ওষুধ নিয়মিত খেলে হ্যারি অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হবে। তবে ঘাড়ের জোরটা কমে যাবে। তাতে কিছু ক্ষতি মেনে নিতে হবে। কিন্তু হ্যারি বাঁচল তো। ফ্রান্সিস থামল। সবাই চুপ করে ফ্রান্সিসের কথা শুনতে লাগল। ফ্রান্সিস আবার বলতে শুরু করল—হ্যারি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই বন্দর শহর প্যারাইসো ছেড়ে যাবো না। মাঝ সমুদ্র দিয়ে যেতে যেতে হ্যারি যদি আবার অসুস্থ হয় তাহলে ভেন ওকে বাঁচাতে পারবে না। তখন অন্য চিকিৎসকও

পাওয়া যাবে না। অসহায় আমরা দেখবো হ্যারি আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। ফ্রান্সিস থামল। বন্ধুরা নিশ্চুপ—। কানে লাগছে শুধু সমুদ্রের শোঁ শোঁ শব্দ। ফ্রান্সিস বলল—তাহলে হ্যারি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকবো। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। তারপর চলে গেল। কোন নতুন বন্দরে এসে ফ্রান্সিস মারিয়া অন্য বন্ধুরা শহর দেখতে বেরোয়। বেশ রাত পর্যন্ত ছোট ছোট দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। তারপর জাহাজে ফিরে আসে।

আজ কিন্তু কোন বন্ধু জাহাজ থেকে নামল না। কেউ তীরে নামবার কথা বলল না। অসুস্থ হ্যারির জন্যে সবাই উৎকণ্ঠিত। কিছুই ভালো লাগছে না তাদের।

চিকিৎসকের ওষুধ খেয়ে তিন চারদিনের মধ্যে হ্যারি অনেকটা সুস্থ হল। ফ্রান্সিস উৎফুল্ল হল—যাক্ হ্যারির বিপদ কেটে গেছে।

সেদিন ডেক-এ নাচ গানের আসর বসল। হ্যারিও শাঙ্কোর কাঁধে ভর রেখে ওয়া আস্তে আস্তে ডেক-এ উঠে এল। সবাই দেখল—হ্যারি আস্তে আস্তে এসে আসরে বসল। সবাই ও—হো—হো ধ্বনি তুলল। ডেক-এ বেশ কিছুটা গোল জায়গা ঘিরে ভাইকিংরা বসল।

প্রথমে বিস্কো এল। বিস্কো হাসির গল্প বলতে ওস্তাদ। কত হাসির গল্প যে ও জানে। কয়েকজন বন্ধু গলা চড়িয়ে বলল—বিস্কো প্রথমে হাসির গল্প। বিস্কো মাথা নেড়ে বলল—বেশ। তারপর গল্প বলতে লাগল—এক সার্কাস পার্টিতে একটা গাধা ছিল। মজার খেলা দেখাত। কিন্তু সার্কাস মালিক গাধার ওপর তেমন নজর রাখতো না। কাজেই অনেক সময় গাধাটাকে খেতেও দেওয়া হত না। এরকম মাঝে মাঝেই হত। খিদের জ্বালায় গাধাটা রাতে ঘুমুতে পারতো না। ওকে এত অবহেলা সহ্য করেও ঐ সার্কাস পার্টিতে থাকতে হতো। ঘোড়া ভালুকরা গাধাটাকে বলত—তুই এত কষ্ট করে এই সার্কাস পার্টিতে পড়ে আছিস কেন? গাধা চুপ করে থাকতো। একদিন দুটো কুকুর ওকে বলল—এই দল থেকে চলে যা।

—না, না। এখানে আমাকে থাকতেই হবে। ঐ দ্যাখ—মালিকের মেয়ে তারের ওপর দিয়ে হাঁটা অভ্যেস করছে। মালিক মেয়েটিকে বলে—যদি পা ফস্‌কে পড়ে যাস তবে এই গাধাটার সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। ভাই—একদিন না একদিন পা ফস্‌কাবেই। সেই দিনের জন্যেই আমি মার খেয়ে খেয়ে এই সার্কাস দলে পড়ে আছি।

তুমুল হাসি আর হাততালিতে ভরে উঠল জাহাজের ডেক। এবার গান। এক বন্ধু এগিয়ে এল। সঙ্গে একটা পীপে হাতে নিয়ে আর এক বন্ধু এল। গান শুরু হল। পীপের দুপাশে হাতে চাপড় দিয়ে বাজনা বাজল। গান জমে উঠল। হাততালি দিল শ্রোতা বন্ধুরা।

এবার সেই গায়ক বন্ধুটি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—ফ্রান্সিস—রাজকুমারীকে একটা গান গাইতে বল। ফ্রান্সিস বলল—কী বকছো। মারিয়া গাইতে জানে নাকি?

—জানে।—তুমি জানো না। আমরা রাজকুমারীর গান শুনেছি। বন্ধুটি বলল।

—ঠিক আছে। বলে দেখি। তোমরা মারিয়াকে বলো—আমি ডাকছি। ওরা চলে গেল। একটু পরে মারিয়া এল।

—কী ব্যাপার? আমাকে ডেকে পাঠালে কেন? মারিয়া এসে বলল।

—আমার বন্ধুরা খুব ধরেছে আমাকে। ওরা তোমার গান শুনতে চায়।

—একসময় গাইতাম। এখন আর গাই না। মারিয়া বলল।

—যা পারো গাও। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। মারিয়া বলল।

মারিয়া মাঝখানের গোল জায়গাটায় দাঁড়াল। তারপর গান গাইতে শুরু করল। ফ্রান্সিস বেশ চমকে উঠল—মারিয়ার এত সুন্দর গলা। সঙ্গে পীপেয় চাপড় মেরে তাল রাখল এক বন্ধু। গানটা যেন কোথায় শুনেছে ফ্রান্সিস। একটু পরে ফ্রান্সিসের মনে পড়ল—ওরা আইসল্যাণ্ড গিয়েছিল। সেখানে এক উৎসবে চাষী মেয়েরা এই গান গেয়েছিল। বলা যায় আইসল্যাণ্ডের গান।

মারিয়ার গান শেষ হল। বন্ধুরা কয়েকজন আনন্দে লাফাতে লাগল। সেইসঙ্গে হাততালি। মারিয়াকে আরো দুটি গাইতে হল। তুমুল হর্ষধ্বনি শোনা গেল।

গানের আসর শেষ হল। বন্ধুরা নিজেদের কেবিনে চলে গেল। শাঙ্কো হ্যারিকে ধরে নিয়ে গেল।

কেবিনঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া তুমি এত সুন্দর গান গাও আমি জানতেই পারিনি।

—তোমার সামনে আমি কখনো গাই নি। তাই।

—এখন থেকে গাইবে। আমি মাঝে মাঝে তোমার গান শুনবো।

—বেশ। মারিয়া হেসে বলল।

পরদিন সকালে বন্ধুরা কয়েকজন ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে এল। শাঙ্কোও ওদের সঙ্গে ছিল। ফ্রান্সিস বলল—কী ব্যাপার?

শাঙ্কো বলল—আমরা পোশাক তৈরি করাব। তুমি কিছু সোনার চাকতি দাও।

—বেশ তো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর মারিয়াকে বলল—বন্ধুদের সোনার চাকতি দাও। মারিয়া বিছানার এক কোনে এল। হাত নামাল। একটা কাঠের বাক্স বের করল। চাবি নিয়ে বাক্সটা খুলল। বিছানা থেকে নেমে এল। শাঙ্কোদের একটা একটা করে সোনার চাকতি দিল। তারপর তিনটে চাকতি নিয়ে রাখল।

ভাইকিং বন্ধুরা খুব খুশি। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস আমরা এই দেশীয় পোশাক বানাব। তুমিও আমার সঙ্গে চলো। ফ্রান্সিস হ্যারি আর মারিয়ার দিকে তাকাল। দুজনেই নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে।

—মারিয়া—তুমি আর হ্যারি থাকো। আমরা যাচ্ছি। তোমার জন্যে পোশাক কিনে আনবো। হ্যারির শরীরের কয়েকটা মাপ নিয়ে যাচ্ছি। দর্জি ঠিক সেই পোশাক বানাতে পারবে।

ফ্রান্সিসরা তৈরি হয়ে জাহাজ থেকে জাহাজঘাটায় নামল। রাস্তায় বেশ ভিড়। ওরা একটা দর্জির দোকান খুঁজে পেল। দোকানে ঢুকল। দোকানের মালিক খুব খুশি। এত খদ্দের। এবার দর্জিকে কাপড় দেখাতে বলল। দর্জিরা দেখাল নানা রঙের কাপড়। ওর মধ্যেই ফ্রান্সিস পেল সবুজ রঙের কাপড়। কাপড়টা তুলে সবাইকে দেখাল। সকলেরই পছন্দ হল।

এবার ফ্রান্সিস মালিকের কাছে এল। কাপড়টা দেখিয়ে বলল—আমাদের মাপ অনুযায়ী এ দেশের পোশাক বানিয়ে দিন। তৈরি জামা বিকেলের মধ্যে চাই।

—এত তাড়াতাড়ি—।

ফ্রান্সিস কোমড় থেকে সোনার চাকতি দেখাল। মালিককে দিল।

মালিক খুব খুশি। বলল—কোন অসুবিধে নেই। দু'জন বেশি লোক রাখতে হবে।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস হ্যারির মাপটা দিল। বলল—এই মাপের হবে।

—বেশ। মালিক মাথা দুলিয়ে বলল।

ফ্রান্সিসরা দোকান থেকে বেরিয়ে এল। বলল, চলো—মারিয়ার জন্যে একটা গাউন কিনবো। সবাই রাস্তা দিয়ে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বেশ বড় জামাকাপড়ের দোকান দেখল।

ফ্রান্সিসরা দোকানে ঢুকল। দোকানের মালিক হাসিমুখে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস তৈরি হওয়া ঝোলানো গাউনগুলো দেখতে লাগল। কত রঙের কত রকমের গাউন ঝুলছে। ফ্রান্সিস গাউনগুলো দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে একটা হলুদ রঙের মধ্যে নীলফুল এইরকম একটা গাউন দেখল। দোকানের কর্মচারীকে গাউনটা নামিয়ে দিতে বলল। কর্মচারী ঐ গাউনটা নামাল। ফ্রান্সিস—দেখতে দেখতে বলল —শাঙ্কো—দেখ তো এই গাউনটা তোমাদের কেমন লাগছে। শাঙ্কো বলল— তোমার পছন্দ, আমাদেরও ভালো লেগেছে। রাজকুমারীকে খুবই সুন্দর দেখাবে। অন্য দুই তিনজন বন্ধুও বলল সেকথা। ফ্রান্সিস ঐ গাউনটা কিনল। একজন কর্মচারী একটা পেস্টবোর্ডের বাক্সের মধ্যে গাউনটা ভরে ফ্রান্সিসকে দিল।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সবাই জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস হ্যারির কেবিনঘরের দিকে চলল। অন্য বন্ধুরা নিজেদের কেবিনঘরে চলে গেল।

হ্যারির কেবিনঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—কেমন আছো?

—ভালো। তোমরা শহরে ঘুরে এলে?

—হ্যাঁ। সকলের পোশাক তৈরির জন্যে একজন দর্জির দোকানের মালিককে বলে এলাম। হ্যারির পাশেই মারিয়া বসে আছে।

ফ্রান্সিস এবার মারিয়ার দিকে পেস্টবোর্ডের বাক্সটা এগিয়ে ধরল। হেসে বলল—খোল। মারিয়া বাক্সটা খুলল। গাউনটা ঝুলিয়ে ধরল।

—পছন্দ হয়েছে? ফ্রান্সিস বলল।

—ভালোই হয়েছে। তবে অল্পবয়সী মেয়েদের ভালো মানাবে। আমার মত বুড়িকে ততটা মানাবে না। মারিয়া বলল।

—তুমি এখনও বুড়ি হও নি। এটা অনায়াসে পরতে পার। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। তুমি এনেছো—নিশ্চয়ই পারবো। মারিয়া বলল।

ভাইকিংরা খুব খুশি। নতুন পোশাক পরবে। বিকেল হওয়ার আগেই শাঙ্কো কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে দর্জির দোকানে এল। দোকানের মালিক হেসে বলল—আপনাদের পোশাক হয়ে গেছে। কাপড়ের একটা বড় বোঁচকার মত এক কর্মচারী নিয়ে এল। শাঙ্কো দাম মিটিয়ে দিতে গেল। দু'জন বন্ধু বোঁচকাটা ধরে রইল। শাঙ্কো ফিরে এল। বোঁচকা নিয়ে জাহাজে ফিরে এল।

ভাইকিং বন্ধুদের মধ্যে বোঁচকা নিয়ে টানাটানি চলল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—একটু ধৈর্য ধর। শাঙ্কোই যার যা পোশাক একে একে বার করে দিল। খুশি হয়ে সবাই নতুন পোশাক পরতে নিজেদের কেবিনঘরে চলে গেল।

নতুন জামাটামা পরে ভাইকিংরা খুব খুশি। ওরা ডেক-এ উঠে এল। শাঙ্কোরা কয়েকজন ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—রাজকুমারীও আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবেন।

ফ্রান্সিস বলল—আমি হ্যাঁ না বলবো না। তোমরা রাজকুমারীকে বলে দেখ।

তখনই মারিয়া ঘরে ঢুকল। হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল—হ্যারি এখন কেমন আছো?

—খুব ভাল। আজকে দুপুরে এই ঘরে হাঁটাচলা করেছি। শরীরের দুর্বলতা অনেকটা কেটে গেছে। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল—আমাদের একটা কথা ছিল।

—বল। মারিয়া বলল।

—আপনিও নতুন পোশাক পরে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে চলুন। শাঙ্কোরা বলল।

—তাহলে হ্যারিকে দেখবে কে? মারিয়া বলল।

—ফ্রান্সিস দেখবে। শাঙ্কো বলল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি হ্যারিকে দেখবে?

—এখন হ্যারি অনেকটা সুস্থ। আমিই ওকে দেখবো। শাঙ্কোরা বলছে—যাও বেড়িয়ে এসো।

—বেশ—। তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো। মারিয়ার সম্মতি পেয়ে শাঙ্কোরা খুব খুশি।

—তোমরা কোথায় বেড়াতে যাবে? মারিয়া শাঙ্কোকে বলল।

—সান্তিয়াগো নগরে। শাঙ্কো বলল।

—সে তো বেশ দূর। মারিয়া বলল।

—সান্তিয়াগোতে বেশিক্ষণ থাকবো না। তাড়াতাড়িই ফিরবো। শাঙ্কো বলল।

মারিয়া নিজের কেবিনে গেল।

কিছু পরে মারিয়া নতুন পোশাকটা পরে হ্যারির ঘরে এল। ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে হাসল। ফ্রান্সিসও হাসল। বলল—ঠিক পরতে পেরেছো।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। মারিয়া বলল।

—তোমাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে এই পোশাকে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে যাই। মারিয়া বলল।

—যাও। তাড়াতাড়িই ফিরবে। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। সব ভাইকিং গলা চড়িয়ে ধ্বনি তুলল ও—হো—হো।

সবাই পাটাতনে পা রেখে রেখে হেঁটে তীরে উঠল। শুরু হল চলা। মারিয়া শাঙ্কোকে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো এগিয়ে এল।

মারিয়া বলল—যাচ্ছো তো—সান্তিয়াগো কোথায় কতদূর জানো।

—হ্যাঁ এক এদেশী লোকের কাছে খোঁজ নিয়েছি। খুব বেশি দূর নয়। আর প্যারাইসোর এই রাস্তা ধরে গেলেই সান্তিয়াগো পৌঁছোনো যাবে।

পথচলা শুরু হল। শেষ বিকেলের রোদ বেশ সহনীয়। ওরা চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্যারাইসো পার হয়ে উন্মুক্ত ক্ষেতখামারের এলাকায় এল। শাঙ্কোরা চলল। একটা গ্রাম দেখল। কয়েকটা বাড়ি ধরে গ্রাম। গ্রামের মেয়েরা কপিকলের সাহায্যে ইঁদারা থেকে জল তুলছে। শাঙ্কোরা চলল।

সূর্য অস্ত গেল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

শাঙ্কোরা হাঁটছে। আকাশে আধভাঙা চাঁদ উজ্জ্বল হল। চারিদিকে চাঁদের আলো ছড়াল। শাঙ্কো আনন্দে শিস্ দিল।

—তোমার এত আনন্দের কারণ কী? বিস্কো শাঙ্কোকে বলল।

—চাঁদের আলো পেলাম। ভাগ্য ভাল কিনা বলো। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। চাঁদের আলোর কথা ভেবে আমরা বেরোই নি। এখন রাস্তার উঁচুনিচু গর্ত্তটর্ত দেখে হাঁটতে পারবো।

শাঙ্কোরা হাঁটতে লাগল। বিস্কো ওর দেশের গান ধরল। ভাইকিংরা ধ্বনি দিল—ও—হো—হো—

আর কিছুদূর যেতেই সান্তিয়াগো নগরের আলো দেখা গেল। শাঙ্কোরা আরো জোরে পা চালাল।

সান্তিয়াগো নগরে ঢুকল। বেশ সাজানো গোছানো শহর। রাস্তায় ভিড়। ঐ ভিড়ের মধ্যে দিয়ে শাঙ্কোরা ঘুরে ঘুরে শহরটা দেখতে লাগল। রাজা আজপার অট্টালিকা দেখে মারিয়া হাততালি দিল। মারিয়া খুব খুশি। কতদিন পরে এরকম অট্টালিকা দেখল।

হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত শাঙ্কোরা রাজপ্রাসাদের ধারে সুন্দর বাগান দেখল। কত ফুল ফুটে আছে। মারিয়া বলল—উঃ। আর হাঁটতে পারছি না। চলো এই বাগানে বসি। ওরা বাগানে ঢুকল। পাহারাদার লাঠি হাতে ছুটে এল। গলা চড়িয়ে বলল—রাতে বাগানে বসা যাবে না। শাঙ্কো পাহারাদারের কাছে এল। কোমর থেকে একটা রুপোর চাকতি বের করে পাহারাদারের হাতে দিল। পাহারাদার রুপোর চাকতিটা কোমরে গুঁজে বলল—

—আরও চাকতি দাও। এবার শাঙ্কো পাহারাদারের মাথার টুপি তুলে আনল। বলল—এই টুপি তুমি পাবে না।

—না—না—আমার টুপি দাও। পাহারাদার বলল।

—দিচ্ছি। কিন্তু আর চাকতি চাইবে না। শাঙ্কো বলল।

—বেশ—বেশ। তোমরা বস। পাহারাদার হাত বাড়াল। শাঙ্কো টুপি ফিরিয়ে দিল।

এবার সবাই পাথরের আসনে বসল। এতদূর হাঁটা। শাঙ্কো মারিয়াকে বলল— রাজকুমারী আপনার খুব কষ্ট হল।

—মোটেই না। আমি ঠিক আছি। আমার জন্যে ভেবো না। মারিয়া বলল।

বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। শরীর যেন জুরিয়ে গেল। কেউ কোন কথা বলল না।

বেশ কিছুক্ষণ শাঙ্কোরা বিশ্রাম করল। এত হাঁটাহাঁটি। শাঙ্কো বলল—রাজকুমারী আপনার খুবই কষ্ট হয়েছে।

—আমি এখনও আরো হাঁটতে পারি। মারিয়া বলল।

—তাহলে এবার শেষবারের মতো দুপাক ঘুরে আসি। তারপর কোন সরাইখানায় রাতের খাওয়া আর থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

সবাই উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কো বলল—পুব দিকটায় আমরা এখনও যাই নি। ঐ দিকে চলো।

ওরা পুবমুখে চলল। বেশ বড় বড় পাথর আর শুকনো ঘাসের ছাওয়া বাড়ি। কে জানে কাদের এই বাড়ি। নিশ্চয়ই মন্ত্রী-টন্ত্রীর। কিছু দূরেই একট মস্ত বড় মাঠ। হয়তো এখানে খেলা টেলা হয় মেলাও বসে। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। আর কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি হল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—আর ঘুরে বেড়ানো নয়। এক ভাইকিং বন্ধু বলে উঠল,—খিদেয় পেট জ্বলছে।

বিস্কো বলে উঠল—শাঙ্কো ঐ যে একসারি গাছ। বেশ কয়েকটা দোকান। ওখানে সরাইখানা পাওয়া যাবে। চল।

বিস্কোর অনুমান ঠিক। ওখানে দুটো সরাইখানা পাওয়া গেল। শাঙ্কোকে বলল— দুই সরাইখানার মালিককে দেখ ভালো করে। ওরা দাঁড়িয়ে আছে। তখনই প্রথম সরাইখানার মালিক ওর এক কর্মচারীকে বকতে বকতে তার গালে চড় কষাল। শাঙ্কো বলল—এই সরাইখানার মানিক রগচটা। ওর দোকানে যাবো না। এবার পরের সরাইখানাটায় এল। দাড়ি গোঁফওয়ালা মালিক হাসিমুখে এগিয়ে এল। বলল—আসুন—থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থাই ভাল। শাঙ্কো বলল—এই সরাইখানায় এসো। সবাই সরাইখানায় ঢুকল। পেছনে দেখল এক মস্তবড় জালায় জল রাখা। ওঁরা হাতমুখ ধুয়ে ঢালাও বিছানায় বসল।

মালিক এল। হাসিমুখে বলল—আপনারা কি এখন খাবেন?

—আমরা ক্ষুধার্ত। এখনই খাবো। শাঙ্কো বলল।

—সে ব্যবস্থা করছি। মালিক চলে গেল।

মিনিট পনেরোর মধ্যে কাজের লোকেরা শাঙ্কোদের সামনে চিনেমাটির থালা রেখে গেল। তারপর চিনেমাটির বড় বাটি রেখে গেল। বাটিতে গরম মুর্গির মাংস। থালায় দিল চারখানা গরম রুটি। শাঙ্কোরা খেতে শুরু করল। বেশ সুস্বাদু মাংসের ঝোল। সবাই বেশ ভালোই খেল। মালিকের মুখে হাসি নেই। শাঙ্কো মালিকের কাছে গেল। হাসল। কোমরের ফেট্টিতে রাখা দুটো সোনার চাকতি বের করল। মালিক অবাক। তাকিয়ে আছে। শাঙ্কো সোনার চাকতি দুটো দিল। বলল,

—কী খুশি তো?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মালিক মাথা নাড়তে নাড়তে বলল।

—আমরা একটু বেশি খেয়ে ফেলেছি। খিদে তো। শাঙ্কো বলল।

—না—না। তাতে কি? মালিক বলল। তারপর গলা নামিয়ে বলল—এখনও তো পাঁচজন খেতে বাকি। আবার রান্না চাপানো হয়েছে। তারা দুতিনদিন ধরে এখানে আছে। তাদের তো আর না খাইয়ে রাখতে পারি না।

—তা তো বটেই। শাঙ্কো বলল।

রাতের খাওয়া হলে। ক্লান্ত বিস্কোরা বেশ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হল। শাঙ্কোর ঘুম ভাঙল। পাখির ডাক শোনা গেল। শাঙ্কো মারিয়ার আলাদা ঘরে এল। দেখল মারিয়া প্রাতরাশ খাচ্ছে। শাঙ্কো বলল—রাজকুমারী আমরা এখন কী করবো?

—প্যারাইসো বন্দর শহরে ফিরে যাবো। শহর দেখা ঘুরে বেড়ানো সবই তো হয়ে গেছে।

—ঠিক আছে। একটা কথা বলছিলাম—আমরা এখানে দুপুরের খাবার খেয়ে রওনা দেব। শাঙ্কো বলল।

—এটা ঠিক করেছো কেন? মারিয়া বলল।

—সকালের সামান্য খাবার খেয়ে সারা পথ হাঁটতে হবে। দুপুর নাগাদ প্যারাইসো পৌঁছব। তখন সরাইখানায় সবারই খাওয়া হয়ে যাবে। আমাদের জন্যে আবার রান্না করতে সরাইওয়ালা রাজি হবে কিনা সন্দেহ। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে। দুপুরের খাওয়া খেয়ে যাবো। সবাইকে বলে দাও।

শাঙ্কো বিস্কোর কাছে গেল। রাজকুমারীর সঙ্গে যা কথা হয়েছে বলল।

বিস্কো রাজি হল। বলল—এইভাবে গেলেই আমরা কোন সমস্যায় পড়ব না। শাঙ্কো সব বন্ধুদের বলল। সবাই রাজি হল।

দুপুরের খাওয়া শাঙ্কোরা তাড়াতাড়িই খেয়ে নিল। সবাই তৈরি হয়ে যাত্রা শুরু করল প্যারাইসো বন্দর শহরের দিকে।

রোদের তেজ কম। মাঝে মাঝে সূর্য উড়ন্ত মেঘে ঢাকা পড়ছিল। মেঘ সরে যেতেই রোদ।

কালো রঙের মাটির রাস্তা। হাওয়ায় ধুলো উড়ছে মাঝে মাঝেই। রাস্তায় ঝরে পড়ছে গাছের পাতা।

শাঙ্কোরা চলল। শাঙ্কো একবার দুবার মারিয়ার কাছে এল। বলল—আপনার কষ্ট হচ্ছে না তো?

—না—না। মারিয়া হেসে বলছে—আমি ঠিক আছি। আমার জন্যে ভেবো না।

সন্ধ্যে হল। অন্ধকার নামল। শাঙ্কোরা হেঁটে চলেছে। একটা মোড়ে এসে দেখল— একটা অশ্বত্থগাছের নিচে আলো জেলে কয়েকটা দোকানে কেনাকাটা চলছে। বিস্কো তাড়াতাড়ি গেল। দেখল—মাংসের বড়া বিক্রি হচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি শাঙ্কোর কাছে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—মাংসের বড়া বিক্রি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি চল। ভাইকিংরা দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। শাঙ্কো সবার জন্যে বড়া কিনতে চাইল। কিন্তু বড়াওয়ালা বলল—অত বড়া নেই। শাঙ্কো যা আছে তাই চাইল। দোকানি শাঙ্কোদের মাংসের বড়া আর ক'টা রুটি দিল। ভাইকিংরা সবাই খাবার পেল না। যারা পেল বড়া ভেঙে খেল। রুটি অবশ্য বেশিই ছিল। ভাইকিংরা তাই খেল। সামনেই একটা ইঁদারা। শাঙ্কোরা জল খেল। তারপর হাঁটা।

কিছুদূর যেতে হঠাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। আর কিছুদূর এগোতে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সেইসঙ্গে বাজ পড়ার শব্দ।

শাঙ্কোরা জাহাজী। সমুদ্রের সঙ্গে ওদের নাড়ির যোগ। বিদ্যুতের আলো দেখে শাঙ্কো আন্দাজ করল আর অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে। শাঙ্কো জোরে বলল—ভাইসব—ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে। তার আগেই ডানদিকের জঙ্গলে

ঢুকে পড়। এখানে কোন বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না। আশ্রয় নেবার হলে বনের মধ্যে ঢুকতে হবে।

এতক্ষণ বাতাস খুব আস্তে বইছিল। হঠাৎ সেই বাতাসও বন্ধ হয়ে গেল।

শাঙ্কোই প্রথমে ডানদিকের বনে ঢুকে পড়ল। তারপর সকলেই যখন ছুটে আসছে প্রচণ্ড ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবাই বনে ঢুকে পড়ল।

বৃষ্টি শুরু হল। গাছের পাতায় চট্ চট্ শব্দ হতে লাগল। তারপর সেই শব্দ আর শোনা গেল না। ততক্ষণে গাছের পাতা ভিজে গেছে।

অন্ধকারে শাঙ্কোরা দাঁড়িয়ে রইল। প্রচণ্ড ঝড়ের হাওয়া বইছে। গাছগাছালি মাথা দোলাচ্ছে। বাতাসের শন্‌শন্ শব্দ। ঝড় বৃষ্টি চলল।

বিস্কো হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় দেখল চারপাঁচজন প্রহরী বন্দীদের নিয়ে যাচ্ছে। বারবার বিদ্যুতের আলোয় দেখল বন্দীদের দল থেকে একজন খুব দ্রুত বেরিয়ে এল। দুজন প্রহরী খোলা তরোয়াল নিয়ে ছুটে এল। কয়েদীটি এক লাফে রাস্তা থেকে বনের গাছের কাছে চলে এল। প্রহরীরা থেমে গেল। বন্দী কয়েদী সঙ্গে সঙ্গে বড় গাছের আড়ালে চলে এল। বিদ্যুতের আলো চমকালেই সেই আলো অন্ধকার বনে খোলা তরোয়াল হাতে প্রহরীরা নিজেদের দলে ফিরে গেল। ওরা চলল। প্রহরীরা কয়েদীদের চেঁচিয়ে বলল—কেউ পালাবার চেষ্টা করলে মরবে। কয়েদীদের নিয়ে প্রহরীরা চলে গেল।

বৃষ্টি থামল। শাঙ্কো অন্ধকারে সেই কয়েদীদের কাছে গেল। আন্দাজে কয়েদী কোথায় আছে বুঝে নিল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল— আমরা ভাইকিং। বিদেশী। আমাদের জন্যে ভয় পেও না। একটু পরে শাঙ্কো বুঝল কয়েদীটি হেঁটে হেঁটে ওদের দিকেই আসছে। একটু পরে কয়েদীটি শাঙ্কোর কাছে এল। অন্ধকারে শাঙ্কো দেখল—কয়েদীটি বড় রোগা। যেন অনেকদিন না খেয়ে আছে। শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল,

—তুমি কে?

—আমি তামাকা। এখানকার মানুষ। পুবদিকে কিছু দূরে একটি রাজ্য তানাকা। ওখানেই আমার ঘরবাড়ি।

একটু থেমে বলল—বৃষ্টি মনে হয় কমেছে। এখন এখানে থাকলে গাছের তলা থেকে জল পড়বে বেশি। বেশি ভিজে যাবো। বনের বাইরে চলুন।

তানাকা আর শাঙ্কোরা বনের বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। বৃষ্টি একেবারে থেমে যায় নি। টিপটিপ পড়ছিল। তানাকা শাঙ্কোকে বলল—আপনারা কারা? বিদেশী নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ—আমরা ভাইকিং। আমরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসি। শাঙ্কো মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—উনি আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—আপনারা এরকম বেড়ান—কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই?

—ঠিক উদ্দেশ্যহীন নয়। কোথাও কোথাও আমরা গুপ্তধনের কথা শুনলে তা বুদ্ধি খাটিয়ে খুঁজে আবিষ্কার করি। শাঙ্কো বলল।

—গুপ্তধন নিয়ে যান। তানাকা বলল।

—না। যে আসল মালিক তাকে দিয়ে দিই। নিজেরা একটা মুদ্রাও নিই না। শাঙ্কো বলল। তানাকা বেশ অবাকই হল। ও ঠিক বিশ্বাস করল না। আবার এই নিয়ে কোন কথাও বলল না।

এতক্ষণ তানাকার হাতের দড়ি খোলা হয়নি। শাঙ্কো দেখল সেটা। ও নিজের জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করল। তানাকার হাতের দড়িটাকে ছোরা দিয়ে কেটে দিল। তানাকা হাতের কব্জিদুটোয় হাত বুলোতে লাগল।

সূর্য উঠেছে কিছুক্ষণ আগে। এবার ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। সবার পোশাক ভেজামাথা থেকে টপ্ টপ্ করে জমা জল পড়ছিল এতক্ষণ। সবাই ভিজে ঢোল। এক ভাইকিং বন্ধু এতক্ষণে বলল—সুন্দর জামাটামা পরা আমাদের কপালে নেই। যাও বা পেলাম জলকাদায় এক কদাকার চেহারা নিয়েছে। এবার আরো দু'তিনজন ভাইকিং বলল—মাথা গা সব ভিজে একশা। দুর্ভাগ্য—দুর্ভাগ্য। হাঁটতে হাঁটতে আরো কয়েকজন বলল—রাস্তায় কাদা জমে গেছে। কাদা ছিটকোচ্ছে। নতুন পোশাক দেখাচ্ছে যেন তিরিশ বছরের পোশাক।

বেলা বাড়তে লাগল। সবাই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। কিন্তু কোথায় জুটবে সরাইখানা। চলছে সবাই। হঠাৎ তানাকা গলা তুলে বলল—ঐ ওক গাছটার নিচেই রয়েছে একটা সরাইখানা।

চলল সবাই। সত্যিই দুটো ঘর। পাথর আর শুকনো ঘাস দিয়ে তৈরি।

সবাই সরাইখানার সামনে এসে থামল। মালিক কাঠের পাটাতনে বসে আছে। এত খরিদ্দার দেখে খুব খুশি।

—আসেন, আসেন। মালিক একগাল হেসে বলল। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে এল।

শাঙ্কোরা ঘরের ভেতর ঢুকল। পাটাতন পাতা। তার ওপরেই শাঙ্কোরা বসল। সবাই জল খেল। কেউ কেউ রান্নার বড় উনুনের কাছে এসে বসল। জামাটামা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় শুকিয়ে নেওয়া।

শাঙ্কো মালিকের কাছে এল। বলল—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের খেতে দিন। বেশি দেরি করলে ময়দা আটা চিনির জলে ঢেলে খেয়ে নেব। মালিক আঁতকে উঠল।

—না—না। দেখছি দেখছি। মালিক কথাটা বলে রাঁধুনিদের কাছে গেল। ফিস্ ফিস্ করে বলল—তাড়াতাড়ি রুটি মাংস রেঁধে দাও। নইলে ভাঁড়ার ঘরে রাখা আটা ময়দা, চিনি সব লুঠ করবে। তাড়াতাড়ি করো।

রাঁধুনিরা খুব তাড়াতাড়ি রুটি মাংস রাঁধল। মালিক শাঙ্কোদের কাছে এসে হেসে বলল—আপনাদের খাবার আসছে। আপনারা খেতে বসুন।

শাঙ্কোরা সার দিয়ে বসল। পদ্মপাতা দেওয়া হল। তারপর রুটি আর মাংস। কেউ জানতে চাইল না এটা কিসের মাংস। পাতে পড়ামাত্র ওরা হাপুস হুপুস খেতে লাগল। শাঙ্কো বারকয়েক মারিয়াকে জিজ্ঞেস করেছে শরীর ভালো আছে কিনা। মারিয়া হেসে বলেছে আমার জন্যে ভেবো না।

খাওয়া শেষ। জল খেয়ে উঠল সবাই। শাঙ্কো সোনার চাকতি দিয়ে দাম মেটালো। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—চল সবাই।

শাঙ্কোরা চলল। একটা মোড়ে এসে দাঁড়াল সবাই। শাঙ্কো দেখল একটা রাস্তা সোজা চলে গেছে অন্যটা ডানদিকে মোড় নিয়েছে। তানাকা শাঙ্কোর কাছে এগিয়ে এল। বলল—সোজা রাস্তা চলে গেছে তানাকার দিকে। ডানদিকের রাস্তাটা গেছে প্যারাইসো। এখন আপনারা কোথায় যাবেন?

—প্যারাইসো বন্দরের কাছে।

—তাহলে ডানদিকের রাস্তাটা ধরে চলতে হবে।

—হুঁ। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—ডান দিকের রাস্তা দিয়ে আমরা যাবো। চলো সব।

ডানদিকের রাস্তা ধরে চলল সবাই।

মাথার ওপর সূর্য যেন আগুন ছড়াচ্ছে। পেট ভরা আছে। এতেই ওরা তৃপ্ত। রোদের তীব্রতা ওদের কাহিল করতে পারল না। বেশ জোরেই হাঁটতে লাগল সবাই।

শাঙ্কো তানাকার কাছে এল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তানাকা বলল—এবার তোমার কথা বলো তো। কী করেছিলে যে বন্দী হলে?

—সে অনেক কথা। তানাকা বলল।

—বল—শুনি। শাঙ্কো বলল।

—দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য। তানাকা বলল।

—বেশ তো। দুঃখের কথাটাই শুনি। শাঙ্কো বলল।

একটু থেমে তানাকা বলতে লাগল—তানাকা রাজ্যেই আমার জন্ম। তাই আমি নিজেই আমার নাম রেখেছি তানাকা। পড়াশুনো বেশি করতে পারি নি। বাবা ছিলেন হীরের গয়না তৈরিতে ওস্তাদ।

সান্তিয়াগো আর অন্য দেশ থেকে বাবার কাছে লোক আসতো হীরের গয়না তৈরি করার জন্যে। বাবার হাতের কাজ ছিল নিখুঁত। তানাকার বাজারের মধ্যে আছে বাবার দোকান। স্কুল পালিয়ে আমি বাবার দোকানে এসে বসে থাকতাম। পড়াশুনোর প্রতি আমার কোন আগ্রহই ছিল না। বাবাও বুঝল সেটা। বাবা বললেন—কী আর করবি। হীরের কাজই শেখ। বাবা হাতে ধরে আমাকে হীরের কাজ শেখাতে লাগলেন। আমার বাবা আমার কাজ দেখে

বললেন—ভালো। তাহলে হীরের সঙ্গে সোনা রুপোর কাজও শেখ। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে হীরে সোনা রুপোর কাজও শিখলাম। বাবার কাজে সাহায্য করি। আবার শুধু নিজেও গয়না টয়না তৈরি করতে লাগলাম।

তানাকা থামল। তারপর বলতে লাগল—আসলি হীরে সোনা এক নজর দেখেই আমি চিনে ফেলতাম। বাবা আমার এই গুণটার খুব প্রশংসা করলেন। বললেন—আমিও তোর মত এত তাড়াতাড়ি হীরে সোনা চিনতে পারি না। বাবা মাঝে মাঝে শুধু আমাকেই একটা গয়না তৈরির দায়িত্ব দিতে লাগলেন। আমিও গয়নাগুলো নিখুঁতভাবে করতে লাগলাম।

একটু থেমে তানাকা বলতে লাগল—এইসময় আমার এক বন্ধু জুটল—আরোনাস নাম। ও দোকানে আসতো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওর সঙ্গে গল্পটল্প করতাম। মাঝে মাঝে আরোনাসের সঙ্গে দোকানের কাজ শেষ করে দোকান থেকে বাইরে আসতাম। বাবা আপত্তি করতেন না। তানাকা থামল। শাঙ্কো কিছু বলল না। তানাকা বলতে শুরু করল—

এক দুপুরে আরোনাস একটু আগেই আমাকে দোকানের বাইরে নিয়ে এল। বলল—চল্—আজকে মন্ত্রীমশাইর বাড়ি যাবো।

—তোকে নেমন্তন্ন করেছে? আমি বললাম।

—না না। আমি নিজে থেকেই যাচ্ছি। আরোনাস বলল।

—কী জন্যে যাচ্ছিস? আমি বললাম।

—আছে—আছে। চল—দেখবি। আরোনাস শুধু এই কথাটাই বলল।

দুজনে মন্ত্রীমশাই-র বেশ বড় বাড়িটার সামনে এলাম। চারদিকে পাথরের দেয়াল। খুব উঁচু নয়। আরোনাস বলল—দেওয়াল পার হতে পারবি তো?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমি বললাম। কিন্তু এভাবে না বলে কয়ে—

—উপায় নেই। বিনা কারণে কেউ তোকে এমনি এমনি থলিভর্তি সোনার চাকতি দিয়ে যাবে না। আরোনাস বলল।

—ঠিক আছে। পার হ। আমি বললাম।

দুজনে দেওয়াল পার হলাম। একটা বড় বাগান। ফলফুলের গাছ। আরোনাসের পেছনে পেছনে মাথা নিচু করে একটা বড় আপেল গাছের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি তখনও জানি না ওখানে কেন দাঁড়িয়ে গেলাম। ওখান থেকে কাচের জানালা দিয়ে ঘরটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে আছি। কিছু পরে রাজার এক পেয়াদা এল। দরজায় শব্দ করল। মন্ত্রীমশাই নিজেই দরজা খুলে দিলেন। বাড়ির পাহারাদার বোধহয় অন্য কাজে গেছে। পেয়াদা কোমর থেকে একটা ভেলভেট কাপড়ের থলিমত বের করল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে মন্ত্রীমশাইর হাতে দিল। আরোনাস ফিস্ ফিস্ করে বলল—পেছনে চল্। জলদি।

দুজনে দ্রুতপায়ে বাড়ির পেছনে এলাম। একটা মোটাগাছের আড়াল থেকে দেখলাম একটা ঘর। শোবার ঘর। মন্ত্রীমশাই সেই ঘরে এলেন। একটা আবলুশ

কাঠের আলমারি। মন্ত্রীমশাই আলমারির দরজাটা খুললেন। থলিটা পরের তাকে রাখলেন। তারপর চলে গেলেন। আলমারিটা বন্ধও করলেন না। বোধহয় পরে থলিটা কোথাও রাখবেন।

এবার আরোনাস ফিস্‌ফিস্ করে বলল—তুই পেছনের গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়া। দাঁড়িয়েই থাকবি। আমি কথামত গেট-এ গিয়ে দাঁড়ালাম। শুনলাম দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ। একটি কাজের স্ত্রীলোক দরজা খুলে বেরিয়ে এল। আরোনাস আমাকে দেখিয়ে কী বলল। স্ত্রীলোকটি আমার কাছে আসতে লাগল। তখনই দেখলাম আরোনাস খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে দ্রুত ঢুকে পড়ল। আর অল্প সময়ের মধ্যে বেরিয়ে এল। স্ত্রীলোকটি তখন আমার সামনে আসছে। আরোনাস মুহূর্তের মধ্যে শোবার ঘরের দরজা ভেজিয়ে ছুটে এল আমাদের কাছে। স্ত্রীলোকটি তখন আমাকে জিজ্ঞেস করছে—এই দরজা দিয়ে এলেন কেন? বড় দরজায় যান। আরোনাস ছুটে এল। চাপা গলায় বলল—পালা। ছোট। আমিও আরোনাসের পেছনে পেছনে ছুটলাম। কাজের স্ত্রীলোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

রাস্তায় নেমেই আরোনাস বলল—এবার স্বাভাবিকভাবে হাঁট। সব হিসেবমত করেছি। আর ভয়ের কিছু নেই।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে আরোনাসের বাড়ি এলাম। আরোনাস কী একটা লোহার মত লম্বা কাঠি বের করল। দরজাটার ফাঁকে ঢোকাল। দরজা খুলে গেল। দুজনে ভেতরে ঢুকলাম। তখনও আমরা হাঁপাচ্ছি। যীশু বাঁচিয়েছেন। ঠিক সময় পালাতে পেরেছি।

আরোনাস জামার গলার কাছ দিয়ে হাত ঢোকাল। থলিটা বার করল। সোনার চাকতিগুলো বিছানায় ছড়াল। গুনল। বলল—মন্ত্রীমশাই আমাদের টিকিও ছুঁতে পারবে না। আমাদের কামাইটা আজ ভালোই হল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম— চলি রে।

—দাঁড়া—এই সার্টিনের থলিটা নিয়ে যা। আরোনাস বলল।

—না—না। আমি বললাম।

—নিয়ে যা। অনেক কাজে লাগবে। আরোনাস বলল।

কেমন লোভ হল। জিনিসটা দেখতেও সুন্দর। থলিটা নিলাম। বাড়িতে আর আনলাম না। দোকানেই রেখে দিলাম।

—ওটাই ভুল করেছো—শাঙ্কো বলল—চুরির জিনিস রাখাও অপরাধ।

—সেটা পরে বুঝলাম।

—হুঁ। তারপর বলো। শাঙ্কো বলল।

—বেশ কিছুদিন কাটল। মন্ত্রীর বাড়িতে চুরি। হৈ-চৈ পড়ে গেল। সে সব চাপাও পড়ল।

আরোনাস মাঝে মাঝেই আসে। একটা কথা ভালোই বুঝলাম—আরোনাস পাকা চোর। আমি ওর সঙ্গে যেতে না চাইলেও ও প্রায় জোর করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে লাগল। তখন ও বলছিল—আমি চুরি টুরি করা ছেড়ে দিয়েছি। চল্ এমনি ঘুরে টুরে আসি।

কিছুদিন গেল। আরোনাস একদিন বলল,—তোর বাবা তো হীরের কাজের নাম করা কারিগর। কত রাজা-রাজড়া তাঁকে দিয়ে গয়নাটয়না বানায়।

—হ্যাঁ। এসব কাজে বাবার সুনাম আছে। আমি বললাম।

—শুনেছি—আট দশ মাস আগে এখানকার রাজা ব্রাপেন নাকি একটা হীরে দিয়েছে ভেঙে গয়না বানাতে।

—হ্যাঁ। ঐ কাজে এখনও আমরা হাত দিতে পারিনি।

—রাজা কী দিয়েছে? আরোনাস বলল।

—একখণ্ড তিনকোনা হীরে। ওটাই ভেঙ্গে দুটো গয়না গড়াতে হবে। আমি বললাম।

—তোর বাবা হীরেটা কোথায় রেখেছে? আরোনাস বলল।

—দোকানের লোহার সিন্দুকে। আরোনাসকে আমি বললাম।

—ওটার চাবি তোর বাবার কাছেই থাকে। আরোনাস বলল।

—নিশ্চয়ই। আমি বললাম।

—উনি চাবিটা কোথায় রাখেন? আরোনাস বলল।

—সে অনেক ব্যাপার।

—তার মানে? আরোনাস বলল।

—একটা ছোট্ট রুপোর শেকলের মধ্যে চাবিটা থাকে। আমি বললাম।

—সে কি। ঐ নিয়েই স্নান খাওয়া শোওয়া? আরোনাস বলল।

—হ্যাঁ। শুধু রোববার বাবা ঘুম থেকে উঠে ওটা আমাদের এক ছোট্ট যীশুর মূর্তির বেদীতে ঢুকিয়ে রাখে। আমি বললাম।

—তারপর—সোমবার সকালে কোমরে পরেন। আরোনাস বলল।

—তাহলে রোববার সারা দিন রাত ওটা ঐ বেদীতেই থাকে। আরোনাস বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু এত কথা জানতে চাইছো কেন? আমি বললাম।

—কারণ আছে। আমার এক দাদা পেরুর রাজধানী লিমা থেকে এক খণ্ড হীরে কিনে এনেছে। আমাকে বলল—বড় দামী হীরে। বাড়িতে সিন্দুক-টিন্দুক নেই। সিন্দুক আছে এমন কারুর সঙ্গে তোর জানাশোনা আছে? আমি তোদের কথা বললাম। ঐ হীরেটা আমি তোদের সিন্দুকে রাখবো। আরোনাস বলল।

—কিন্তু বাবা বোধহয় রাজি হবেন না। আমি বললাম।

—আরে বাবা দিন পনেরোর মামলা। দাদা দিন পনেরো পরে চলে যাবে। তখন নিয়ে যাবে। আরোনাস বলল।

—ঠিক আছে। কিন্তু পনেরো দিনের মধ্যে নিতে হবে। আমি বললাম।

—নিশ্চয়ই। এখন আমি বলছিলাম তুই তোর বাবাকে এই নিয়ে কিছু বলবি না। আরোনাস বলল।

—বেশ। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

—তাহলে সামনের রোববার দুপুরে তুই চাবিটা নিয়ে আয়। হীরেটা দোকানের সিন্দুকে রেখে দেব। চাবি আগের জায়গায় রেখে আসবি। এইজন্যে আমি তোকে একটা স্বর্ণমুদ্রা দেব। আরোনাস বলল।

—বেশ। আমি বললাম।

—তবে পরশু রোববার। দুপুরের সময় তোদের দোকানের সামনে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো। আরোনাস বলল।

—বেশ। স্বর্ণমুদ্রাটা? আমি বললাম।

—কাজ সেরে দেব। আরোনাস বলল।

তানাকা থামল। তারপর আবার বলতে লাগল—সেই রোববার চাবি নিয়ে এলাম। দোকান খুলে সিন্দুকের কাছে গেলাম। সিন্দুক খুললাম। আরোনাস বলল— ওপরের জানলাটা খুলে দে। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমি জানলা খুললাম। আরোনাস বলল—জানালা বন্ধ করে দে। কাজ হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম হীরেটা কত বড়? আমি জানতে চাইলাম।

—বেশি বড় না। তোদের যেটা আছে—তেমনি বড়। আরোনাস বলল।

দুজনে দোকানের বাইরে এলাম।

—তারপর? শাঙ্কো বলল।

—কী আর বলবো। তানাকার রাজা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে যান। ঐদিনের পরেই খবর পেলাম—রাজা ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে এসেছেন। শোভাযাত্রা করে রাজা প্রাসাদে ফিরলেন।

কয়েকদিন পরে সেনাপতি ঘোড়ায় চড়ে এলেন। দোকানে ঢুকলেন। বাবা উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে সেনাপতিকে সম্মান জানালেন। সেনাপতি বললেন— রাণিমা আগে দেওয়া হীরের খণ্ডটা থেকে গয়না করতে বলেছেন। আপনাকে কাল রাজপ্রাসাদে যেতে হবে। রাণিমা নক্‌শা তৈরি করেছেন। সেরকম অলঙ্কারই আপনাকে করতে হবে। বাবা মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন—ঠিক আছে।

সেনাপতি কোমর বন্ধনী থেকে একটা গভীর নীল রঙের রুমাল বের করলেন। রুমালের ভাঁজ খুলে বললেন—এই হীরেটা নিন। রেখে দিন। রাণিমা পরে কিভাবে তৈরি করবেন তার নক্‌শা দেবেন।

বাবা আবার বললেন—ঠিক আছে।

সেনাপতি চলে গেলেন। বাবা সিন্দুক খুলে হীরেটা রেখে দিলেন। সিন্দুকটা বন্ধ করলেন। তখনও আমরা বুঝিনি আমাদের কী সর্বনাশ হয়ে গেছে।

—তারপর? শাঙ্কো বলল।

বাবা পরদিন রাজবাড়িতে গেলেন। বড় দরজার এক প্রহরী বাবাকে দেখে বলল—আপনিই তো মণিকার?

—হ্যাঁ।

—রাণিমার সঙ্গে দেখা করতে চলুন। প্রহরী বাবাকে নিয়ে অন্দরমহলের কাছে নিয়ে এল। অন্দরমহলের প্রহরী বাবাকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বাবাকে ভেতরে নিয়ে গেল। বাবা তো অবাক হয়ে চারদিকের সাজসজ্জা দেখছিলেন। একটা ঘরে দেখলেন রাণিমা একটা সিংহমুখওয়ালা আসনে বসে আছেন। বাবাকে বসতে বললেন। বাবা একটা ছোট আসনে বসলেন। রাণিমা একজন পরিচারিকাকে বললেন—নক্‌শাটা নিয়ে আয় তো। পরিচারিকা একটা পার্চমেণ্ট কাগজ নিয়ে এল। কাগজটা বাবার হাতে দিয়ে বললেন—দেখুন নকশাটা কেমন করেছি। বাবা দেখে টেখে বললেন—কিছু এদিক-ওদিক করে হীরে দিয়ে করা যাবে।

—নক্‌শা নিয়ে যান। এই নকশামত করবেন।

বাবা ফিরে এলেন। তখন দুপুর। আমি দোকান খুলে বসে আছি। বাবা এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে চাবি বের করে সিন্দুকটা খুললেন। চিৎকার করে বলে উঠলেন— রাণিমার হীরেটা কোথায়? আমি লাফিয়ে উঠলাম। ছুটে এসে দেখি আগের হীরের খণ্ডটা নেই। সেখানে একটা কাচের ডেলা। হাতে নিয়ে দেখে বুঝলাম কাচের ডেলা। বাবা তখনও চিৎকার করছেন—সর্বনাশ হয়ে গেল। রাণিমা আমাকে ফাঁসি দেবেন। তাঁর হীরের খণ্ডটা চুরি হয়ে গেছে।

আমি সবই বুঝলাম তখন। আরোনাসের হাত সাফাই—কোন সন্দেহ নেই। আমি বললাম—বাবা—আমি দেখছি। তুমি বাড়ি যাও। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করো।

আমি দোকানের বাইরে এলাম। প্রায় ছুটে এলাম আরোনাসের বাড়িতে। দরজা বন্ধ। দরজায় জোরে টোকা দিলাম। এক বুড়ি হয়তো আরোনাসের মা এসে দাঁড়াল। আমি হাঁপাচ্ছি তখন। বললাম—আরোনাস কোথায়?

—তুমি কে? আরোনাসের মা বলল।

—সেসব পরে বলছি। আরোনাস কোথায় বলুন। আমি বললাম।

—আরোনাস সান্তিয়াগোতে—ওর পিসির বাড়ি বেড়াতে গেছে।

—সেই পিসির বাড়ি কোথায়? আমি জানতে চাইলাম।

—তা তো ঠিক বলতে পারবো না। আরোনাসের মা বলল।

—আপনাদের আত্মীয় তার ঠিকানা জানেন না? আমি বললাম।

—আহা—কী যেন নাম গীর্জাটার—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে— নর্থ গীর্জার কাছে।

—পিসেমশাইর নাম? আমি জানতে চাইলাম।

—ভিক্টর। আরোনাসের মা বলল।

—ঠিক আছে। আমি বললাম।

আমি আর বাড়ি ফিরলাম না। কোমরের ফেট্টি থেকে বেশ কয়েকটা রুপোর মুদ্রা পেলাম। এই সম্বল করে সান্তিয়াগোর দিকে চললাম।

সন্ধে হল। আমি চললাম। রাতে এক সরাইখানায় কিছু খেয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম। সারারাত হাঁটলাম। পরদিন দুপুরবেলা সান্তিয়াগো পৌঁছলাম। খুঁজে খুঁজে নর্থ গীর্জার সামনে এলাম। কাছাকাছি একটা দর্জির দোকান পেলাম। দর্জিকে জিজ্ঞেস করলাম—ভিক্টরের বাড়ি কোনটা? সে আঙ্গুল দিয়ে একটা বাড়ি দেখাল। সেই বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। দরজায় টোকা দিলাম। ভেতরে কোন সাড়া নেই। আবার আঙ্গুল ঠুকলাম। একটু জোরে। শব্দ করে দরজা খুলে গেল। এক মধ্যবয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে। বুঝলাম—ভিক্টর।

বলল—কাকে চাই?

—তানাকায় আপনাদের কোন আত্মীয় থাকে? আমি জানতে চাইলাম।

—হ্যাঁ। ভিক্টর বলল।

—তাহলে আরোনাস তো আপনার আত্মীয়। আমি বললাম।

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো। ভিক্টর বলল।

—পরে বলছি। আরোনাস আপনাদের কাছে বেড়াতে এসেছে। আমি বললাম।

—হ্যাঁ। ভিক্টর বলল।

—আরোনাসকে ডেকে দিন। আমি বললাম।

ভিক্টর একটা ঘরের দিকে যেতে যেতে ডাকল—আরোনাস—আরোনাস। কোন উত্তর নেই। একটা ঘরের দরজা দিয়ে মুখ গলিয়ে দেখে ফিরে দাঁড়াল। বলল— আরোনাসকে একটু আগেও আমি দেখে গেছি। ও কোথাও গেছে বোধহয়। ও নেই। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এতদূর এসে সব আশার শেষ? এটাই ভাবলাম। তবু জিজ্ঞেস করলাম—আরোনাস কোথায় যেতে পারে?

—যায় তো কয়েকটা জায়গায়। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলুন তো। ভিক্টর বলল।

আমি আস্তে আস্তে সব কথা বললাম। তারপর বললাম—বাবার সাংঘাতিক বিপদের কথা।

—আপনি কি নিশ্চিত যে আরোনাসই ঐ হীরের খণ্ডটা চুরি করেছে। ভিক্টর বলল।

—হ্যাঁ। নিশ্চিত। আপনারা জানেন না আরোনাস কত বড় চোর। আমি বললাম।

—না—না এ বিশ্বাস করা যায় না। ভিক্টর বলল।

—যাক্ গে—আপনার বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে আমি ভাবছি না। আমি আরোনাসকে পেতে চাই। কোথায় পাবো ওকে? আমি বললাম।

—তা কী করে বলি। ভিক্টর বলল।

—তবু দু-একটা জায়গা বলুন। আমি বললাম।

—গীর্জার পেছনে একটা শরীরচর্চার ঘর আছে। ওখানে ও যায়। ভিক্টর বলল।

—বেশ। আর একটা? আমি বললাম।

—মোড়ের মাথায় রুটির দোকান আছে। সেখানে ওর দু'একজন বন্ধু আছে। ভিক্টর বলল।

—ঠিক আছে। আমি বললাম।

আমি গীর্জার পেছনে এলাম। একটা ঘরও পেলাম। দেখি বেশ কয়েকজন যুবক ঘরে বাইরে দাঁড়িয়ে বসে আছে। আমি তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। আরোনাস নেই। তাদের কাছে আমি গেলাম। বললাম—আপনারা আরোনাসকে দেখেছেন?

—এসেছিল। চলে গেছে। একজন বলল। আমার কেমন সন্দেহ হল ওরা মিথ্যে কথা বলছে। তাহলে আরোনাস জানতে পেরেছে যে আমি এসেছি। চললাম রুটি তৈরির কারখানার দিকে।। পেলাম দোকানটা।

মালিক একটা উঁচু পাটাতনে বসে। কয়েকজন যুবকও বসে আছে। ওদের একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আরোনাস কি এখানে এসেছিল?

—না। ও আসে নি। একজন বলল। আর একজন বলল—কী ব্যাপার বলুন তো? ওকে খুঁজছেন কেন?

—ও আমার বন্ধু ছিল। আমি বললাম।

—বন্ধু ছিল বলছেন। এখন কি বন্ধু নয়? একজন বলল।

—না। ও চোর। বিশ্বাসঘাতক। বললাম। কথা না বাড়িয়ে চলে এলাম।

তখন বিকেল হয়ে গেছে। সারাদিন না খেয়ে আছি। এবার ঠিক করলাম—ওকে পিসির বাড়িতেই ধরবো।

একটা সরাইখানায় ঢুকলাম। রূপার মুদ্রা দিয়ে খেলাম। সরাইখানায় শুয়ে রইলাম। ঠিক করলাম—একটু রাতে পিসির বাড়ি যাবো। এখন বিশ্রাম করি। শুয়ে রইলাম। দুচোখ জ্বালা করছে। ঘুম আসবে না। চুপ করে শুয়ে রইলাম। ভাবলাম একটু বেশি রাতে যেতে হবে।

রাতের খাওয়া হল। একটু শুয়ে থেকে উঠলাম। আরোনাসের পিসির বাড়ির দিকে চললাম।

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে ওর পিসির বাড়ি এলাম। দরজায় আঙ্গুল ঠুকলাম। ভিতরে শব্দ হল। তারপর চুপ। এবার জোরে আঙ্গুল ঠুকলাম। সশব্দে দরজা খুলে গেল। কে আমার বুকে জোরে ধাক্কা দিল। আমি ছিটকে

মাটিতে পড়লাম। এ নিশ্চয়ই আরোনাস। জ্যোৎস্নার মৃদু আলোতে দেখলাম আরোনাস ছুটে পালাচ্ছে। আমিও ওর পেছনে ছুটলাম।

ছুটতে ছুটতে চারটে রাস্তার মোড়ে এলাম। এবার ডাকলাম—আরোনাস দাঁড়া। আরোনাস দাঁড়াল না। ছুটতে লাগল। এবার আমি প্রাণপণে দৌড়ে আরোনাসের ঠিক পেছনে এলাম। এক লাফ দিয়ে ওকে ধরে ফেললাম। ঘাড়ে পিঠে জোরে দুই ধাক্কায় আরোনাসকে রাস্তায় ফেলে দিলাম। ও চিৎ হয়ে গেল। আমি ওর গলা চেপে ধরতে গেলাম। বললাম হীরে ফেরত দে। ও এক হ্যাঁচকা টানে কোমর থেকে ছোরা বের করল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সাবধান হলাম।

তখনই দুই পাহারাদার ছুটে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এই লোকটি আমাকে খুন করতে চাইছে। একে ধরুন। একজন পাহারাদার আরোনাসের হাতে- ধরা ছোরা দিতে ইঙ্গিত করল। আরোনাস ছোরা দিল। এক পাহারাদার বলল— দুজনেই চলো।

তোমাদের কয়েদখানায় ঢোকানো হবে।

—আমি কোন দোষ করি নি। ও আরোনাস আমার হীরে চুরি করেছে। আমি হীরেটা ফেরত চাই। আমি বললাম।

—ঠিক আছে। কালকে সব শোনা যাবে। বিচারও হবে। এখন দুজনেই চল। পাহারাদার কোমর থেকে দড়ি বের করল।

তানাকা থামল। তারপর বলল—বুঝলাম আমি আরোনাসের কাছ থেকে হীরেটা উদ্ধার করতে পারব না। পাহারাদারদের কিছুতেই বোঝাতে পারবো না যে আমার হীরেটা ওই চুরি করেছে। ওটা আদায় করবার জন্যেই ওর পেছনে ছুটে এসেছি। ওকে ধরেছি। পাহারাদার কোন কথা বলল না।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। সবাই কয়েদঘরে এলাম। পাথরের টানা বাড়ি একটা। সেই বাড়ির একটা ঘরের সামনে আমরা এলাম। লোহার দরজা একজন প্রহরী খুলে দিল। ভেতরে ঢুকলাম আমরা দুজন।

মশালের আলোয় দেখলাম শক্ত পাথরে গাঁথা দেয়াল মেঝে। দেখলাম আরও তিন-চারজন বন্দী রয়েছে। শুকনো লম্বা ঘাসের বিছানা। বিছানায় শুয়ে পড়লাম। রাত জেগেছি মাথা টন্ টন্ করছে। তানাকা বলতে লাগল—

সকাল হল। দুজন প্রহরী সকালের খাবার নিয়ে ঢুকল। প্রত্যেকের হাতে বড় পাতা দিল। দু'টো করে পোড়া রুটি আর দু-তিনরকম আনাজপত্রের ঝোল। ভীষণ খিদে। অল্পক্ষণেই খেয়ে ফেলে পাতা এগিয়ে ধরলাম। বললাম—আরো দাও। প্রহরী বলল—আর একবার পাবে। ব্যাস্।

—তাই দাও। আমি বললাম—পেট ভরে খেলাম।

একটু বেলায় প্রহরীদের ওপরওয়ালা এল। মুখে গোঁফ দাড়ি। প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করল—তুই কে? আমি আমার কথা বললাম। তারপরে সবাইকে জিজ্ঞেস করল—বাড়ি কোথায়। প্রহরীরা সকলের অপরাধের কথা

বলল। ওপরওয়ালা গোঁফ চুলকে বলল—দেখছি চারজনের বাড়ি তামাকায়। ঐ চারটাকে হাতে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবি তানাকা সীমান্তে। ওদের তানাকার পাহারাদারদের হাতে তুলে দিবি। দেখিস পালিয়ে না যায়। আমি বললাম—আমার একটা আর্জি ছিল।

—বল্। ওপরওয়ালা ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল। আরোনাসকে দেখিয়ে বললাম—এই লোকটা আরোনাস আমাকে বোকা বানিয়ে একটা হীরের খণ্ড চুরি করেছে।

—বলো কি। তা হীরে পেলি কোথায়? বড় পাহারাদার জানতে চাইল।

—আমার বাবা হীরের গয়নাগাঁটি তৈরি করে। আমি বললাম।

—ও। তা এসব বিচার তোদের দেশের রাজা করবে। তোদের বিচারের ঝামেলা আমরা নেব না।

প্রহরীদের কর্তা চলে গেলেন।

—তারপর? শাঙ্কো বলল।

—ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পালালাম। এবার আমার একটাই চিন্তা বাবার কোন বিপদ হয়নি তো?

শাঙ্কো বলল—এখন কী করবে?

—অপেক্ষা করবো। আরোনাস মুক্তি পেলেই ওকে ধরে হীরের খণ্ড আদায় করে ছাড়বো।

শেষ বিকেলে শাঙ্কোরা প্যারাইসো পৌঁছল। হৈ হৈ করে জাহাজে উঠল। ফ্রান্সিস হাসিমুখে এগিয়ে এল। সবাইকে নির্বিঘ্নে ফিরতে দেখে ফ্রান্সিস খুশি। মারিয়াকে বলল—কোন সমস্যায় পড়োনি তো?

—না—না। মারিয়া হেসে বলল। ফ্রান্সিস তানাকাকে দেখে বলল—এই যুবক কে?

—আমি সব বলছি। তার আগে বিকেলের খাবারটা খেয়ে নিই তানাকা বলল।

—ঠিক—ঠিক। আমি একটু বেশি কৌতূহল দেখিয়ে ফেলেছি। তোমরা খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস বলল। তারপর রসুই ঘরে গিয়ে রাঁধুনি বন্ধুদের বলল—একটু তাড়াতাড়ি খাবার তৈরি কর। শাঙ্কোরা খুব ক্ষুধার্ত।

শাঙ্কোরা অনেকেই হ্যারির ঘরে এসে হ্যারিকে দেখে গেল। হ্যারি এখন একেবারে সুস্থ। বন্ধুদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করল। সকলেই খুশি হল—হ্যারির অসুখ সেরে গেছে।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডেকে পাঠাল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে এল। ফ্রান্সিস বলল—তানাকাকে ডেকে আনো। শাঙ্কো তানাকাকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস তানাকাকে বিছানায় বসতে বলল। মারিয়া বিছানার কোনায় বসল। ফ্রান্সিস বলল—তানাকা তোমার পরিচয় দিয়ে বল তুমি আমাদের কাছে আশ্রয় নিচ্ছো কেন। তানাকা শাঙ্কোকে যা বলেছিল তাই বিস্তারিত বলল।

ফ্রান্সিস বলল—তুমি কি নিশ্চিত যে আরোনাসই হীরের খণ্ডটা চুরি করেছে?

—হ্যাঁ। এতে কোন ভুল নেই।

—হীরের খণ্ডটা নেই এটা প্রথমে কে দ্যাখে। তুমি না তোমার বাবা? ফ্রান্সিস বলল।

—বাবা। রাণিমার গয়না তৈরি করবে বলে বাবা সিন্দুকটা খোলেন। তখনই দেখলেন হীরের খণ্ডটা নেই।

—হঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। পরে বলল—তানাকা আমি আর শাঙ্কো তোমাদের দেশে যাবো। অন্য কিছু দেশেও যাবো। একটু থেমে বলল—অন্য দেশেরও রাণিরা রাজকুমারীরা নিশ্চয়ই তোমার বাবার কাছে গয়না গড়াতে দেন।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ।

—তাই তোমাদের দেশে আগে যাবো। কিছু খোঁজখবর করবো। তারপর অন্য দেশে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস এতো মাস দুয়েকের ধাক্কা। শাঙ্কো বলল।

—না—না। অত সময় লাগবে না। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া বলল—অত খোঁজখবরের কী দরকার?

—দরকার আছে। যাক গে—শাঙ্কো কালকে দুটো ঘোড়া ভাড়া করতে হবে। আমরা কয়েকটা জায়গায় যাবো।

—আমি আপনাদের সঙ্গে তানাকা যেতে চাই। তানাকা বলল।

—ঠিক আছে। তোমার বাবার দোকানটা দেখা যাবে।

আমাদের বাড়িটাও দেখতে পারবেন। তানাকা বলল।

—না। তোমাদের দোকানটাই দেখতে হবে। ভালো কথা—তোমাদের দোকানে যে সিন্দুকটা আছে তোমার বাবা ঐ সিন্দুকেই তো সব হীরে জহরত রাখতেন।

—হ্যাঁ। বাড়িতে কোথাও রাখতেন না। তানাকা বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

সকালের খাবার খেয়েই তিনজনে জাহাজ থেকে নামতে তৈরি হল। মারিয়া একপাশে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিস মারিয়ার কাছে গেল। নিম্নস্বরে বলল—কোন চিন্তা করো না। আমরা দুজনে অক্ষত দেহে ফিরে আসবো। মারিয়া মুখ নিচু করল। কোন কথা বলল না।

জাহাজঘাটার কাছে একটা মাঠ মত। সেখানে দুটো ঘোড়া একটা চেস্টনাট গাছের সঙ্গে বাঁধা। একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। শাঙ্কো ঐ লোকটার কাছে এল। ফ্রান্সিসরাও এল। শাঙ্কো লোকটিকে একটা সোনার চাকতি দিল। আঙুল দিয়ে নিজেদের জাহাজটা দেখিয়ে বলল—দিন পাঁচ সাত পরে ঐ জাহাজে

আমাদের পাবে। ঘোড়া দুটো এই গাছের সঙ্গেই বেঁধে রাখবো। ফ্রান্সিসরা আর দেরি করল না। তিনজনে ঘোড়ায় চড়ল। আরোনাস শাঙ্কোর ঘোড়ায় উঠল। ওরা ঘোড়া ছোটাল।—তানাকা দেশের উদ্দেশ্যে।

রোদের তেজটা একটু কম। ফ্রান্সিসদের খুব একটা কষ্ট হল না।

দুপুরে একটা ছোট গ্রামে এল। ফ্রান্সিস ঘোড়া থামাল। শাঙ্কো বলল—থামলে কেন?

—দুপুর হল। কিছু তো খেতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখা যাক কোন বাড়িতে খাবার জোটে কিনা? এখানে তো আর সরাইখানা নেই। শাঙ্কো বলল।

সামনে একটা বাড়ি দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—আগে এই বাড়িটায় চলো।

তিনজনে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসই বন্ধ দরজায় টোকা দিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। একজন বয়স্ক মানুষ দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস বলল—দেখুন— আমরা প্যারাইসো বন্দর শহর থেকে আসছি। যাবো তানাকা। এত বেলায় খুবই ক্ষুধার্ত আমরা। যদি কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

—নিশ্চয়ই। আসুন—আসুন। বয়স্ক মানুষটি দরজার পাল্লাটা আরো খুলে বলল।

তিনজনে ভেতরে ঢুকল। পাটাতনের ওপর শুকনো ঘাসপাতার বিছানা। তিনজনেই বসল। ততক্ষণে দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়ে ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসদের দেখছে। ফ্রান্সিস একটা বাচ্চা মেয়েকে ডাকল। যা হোক একটু সাহস করে মেয়েটি ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস নাম জিজ্ঞেস করল। নাম বলল মেয়েটি। মেয়েটির ভাইও সাহস পেয়ে এগিয়ে এল।

তখনই বাড়ির কর্ত্রী এল। বলল—আপনারা এসেছেন আমাদের বাড়িতে এটা অত্যন্ত আনন্দের। কিন্তু আমাদের তো দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে কাজেই আপনাদের জন্যে রাঁধতে হবে। কিছু দেরি হবে।

—কোন সমস্যা নেই। আমরা ততক্ষণ অপেক্ষা করবো। ফ্রান্সিস বলল। কর্ত্রী ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলে গেল।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বলল—এতক্ষণ ঘোড়ায় চড়ে হাতপায়ে খিল ধরে গেছে। শাঙ্কোও শুয়ে পড়ল। তানাকা বসে রইল।

শেষ বিকেলে ফ্রান্সিসদের খেতে দেওয়া হল। তিনজনেই তখন ক্ষুধায় কাতর। পাতে খাবার পড়তেই খেয়ে নিল ফ্রান্সিসরা। খাওয়া শেষ। কর্ত্রী এসে বলল—আপনাদের পেট ভরেছে তো?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। বোধহয় একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছি। শাঙ্কো বলল।

আবার ফ্রান্সিসরা ঘোড়ায় উঠল। ঘোড়া চলল তানাকার দিকে।

বেশ রাতে তানাকা পৌঁছল। তানাকা বলল—এই রাতে আর কোথায় যাবেন? আমাদের বাড়িতেই চলুন। ফ্রান্সিস বলল—বেশ চলো।

তানাকাদের বাড়ির সামনে [illegible] থেকে নামল।

তানাকা এগিয়ে গেল। দরজায় [illegible] কয়েকবার ধাক্কা দেওয়া হল। একটি নারীকণ্ঠ শোনা গেল—[illegible]

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। [illegible]টির হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি। তানাকা বলল—মা—বাবা কেমন আছে?

—ভেতরে আয় বলছি। কিন্তু এঁরা কারা? তানাকার মা বলল।

—আমার বন্ধু। বিদেশি। রাতে খাবে থাকবে। তানাকা বলল।

—ও। আয়।

মোমবাতির আলোয় ছোট উঠোনমত পার হল। সামনে ঘর দেখল। তানাকা ঘরের দরজা খুলল। মার হাত থেকে মোমবাতিটা নিয়ে উঁচু পাটাতনে রাখল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো কাঠের পাটাতনে বসল। তানাকা বলল—আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা দেখি। ঘোড়াদুটোকেও তো খাওয়াতে হবে। তানাকা বেরিয়ে গেল।

এবার ফ্রান্সিস নিম্নস্বরে বলল—শাঙ্কো—একটা ব্যাপারে আমার সন্দেহ যাচ্ছে না।

—কোন ব্যাপারে? শাঙ্কো বলল।

—তানাকার বাবা মনে হয় সৎ ব্যবসায়ী নয়। তবে এটা এখনো আমার অনুমান। এখন কয়েকটা দেশে যেতে হবে। বার্বার মানে তানাকার বাবা আর কোন কোন রাজ্য থেকে হীরের গয়না গড়িয়ে দেবার নির্দেশ পেয়েছিলেন এটা জানলেই সিদ্ধান্তে আসা যাবে।

তানাকা ঘরে ঢুকল। বলল—মা রান্না বসিয়ে দিয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রান্না হয়ে যাবে।

ফ্রান্সিস বলল—তানাকা তোমাদের দোকান তো বাজার এলাকায়।

—হ্যাঁ।

—কালকে একবার দেখবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তো। একটু থেমে তানাকা বলল—এই তানাকা রাজ্যের রাজা বাবাকে বন্দী করে রেখেছে। রাণিমা বলেছেন—যেখান থেকে হোক হীরে জোগাড় করে গয়না গড়িয়ে দিতে হবে। তানাকা বলল।

—কিন্তু তোমার বাবাকে মুক্তি না দিলে উনি কী করে গয়না গড়বেন? ফ্রান্সিস বলল।

—সেসব কথা বলতেই কাল রাজসভায় যাবো। তানাকা বলল।

—বেশ। আমরাও যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনারা কেন যাবেন? তানাকা জানতে চাইল।

—সেনাপতির সঙ্গে কিছু কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—ও। তানাকা মুখে শব্দ করল।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো রাজসভায় গেল।

—বাবার মুক্তির ব্যাপারে কিছু বলবেন না? তানাকা বলল।

—না। আগেই নয়। পরে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো রাজসভায় এল। বেশ ভিড়। রাণী একটা কাঠের সিংহাসনে বসে আছেন। বিচার চলছে। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস সেনাপতিকে আগেই দেখেছে। তক্কে তক্কে রইল কখন সেনাপতি রাজসভার বাইরে আসে।

কিছু পরেই হঠাৎ সেনাপতি রাজসভার বাইরে এলেন। সৈন্যাবাসের দিকে চললেন। ফ্রান্সিস প্রায় ছুটে সেনাপতির কাছে এল। সেনাপতি দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন—কী ব্যাপার।

—মাননীয় সেনাপতি—আপনাকে একটা কথা বলার ছিল।

—তোমাদের দেখে তো মনে হচ্ছে—বিদেশি। সেনাপতি বলল।

—হ্যাঁ। আমরা ভাইকিং। একটা কথা জানতে এলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। সেনাপতি বলল।

—বার্বার যিনি রাণীর গয়নাগাঁটি গড়েন তিনি রাণীর পাঠানো হীরে হারিয়ে ফেলেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কঠোর শাস্তি হবে বার্বারের। সেনাপতি বলল।

—আচ্ছা বার্বার কি এর আগেও হীরের খণ্ড হারিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আবার হারানো—রাণীমা খুব রেগে গেছেন। সেনাপতি বলল।

—ঠিক আছে। ফ্রান্সিস বলল।

তখনই পেছন থেকে তানাকা ছুটে এল। সেনাপতিকে বলল—মাননীয় সেনাপতি। বার্বার আমার বাবা। তাকে কি মুক্তি দেওয়া হবে না?

—এখন না। কিছু শাস্তি ভোগ করুক আগে। সেনাপতি বললেন।

—বাবা হীরেটা হারিয়ে ফেলেছেন। তানাকা বলল।

—ওসব বলে পার পাওয়া যাবে না। রাণীমা রেগে আগুন হয়ে আছেন। বার্বার যে হীরের খণ্ডটা কিভাবে হারাল—এটাই আমরা বুঝতে পারছি না।

সেনাপতি আর কিছু বললেন না। সৈন্যাবাসের দিকে হাঁটতে লাগলেন। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে পড়ল। তিনজনেই ফিরে আসছে তখন ফ্রান্সিস বলল—তানাকা তোমাকে আসতে মানা করেছিলাম।

—বাবার জন্যে আমার চিন্তা হয় না? আমি চুপচাপ বসে থাকতে পারি? তানাকা বলল।

—তোমার বাবার খবরও আমি নিতাম। ফ্রান্সিস বলল—যাক্ গে—তুমি আমার ঘোড়া দুটোকে জল আর খাবার দিয়েছো?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—দিয়েছি। আপনাদের ঘোড়া দুটি এখন তরতাজা। তানাকা বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল।

রাজবাড়ির কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল—চলো তোমাদের দোকানটা দেখবো।

—চলুন।

বাজার এলাকায় এল ওরা। দোকানপাট পার হয়ে চলল। একটা বন্ধ দোকানের সামনে এসে তানাকা বলল—এটাই আমাদের দোকান। দোকানের দরজায় তালা লাগানো। ফ্রান্সিস বলল—তানাকা দোকানের চাবিটা কই?

—বাবার কাছে।

—তাহলে দোকান খুলবে কী করে?

—দোকানের পেছনে একটা ছোট্ট দরজা আছে। ওটার চাবি আমার কাছে আছে। চলুন পেছনের দরজা দিয়েই ঢুকবো।

তিনজনে দোকানের পেছনে এল। ফ্রান্সিস দেখল একটা ছোট্ট দরজা। দরজায় তালা ঝুলছে।

—তানাকা—ফ্রান্সিস বলল—এই দরজাটা বোধহয় বেশি ব্যবহার করা হয় না।

—হ্যাঁ। এই দরজা দিয়ে যাওয়া আসা খুব কমই হয়। তানাকা বলল।

—দরজাটা খোলো। ফ্রান্সিস বলল।

তানাকা কোমর থেকে চাবির গোছা বের করল। খুঁজে খুঁজে পেছনের দরজাটার চাবিটা বের করল। তালায় চাবিটা ঢোকালো। মোচড় দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

তিনজনে ঢুকল। ঘরটায় দুপুরের আলো আঁধারি। সামনের ঘরে এল। ফ্রান্সিস সিন্দুকটা দেখল। বেশ বড়। ভারি লোহায় তৈরি।

ফ্রান্সিস সিন্দুকটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখল। বলল—

—এই সিন্দুকের চাবিটা তো তোমার কাছে নেই।

—না। তানাকা মাথা এপাশ-ওপাশ করল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস ভালো করে চারদিক তাকিয়ে দেখল।

—একটা কথা। তোমার এক বন্ধু আছে। সে নাকি তোমাকে বোকা বানিয়ে সিন্দুক থেকে হীরে চুরি করেছে। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আরোনাস যে একটা পাকা চোর আমি সেটা বুঝতে পারিনি। তানাকা বলল।

—তুমি ওর খোঁজ পেয়েছো? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। পেয়েছি। সান্তিয়াগোর কয়েদঘরে আমরা দুজনেই ছিলাম। কিন্তু কী করবো? হাতে তো কোন অস্ত্র নেই। তাই ওকে খুন করতে পারি নি। তানাকা বলল।

—বলো কি। খুন করতে চেয়েছিলে? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু ভেবে দেখলাম ওকে মেরে ফেললে হীরেটার কোন খোঁজই পাওয়া যাবে না। এখানকার কয়েদঘর থেকে যেদিন ছাড়া পাবে সেইদিনই

ওকে চেপে ধরবো হীরের খণ্ড কোথায় রেখেছিস্ বল্। আদায় করে ছাড়বো। তানাকা বলল।

—বুঝলাম। সে তো ওকে দেখতে পারলে। তার আগে আরোনাসের বিরুদ্ধে তুমি রাজার কাছে বিচার চাও। দ্যাখো কী হয়। আরোনাস তো কয়েদঘরেই আছে। প্রহরীদের ওকে খুঁজে বেড়াতে হবে না। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি। তানাকা মাথা নাড়ল।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। পেছনের দরজা দিয়ে তিনজনে বেরিয়ে এল। তানাকার বাড়িতে এল। ফ্রান্সিস তানাকাকে বলল—ঘোড়া দুটোকে একটু দানাপানির ব্যবস্থা করো।

—ভাববেন না। সে সব দেখা হবে। তানাকা বলল।

রাতে খেয়েদেয়ে ফ্রান্সিস, শাঙ্কো শুয়ে পড়ল।

শাঙ্কো বলল—তুমি ঠিক কী করতে চাইছো?

ফ্রান্সিস বলল—বার্বার কোন কোন রাজবাড়িতে হীরের গয়না করার নির্দেশ পেয়েছিল সেই রাজবাড়িতে যাবো। রাণীমাদের কাছে হারিয়ে গেছে, চুরি হয়ে গেছে বলে কান্নাকাটি করে পার পেয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বার্বার মানে তানাকার বাবা হীরের খণ্ড চুরি করেছে। এই ব্যাপারটা যাচাই করে দেখবো।

—এতে বার্বার তো আরো বিপদে পড়বে। শাঙ্কো বলল।

—উপায় কি। চোরের চোরামি তো মেনে নেওয়া যায় না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। এখন তুমি সবদিক দেখে শুনে এগোও। শাঙ্কো বলল।

পরদিন। সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ঘোড়া ছোটাল সান্তিয়াগোর দিকে। পথে এক চাষীর বাড়িতে আশ্রয় নিল। খেল। তারপর আবার ঘোড়া ছোটাল।

শেষ বিকেলে সান্তিয়াগোতে পৌঁছল। ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে ফ্রান্সিসরা দেখল বেশ বড় নগর। রাস্তাঘাটে বেশ লোকজনের ভিড়। যেতে যেতে একটা সরাইখানা দেখল। ঘোড়া থামাল। দুজনে ঘোড়া থেকে নামল। সরাইখানার দিকে চলল। সরাইওয়ালা হাসিমুখে বারবার বলতে লাগল—আসুন—আসুন।

—ঘোড়ার খাবার জল দানা পাওয়া যাবে তো? শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। কত লোক ঘোড়ায় চড়ে আসে। সব ব্যবস্থা আছে আমার। সরাইওয়ালা কাকে ডাকল। দেখা গেল একটি কিশোর এগিয়ে এল। সরাইওয়ালা বলল—ঘোড়া দুটো নিয়ে যা। দানাপানি খাওয়া। কিশোরটি বেশ অভ্যস্ত হাতে ঘোড়া দুটোকে পেছনে নিয়ে গেল।

ফ্রান্সিসরা সরাইখানায় ঢুকল। খিদে, ক্লান্তি।

পাটাতন পাতা। তার ওপর শুকনো ঘাসপাতার বিছানা। দুজনেই শুয়ে পড়ল। দুজনেই চুপ করে শুয়ে রইল।

কিছু পরে সেই তরুণ ছেলেটি দুটো কাঠের থালায় বিকেলের খাবার নিয়ে ঢুকল। ফ্রান্সিস ও শাঙ্কোর হাতে থালা দিয়ে চলে গেল।

ফ্রান্সিস খেতে খেতে বলল—আজকের দিনটা কাজে লাগাতে পারলাম না। কাল সকালে কাজে নামতে হবে। ওরা শুয়ে এসব কথাবার্তা বলছে তখন চার-পাঁচজন লোক চেঁচিয়ে কথা বলতে বলতে সরাইখানায় ঢুকল। প্রত্যেকের কোমরেই তরোয়াল গোঁজা। ওরা ফ্রান্সিসদের শুয়ে থাকা দেখল। একজন ঝুঁকে পড়ে ফ্রান্সিসদের দেখল। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—আরে—দুটোই বিদেশী ভূত। সবাই হৈ হৈ করে উঠল। ফ্রান্সিস বা শাঙ্কো কোন কথা বলল না। একজন এগিয়ে এসে বলল—তোরা এখানে শুয়ে আছিস কেন? এটা আমাদের জায়গা। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—সরে এস। দুজনেই বেশ সরে গেল। ওরা কেউ বসল, কেউ শুয়ে পড়ল। একজন ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোদের দেশ কোথায় রে?

—আমরা ভাইকিং। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে তোরা তো জলদস্যু।

ফ্রান্সিস লোকটার কথা শেষ হওয়ামাত্র তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। তরোয়াল কোষমুক্ত করল। দাঁতচাপা স্বরে বলল—ঐ কথাটা ফিরিয়ে নাও।

শাঙ্কোও উঠে দাঁড়াল। তরোয়াল খুলল। যে লোকটা জলদস্যু বলেছিল সে ফ্রান্সিসদের এই রুদ্ররূপ দেখে বেশ ভয়ই পেল। ওর বন্ধুরাও দুজন তরোয়াল খুলল। ফ্রান্সিস বলল—কথাটা ফিরিয়ে নাও। বলো যে আমি ভুল বলেছি। বলো। ঐ লোকটা চুপ করে রইল। ওর কথার জন্যে এরকম একটা কিছু হবে ও ভাবতে পারে নি। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—একজন একজন করে আয়। আজ তোদের সবাইকে নিকেশ করবো। একজন তরোয়াল তুলে সামনে এল। ফ্রান্সিস ওর তরোয়ালে নিজের তরোয়ালটা এত জোরে ঘা মারল যে লোকটার হাত থেকে তরোয়ালটা ছিটকে গেল। লোকটা হাঁ মুখে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস অনায়াসে লোকটার কাঁধে তরোয়ালের কোপ বসাতে পারতো কিন্তু ফ্রান্সিস তা করল না। অন্যজন তরোয়াল নিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে এল। শাঙ্কো তার মোকাবিলা করল। শাঙ্কো দ্রুতগতিতে ঐ লোকটার হাতের কব্জিতে তরোয়াল দিয়ে ঘা মারল। ওর হাত থেকে তরোয়াল খসে পড়ে গেল। শাঙ্কো তরোয়াল তুলতে গিয়েও তুলল না।

সরাইখানার মালিক ছুটে এল। দুহাত তুলে বলল—আপনারা এভাবে মারামারি করবেন না। আমার দোকানের বদনাম হবে।

অন্য লোকগুলো চুপ করে বসে রইল। ফ্রান্সিস তখনও তরোয়াল কোষবদ্ধ করেনি। দাঁতচাপা স্বরে বলল—যে লোকটা আমাদের বদনাম দিয়েছো সে এগিয়ে এসো। তরোয়াল আনো। লোকটা বুঝল এ বড় কঠিন ঠাঁই। এঁটে ওঠা

যাবে না। লোকটা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—ঠিক আছে—ঠিক আছে। আমি কথাটা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

—পথে এসো। কথাটা বলে ফ্রান্সিস তরোয়াল কোষবদ্ধ করল। সরাইওয়ালা তখনও বলে চলেছে—এখানে খুন-টুন হলে আমার দোকানের বদনাম হবে। আপনারা শান্ত হোন। ওদের মধ্যে একজন বলল—ঠিক আছে—আর কিছু হবে না। সরাইওয়ালা মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল। লোকগুলোও শান্ত হল। থেকে থেকে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল।

পরদিন সকালের খাবার খেয়ে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো রাজার দরবারে এল। রাজবাড়িটা প্রাসাদের মত। ওরা দেখল দরজায় দাড়ি গোঁফওয়ালা একজন প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে পেতলের বর্শা। বর্শার মুখটা লোহার।

ফ্রান্সিসরা দরজা পার হতে যাচ্ছে তখনই একজন প্রহরী এগিয়ে এল। বলল— তোমাদের দেখে তো বিদেশি বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ। আমরা বিদেশি। আমরা ভাইকিং। শাঙ্কো বলল।

—এখানে এসেছো কেন? প্রহরী জিজ্ঞেস করল।

—মাননীয় সেনাপতির সঙ্গে দেখা করবো। শাঙ্কো বলল।

—কেন? প্রহরী বলল।

—কথা আছে। শাঙ্কো বলল।

—কী কথা? প্রহরী জানতে চাইল।

—সেটা সেনাপতিকেই বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ। প্রহরীটি ভেতরের দিকে মুখ তুলে বলল—রবিন—এখানে শোন। অন্য একজন প্রহরী এগিয়ে এল। বলল—কী হয়েছে?

—এই দুজন বিদেশি সেনাপতির সঙ্গে দেখা করবে। তুই একটু নিয়ে যা। রবিন ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—এসো।

প্রহরীটি ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোকে রাজসভার কাছে নিয়ে এল। বেশ কিছু বিচারপ্রার্থী জড়ো হয়েছে। রাজামশাই সিংহাসনে বসে আছেন। বিচার চলছে। রাজার একপাশে মন্ত্রী অমাত্যরা বসে আছেন। অন্য পাশে সেনাপতি আর দু-একজন উচ্চপদাধিকারী। রবিন আঙ্গুল দেখিয়ে সেনাপতিকে দেখাল। বলল—উনিই সেনাপতি। সভার কাজ হয়ে গেলে কথা বলবেন। তবে একটা কথা বলে রাখি সেনাপতি কিন্তু ভীষণ রগচটা। চটে গিয়ে এর আগে বেশ কয়েকজনকে চড় মেরেছেন।

রবিন চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা সভার কাজকর্ম দেখতে লাগল। কতক্ষণে সভা শেষ হবে তার চিন্তা।

সভার কাজ চলল।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে সভা শেষ হল।

রাজা অন্দরমহলে চলে গেলেন। লোকজন বেরিয়ে আসতে লাগল। মন্ত্রী-অমাত্যরা বেরিয়ে আসতে লাগলেন। সেনাপতিও আসছিল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। মাথা একটু নুইয়ে সেনাপতির সামনে দাঁড়াল। সেনাপতি ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোকে দেখে বললেন—দেখে তো মনে হচ্ছে তোমরা এই রাজ্যের মানুষ না।

—ঠিকই ধরেছেন। আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। শুনেছি তোমরা খুব সাহসী যোদ্ধা। জাহাজ চালনায় দক্ষ। সেনাপতি বলল।

—আপনি ঠিকই শুনেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—আমার কাছে কেন? সেনাপতি জানতে চাইলেন।

—একটা খবর জানতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কী খবর?

—এখানকার রাণিমা কি কখনও তানাকার একজন বিখ্যাত হীরের মণিকার বার্বারের কাছ থেকে হীরের গয়না করিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—আমি কি অন্দরমহলের খবর রাখি নাকি। সেনাপতি বললেন।

—না—মানে, যদি জানেন—ফ্রান্সিস বলল।

—আমি এসবের কিছুই জানি না। সেনাপতি মাথা এপাশ-ওপাশ করে বলল।

—মানে বলছিলাম—ফ্রান্সিস বলতে গেল।

—এবার গালে চড় মারবো। বেরো, এখান থেকে। সেনাপতি ক্ষেপে গিয়ে বলল। তারপর চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

শাঙ্কো বলল—এই খবরটা অন্য কার কাছ থেকে পাবো?

—সেটাই ভাবছি। দাঁড়াও—একবার প্রহরী রবিনকে বলে দেখি। ফ্রান্সিস বলল।

প্রধান প্রবেশপথের সামনে রবিনকে পাওয়া গেল।

ফ্রান্সিস বলল—ভাই রবিন তোমার কাছ থেকে একটা খবর জানতে চাই।

—কী খবর? রবিন বলল।

—অন্দরমহল থেকে একটা খবর এনে দিতে পারো? ফ্রান্সিস বলল।

—চেষ্টা করে দেখতে পারি। রবিন বলল।

—ব্যাপারটা হল তানাকায় একজন নামকরা জহুরী আছে। নাম বার্বার। এখানকার রাণিমা তাঁকে কোন হীরের গয়না গড়তে দিয়েছিলেন কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

—যদি খবরটা আনি তাহলে আমাকে কী দেবে? রবিন হেসে বলল।

—একটা সোনার চাকতি। ফ্রান্সিস বলল।

—দেখি চেষ্টা করে। রবিন বলল।
—আর একটা খুব দরকারি খবর চাই এইসঙ্গে। ফ্রান্সিস বলল।
—কী খবর? রবিন বলল।
—বার্বার রাণিমার দেওয়া হীরের খণ্ড হারিয়ে ফেলেছিল কিনা। ফ্রান্সিস বলল।
—এটা আবার কী খবর! রবিন বলল।
—খবরটা আমাদের খুব প্রয়োজন। ফ্রান্সিস বলল।
—বেশ। রবিন বলল।
রবিন সভাঘর ছাড়িয়ে অন্দরমহলের দিকে চলে গেল।
কিছুক্ষণ পরে রবিন ফিরে এল। সঙ্গে আর একজন প্রহরী। রবিন বলল—ও অন্দরমহলে রাণিমার ফাইফরমাস খাটে। ও ব্যাপারটা জানে বলল। সেই প্রহরীকে ফ্রান্সিস বলল—ভাই একটা খুব দরকারী কথা জানতে চাইছি।
—কী দরকারী কথা? প্রহরী বলল।
—তানাকা দেশে বার্বার নামে একজন জহুরী আছে। হীরের গয়না গড়তে খুব ওস্তাদ। তাঁকে দেখেছো? ফ্রান্সিস বলল।
—হ্যাঁ। তানাকা থেকে আসতো। আমি রাণিমার কাছে নিয়ে গেছি। প্রহরী বলল।
—হ্যাঁ—হ্যাঁ। এখন জানতে চাইছি বার্বারকে গয়না গড়ার জন্যে যে হীরের খণ্ডটা দেওয়া হয়েছিল সেটা কি বার্বারের কাছে হারিয়েছিল অথবা চুরি হয়েছিল? ফ্রান্সিস বলল।
—হ্যাঁ—হ্যাঁ—এরকমই ব্যাপারটা হয়েছিল। বার্বার কেঁদেকেটে বলেছিল হীরের খণ্ডটা হারিয়ে গেছে। যা হোক—রাণিমা কিছু বলেন নি। নতুন হীরের খণ্ড দিয়েছিলেন। প্রহরী বলল।
—এটাই জানতে চাইছিলাম। ভাই অনেক ধন্যবাদ। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কোর দিকে তাকাল। শাঙ্কো কোমর থেকে একটা সোনার চাকতি বের করল।
ফ্রান্সিস বলল—দুজনকে দুটো দাও। শাঙ্কো আর একটা সোনার চাকতি বের করল। প্রহরী দুজনকে দিল। দুই প্রহরীই খুশি।
রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। ঘোড়ায় চড়ে উঠল। নেমে সরাইখানায় এল। দেখল সেই গুণ্ডার দল চলে গেছে।
রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা শুতে এল।
ফ্রান্সিস বলল—ধারে কাছে কোন কোন রাজ্য আছে তা জানতে হবে। তানাকার কাছে দুটো নাম পেয়েছিলাম। সে তো দেখাও হল—জানাও হল। এবার আরো কয়েকটা দেশের নাম জানতে হবে। ভালো কথা। সরাইওয়ালাই বলতে পারবে। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। সরাইওয়ালার কাছে এল। সরাইওয়ালা আলো জ্বেলে মাথা নিচু করে মুদ্রা গুনছিল।

ফ্রান্সিস বলল—একটা কথা বলছিলাম।

—বলুন। সরাইওয়ালা মুখ তুলে হেসে বলল।

—ধারে কাছে কয়েকটা দেশের নাম কী?

—ঐ তো কাকোয়াম্বো লা সেরিনা। সরাইওয়ালা বলল। ফ্রান্সিস ওকে জিজ্ঞেস করে রাজ্য দুটিতে যেতে হলে কোন দিকে যেতে হবে এসব ভালো করে জেনে নিল।

পরের দিন সকালের খাবার খেয়ে দুজনে ঘোড়ায় উঠল। দিক ঠিক করে ঘোড়া ছোটাল।

দুপুর হল। গরম হাওয়া ছুটেছে।

জলতেষ্টা পেয়েছে, খিদেও পেয়েছে। এবার খাবার জোগাড় করতে হয়। একটা গ্রামমত দেখল। কয়েকটা পাথরের বাড়ি। ঘোড়া থামালো।

ফ্রান্সিস বলল—চলো দেখা যাক।

একটা বাড়ির বাইরের ঘরে গাছের ডাল দিয়ে তৈরি দরজা খোলা। শাঙ্কো খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল একজন বৃদ্ধ একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে ঘাসপাতায় তৈরি বিছানায় বসে আছে। শাঙ্কোকে দেখে বৃদ্ধটি বলল—আপনি কে? কি চান? শাঙ্কো বলল—আমরা বিদেশি। লা মেরিনা দেশে যাবো। আমরা খুবই ক্ষুধার্ত। যদি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেন তাহলে আমাদের খুবই উপকার হয়।

—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। বৃদ্ধ ছেলেটিকে কোলে নিয়ে বলল—আপনারা বসুন। বাড়ির মেয়েদের বলছি। বৃদ্ধ একটু গলা চড়িয়ে বোধহয় কাউকে ডাকলেন। একটি বৌ ঢুকল। বাচ্চাটি প্রায় লাফিয়ে মেয়েটির কোলে গেল। বোঝাই যাচ্ছে বৌটি বৃদ্ধের ছেলের বৌ। বৃদ্ধটি এবার বলল—এঁরা দুজন লা মেরিনা যাবেন। এখানে তো আর সরাইখানা নেই। কাজেই ক্ষুধার্ত দুজন আমাদের এখানে খেতে চাইছেন। বৌটি ফ্রান্সিস আর শাঙ্কোর দিকে তাকাল। বলল—আমাদের তো খাওয়া হয়ে গেছে। আপনাদের জন্যে রেঁধে দিচ্ছি। আপনারা বসুন। আমরা তাড়াতাড়ি রেঁধে দিচ্ছি। ফ্রান্সিস বাচ্চাটার দিকে দুহাত বাড়াল। আশ্চর্য। বাচ্চাটি ফ্রান্সিসের হাত ধরে ঝুঁকে পড়ল। ফ্রান্সিস কোলে নিল। ওর মা চলে গেল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—শাঙ্কো কে ভালো মানুষ আর কে নয় এটা শিশুরা ঠিক বুঝতে পারে। তাই সব লোকের আদরেই ওরা সাড়া দেয় না। ওরা যাচাই করে নেয়।

ফ্রান্সিস বাচ্চাটিকে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে ধরল। বৃদ্ধ বাচ্চাটিকে কোলে নিল।

ফ্রান্সিসরা মেঝের পাটাতনে বসল। বৃদ্ধও নাতি কোলে ফ্রান্সিসদের পাশে বসলেন। বৃদ্ধটি ফ্রান্সিস ও শাঙ্কোর পরিচয়-টরিচয় জানতে চাইলেন। কথাবার্তা চলল। ফ্রান্সিস আধশোয়া হল। খুব ক্লান্ত লাগছে নিজেকে।

এমন সময় একটি যুবক ঘরে ঢুকল। জামাকাপড়ে ধুলোবালি লেগে। ফ্রান্সিসদের দেখে বলল—আপনারা কে? বৃদ্ধ বলে উঠলেন—এরা বিদেশি। লা মেরিনা যাবে। এখন এখানে আর কোথায় খাবার পাবে। তাই আমাদের অতিথি হয়েছে।

যুবকটি হাসল। বলল—নিশ্চয়ই। আপনাদের খাবার তৈরি হচ্ছে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। যুবকটি বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস—তুমি কী প্রমাণ করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছো?

—বার্বার যে অসৎ এটা আমি প্রমাণ করতে চাই।

—কী লাভ? তাছাড়া এখনো প্রমাণ করতে পারো নি।

—আর দুটো দেশ—লা মেরিনা আর কাকোয়াম্বোয় খোঁজ করা হয়নি। দেখবে ঐ দেশ দুটিতেও আমরা একই তথ্য পাবো—দু জায়গাতেই বার্বার হীরে চুরির অথবা হারিয়ে যাওয়ার গল্প ফেঁদেছে। তারপর নতুন করে নতুন হীরে দিয়ে গয়না গড়েছে। প্রথম দেওয়া হীরের খণ্ডটি নিজে রেখে দিয়েছে।

—কোথায় রেখেছে? শাঙ্কো বলল।

—বাড়িতে অথবা দোকানে। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি এতসব করতে যাবে কেন? শাঙ্কো বলল।

—আগেই বলেছি বার্বার যে অসৎ এটা প্রমাণ করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—এরা এ দেশের মানুষ। এরা যেমন বুঝবে করবে। আমরা তার সঙ্গে জড়াবো কেন। ওদিকে রাজকুমারী, বন্ধুরা নিশ্চয়ই চিন্তায় পড়েছে। শাঙ্কো বলল। একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো যে জীবন আমরা বেছে নিয়েছি সেখানে দুশ্চিন্তার কোনো স্থান নেই। যে কোন সময় আমাদের মৃত্যু হতে পারে এটা প্রথমেই ধরে নিতে হবে। জীবনকে আমরা এরকমই বলে মেনে নিয়েছি। কাজেই এখানে দুশ্চিন্তার কোন স্থান নেই।

—তোমার মত মনের জোর তো সকলের নেই। তাই তারা দুশ্চিন্তা ভোগ করে। শাঙ্কো বলল।

—যাক্—আমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দুটো দেশ বাকি। তারপরেই প্যারাইসোতে আমাদের জাহাজে ফিরে যাবো।

—ঠিক আছে। তুমি যা করতে চাও করো। শাঙ্কো বলল।

যুবকটি ঘরের দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বলল—আপনাদের খাবার তৈরি। আপনারা আসুন।

ফ্রান্সিসরা বিছানা থেকে উঠল। বাড়ির ভেতরে ঢুকল। ভেতরে একটা ছোট উঠোন মত। চারপাশে ঘর।

যুবকটি উঠোনে দুটো লম্বা বড় পাতা পেতে দিল। ফ্রান্সিসরা পাতাগুলোর সামনে বসল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো খেতে বসল। কাঠের গ্লাশে জল ভরা ছিল। শাঙ্কো

গ্লাশের সবটা জল ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নিল। এইবার বুঝতে পারল কী জলতেষ্টা পেয়েছিল।

যুবকটির স্ত্রী খাবার নিয়ে এল। গোল রুটি আর তরকারি মত দিল। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। সুস্বাদু লাগল। ক্ষুধার্ত ফ্রান্সিসরা অল্পক্ষণের মধ্যেই খেয়ে নিল। বৌটি আরও রুটি তরকারি দিল। পেট কিছুটা ভরেছে। এবার ফ্রান্সিসরা আস্তে আস্তে খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ। হাত মুখ ধুয়ে মুছে বাইরের ঘরে ওরা এল। বিছানায় বসল। যুবকটি এল। হেসে বলল—পেট ভরেছে তো?

শাঙ্কো হেসে বলল—পেট পুরে খেয়েছি। ফ্রান্সিস বলল—অনেক উপকার করলেন। আর একটা অনুরোধ—ঘোড়া দুটোর জন্যে যদি দানাপানির ব্যবস্থা করে দেন। ওরাও তো ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত।

—কিছছু ভাববেন না। আমার এক বন্ধু আছে। ঘোড়া কেনাবেচা করে। ওর বড় আস্তাবল আছে। ওকে ডেকে আনছি। আপনাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল। যুবকটি বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে যুবকটি ওরই সমবয়সী একজন যুবককে নিয়ে এল। বন্ধুটি অভ্যস্ত হাতে ঘোড়া দুটোর লাগাম ধরে নিয়ে চলল।

ফ্রান্সিস ভাবল—একটা বড় সমস্যার সমাধান হল। ঘোড়া দুটো দানাপানি পাবে। দম নিয়ে ছুটতে পারবে।

বিকেল হল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বৃদ্ধ ও যুবকটিকে বারবার ধন্যবাদ দিল।

এবার ঘোড়ায় চড়ল। ফ্রান্সিস যুবকটিকে ডাকল। যুবকটি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—কাকোয়াম্বো দেশটিতে কী করে যাবো?

—এই যে রাস্তাটা, এটা সোজা চলে গেছে কাকোয়াম্বো। এখন তো শেষ বিকেল। কাকোয়াম্বো পৌঁছতে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে যাবে। আজকের রাতটা আমাদের বাড়িতে থেকে কাল সকালে গেলে পারতেন।

—উপায় নেই ভাই। আমাদের জাহাজ প্যারাইসো বন্দরে নোঙর করে আছে। সেই জাহাজে আমার বন্ধুরা রয়েছে। তাই এখানকার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে জাহাজে ফিরে যাবো।

—আপনারা কায়াকোম্বো যাচ্ছেন তো?

—হ্যাঁ, কেন বলোতো? ফ্রান্সিস বলল।

—কায়াকোম্বোর রাজা আরকানিয়া খুব ধূর্ত আর নৃশংস। প্রজাদের সামান্য কারণে ফাঁসি দিয়ে থাকেন এবং ঐ ফাঁসি নিজে দেন। এজন্যে কোন ফাঁসুড়ে নেই। আবার তরোয়াল দিয়ে হত্যাও করেন। কাজেই খুব সাবধানে চলবেন। যুবকটি বলল।

—খুব উপকার করলে ভাই। আমরা সাবধানে চলবো। ফ্রান্সিস বলল।

দুজনে ঘোড়া চালাল।

দুজনের ভাগ্য ভাল যে এক জায়গায় ছোট শহরে সরাইখানা পেয়েছিল। তাই দুপুরের খাওয়াটা সন্ধেবেলা সারতে পেরেছে।

কাকোয়াম্বো পৌঁছতে বেশ রাতই হল। বেশ বড় শহর। তবে এই রাতে রাস্তাঘাটে খুব একটা ভিড় নেই। সদর রাস্তা দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে চলল। দুজনেই একটা সরাইখানা খুঁজছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা সরাইখানা খুঁজে পেল। সরাইখানার সামনে ঘোড়া থামাল। ঘোড়া থেকে নামল। শাঙ্কো ঘোড়া দুটোর লাগাম ধরে রইল।

ফ্রান্সিস সরাইওয়ালার কাছে গেল। সরাইওয়ালা নতুন খদ্দের পেয়ে খুব খুশি। এই শহরে লোকজন আসা খুব কমে গেছে। দুজন তো পাওয়া গেল। কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল—আমরা দুজন থাকবো।

—বেশ তো, বেশ তো। সরাইওয়ালা বলল।

—কোন ঘরে থাকবো? শাঙ্কো বলল।

—একটাই তো ঘর। কোন অসুবিধে হবে না। সরাইওয়ালা বলল।

—রাতের খাওয়ার ব্যবস্থাটা একটু জলদি করুন। শাঙ্কো বলল।

—নিশ্চয়ই। আমি বলে দিচ্ছি। সরাইওয়ালা পেছন দিকে চলে গেল।

ফ্রান্সিস বলল—চল। পেছনের ঘরে। দুজনে পেছনের ঘরে এল। সরাইখানার ব্যবস্থা যা হয়। শুকনো ঘাসপাতার ঢালাও বিছানা। কয়েকটা বালিশ। ফ্রান্সিস ঢালাও বিছানায় শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়াতে হয়।

ফ্রান্সিস বলল—সরাইওয়ালাকে বল। ওর এই সরাইখানায় তো অশ্বারোহী মানুষও আসে। তাকে তো সেই ব্যবস্থা রাখতে হয়। নিজেকে বড়ই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। একটু বিশ্রাম নেবো।

—ঠিক আছে। আমিই দেখছি। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো বাইরের ঘরে এল। সরাইওয়ালার সামনে এসে দাঁড়াল। সরাইওয়ালা মাথা নিচু করে হিসেবটিসেব দেখছিল। এবার মুখ তুলল। শাঙ্কোকে দেখে বলল— কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

—তা হচ্ছে। শাঙ্কো বলল।

—ম্‌-মানে? সরাইওয়ালা থমকে গেল।

—আমরা দুজন ঘোড়ায় চড়ে এসেছি। ঘোড়াদুটো এখনও দানাপানি পায় নি।

—ও—এই কথা। আসুন। সরাইওয়ালা বলল।

সরাইওয়ালা শাঙ্কোকে সরাইয়ের পেছনে নিয়ে এল। আবছা চাঁদের আলোয় দেখল—ঘোড়া দুটো একটা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা।

—আপনাদের ঘোড়াকে দানাপানিও দেওয়া হয়েছে। সরাইওয়ালা বলল।

—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। শাঙ্কো বলল।

—না—না। সে কি কথা। এটা তো আমার কর্তব্য। সরাইওয়ালা বলল। শাঙ্কো সরাইখানায় ঢুকল। নিজের জায়গায় বসে সরাইওয়ালা বলল—একটা কথা ছিল।

শাঙ্কো বলল—বলুন।

—ম্-মানে—এখানকার নিয়ম—আগেভাগে দাম দিয়ে দেওয়া।

—কেন? পরে দিলে ক্ষতি কি? শাঙ্কো বলল।

—না-না। এ দেশে এটাই চলে। সরাইওয়ালা বলল।

শাঙ্কো বুঝল যুবকটি ঠিক কথাই বলেছিল। শাঙ্কো বলল—বেশ। বলুন কত দিতে হবে?

—আপনি কিভাবে দেবেন? সরাইওয়ালা বলল।

—সোনার চাকতি দিয়ে। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে একটা বড় চাকতি আর একটা ছোট চাকতি। সরাইওয়ালা বলল।

—বেশ। শাঙ্কো বলল। তারপর কোমরের ফেট্টিতে গোঁজা সোনার একটা চাকতি বের করল। সরাইওয়ালাকে দিল। সরাইওয়ালা হেসে বলল—ঘোড়ার দানাপানি, দেখাশুনো। আর আধখানা একটা ছোট চাকতি। শাঙ্কো তাই দিল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। সরাইওয়ালার কথা বলল। দুজনেই হাসতে লাগল।

খাওয়ার ডাক পড়ল। গরম গরম মাংস, রুটি। খিদের জ্বালায় হাপুস হুপুস খেতে লাগল দুজনে। রুটি কম পড়ে গেল। দুজনে আর খেতে চাইল না। ফ্রান্সিসদের খাওয়া দেখে দুই পরিবেশনকারীর মুখ হাঁ।

খাওয়া শেষ। শাঙ্কো একজন পরিবেশনকারীকে বলল—আরো আট-দশখানা রুটি খেতে পারতাম। পরিবেশনকারী চুপ করে শাঙ্কো আর ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস সরাইওয়ালার কাছে এল। বলল—আপনাকে একটা উপকার করতে হবে।

—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—সরাইওয়ালা হেসে বলল।

—আমরা রাজবাড়ি যাচ্ছি। হেঁটেই যাবো। ঘোড়ায় চড়ে যাবো না। আপনি ঘোড়াদুটোকে কিছু দানাপানি খাওয়াবেন। ফ্রান্সিস বলল।

—নিশ্চয়। তবে আধখানা চাকতি দিতে হবে। সরাইওয়ালা বলল।

—ফিরে এসে দেব। শাঙ্কো বলল।

—না। এখন দিতে হবে। সরাইওয়ালা বলল।

—বেশ। শাঙ্কো আধখানা চাকতি বের করে দিল।

রাজবাড়িতে আসতে অসুবিধে হল না। রাজবাড়ি বলে কথা। সবাই চেনে।

দুজনে রাজবাড়ির সামনে এল। সিংহদ্বারে বর্শাহাতে দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিসরা ভেতরে ঢুকল। এবার রাজসভার দরজার কাছে এল। ঢুকতে যাবে তখন একজন প্রহরী এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। ফ্রান্সিস বলল—আমরা সেনাপতির সঙ্গে দেখা করবো।

—তোমরা বিদেশি। রাজসভায় ঢুকতে পারবে না। প্রহরী বলল।

—রাজসভায় ঢুকবো না। সভার বাইরে সেনাপতির সঙ্গে কথা আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা যেতে পারবে না। প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস পিছিয়ে এল না।

বলল—আমাদের যেতেই হবে।

—দাঁড়াও। প্রহরী বর্শা তুলে ফ্রান্সিসের মাথা লক্ষ্য করে চালাল। ফ্রান্সিস তৈরিই ছিল। মুহূর্তে মাথা পিছিয়ে নিল। বর্শার ঘা পড়ল ফ্রান্সিসের ডান বাহুতে। ফ্রান্সিস বাঁ বাহুটা ডান হাতে চেপে ধরল। ব্যথাটা ছড়াল সারা শরীরে। ফ্রান্সিস দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল। তারপর তরোয়াল কোষমুক্ত করল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিসের হাত চেপে ধরল। বলল—ফ্রান্সিস শান্ত হও। এখন লড়াইয়ে নামলে বাঁচবো না। দেখ আরো কয়েকজন প্রহরী ছুটে আসছে। আমাদের গায়ে মাথায় তরোয়াল চালাতে পারবে। আমাদের জীবন বিপন্ন হবে। শান্ত হও ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস প্রহরীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এবার দৃষ্টি সরাল। শাঙ্কোর দিকে একবার তাকিয়ে তরোয়াল কোমরে গুঁজল।

এইসবের জন্যে কিছু শব্দটব্দ হল। শাঙ্কো দেখল সভার অনেকগুলো লোক ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। বিচার চলায় বিঘ্ন দেখা দিল। রাজা বিরক্ত হলেন। বিচার থামিয়ে প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বলল—কী ব্যাপার? কী হচ্ছে ওখানে?

প্রহরী রাজার দিকে এগিয়ে গেল। মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে বলল—দুজন বিদেশি আপনাদের কাছে আসতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ওরা বলছে—আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

—ওদের নিয়ে এসো। রাজা বললেন।

প্রহরী দরজার কাছে এল। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—মহামান্য রাজা ডাকছেন। এসো।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো এগিয়ে গেল। রাজাকে মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে ফ্রান্সিস বলল—আমরা ভাইকিং। এখানে বেড়াতে এসেছি।

—এতদূর এলে?

—অন্য একটা কাজও আমরা করি। কোন দেশে গুপ্তধনের কথা জানতে পারলে গুপ্তধন খুঁজে উদ্ধার করি। গুপ্তধন সেই দেশের রাজাকে দিয়ে আমাদের জাহাজে চড়ে আবার অন্য দেশে যাই। এটাই আমাদের কাজ।

—কিন্তু গুপ্তধন উদ্ধার করে পালিয়েও তো যেতে পারো। রাজা বললেন।

—না। আমরা উদ্ধার করা গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে যাই না। যার ধনসম্পদ তাকে দিয়ে দিই। আমরা প্রতারণা করি না। ফ্রান্সিস বলল।

—এরকম মানুষ তোমরা? বিশ্বাস হয় না। রাজা হেসে বললেন।

—দেখেন নি কাউকে। তাই বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার। ফ্রান্সিস বলল।

—যাক্ গে—তোমরা কোথা থেকে আসছো? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

—প্যারাইসো থেকে। ওখানে জাহাজঘাটায় আমাদের জাহাজ রয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। কী জন্যে এখানে এসেছো?

—তাহলে একটু খুলে বলতে হয়। তানাকাতে বার্বার নামে একজন জহুরী থাকে। আপনি বোধহয় নাম শুনেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—না। বলে যাও। রাজা বললেন।

—সেই বার্বার এখানে বেশ কয়েকটি দেশের রাণিদের জন্যে বা রাজকুমারীদের জন্যে হীরের গয়না তৈরি করে দিয়েছেন। ফ্রান্সিস বলল।

—জানি না। হতে পারে। রাজা বললেন।

—এখন এই বার্বার এখানেও হীরের গয়না গড়াবার ডাক পেয়েছিল কিনা সেটা জানতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—কে কোথায় কার জন্য গয়না গড়াচ্ছে এটা জেনে তোমাদের কী লাভ? রাজা বললেন।

—আমাদের আর্থিক লাভ কিছুই নেই। তবে এই থেকে একটা কথা জানা যাবে বলে আমাদের ধারণা। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আরকানিয়া হঠাৎ সিংহাসন থেকে উঠলো। তারপর সিংহাসনের চারপাশে ঘুরে এল। রাজা দাঁড়িয়ে রইলেন কাজেই মন্ত্রী সেনাপতি অমাত্যরাও উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের আসনের চারপাশে ঘুরে এল। সিংহাসনে রাজা আরকানিয়া বসলেন। সবাই বসল।

—কী কথা জানতে চাও? রাজা বললেন।

—গয়না গড়ার আগে বার্বার বলেছে কিনা সেই হীরকখণ্ড হারিয়ে গেছে কিংবা চুরি হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আরকানিয়া সিংহাসন থেকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পড়লেন। মন্ত্রী, অমাত্যরাও উঠে দাঁড়ালন। রাজা বললেন—সব মিথ্যে কথা। তোমরা প্যারাইসো দেশের গুপ্তচর। আর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা প্যারাইসো আক্রমণ করবো। খুব জমবে লড়াইটা। তোমরা লুকিয়ে জানতে এসেছো—আমরা কিভাবে যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছি। কোন দিক দিয়ে আমরা আক্রমণ করবো। কবে আক্রমণ করবো এসব তথ্য জানতেই প্যারাইসো থেকে তোমরা এসেছো। রাজা আরকানিয়া সিংহাসনের চারধারে ঘুরে এসে সিংহাসনে বসলেন। মন্ত্রী,

সেনাপতি, অমাত্যরাও তাই করলেন। সিংহাসনে বসে রাজা আরকানিয়া বললেন—

—তোমাদের বন্দী করা হল।

—কিন্তু আমরা বিদেশি। অল্পদিন হল এখানে এসেছি। আমরা কাউকেই চিনি না এই দেশের কিছুই জানি না। তাছাড়া গুপ্তচরবৃত্তি করতে যাবো কেন? কী লাভ আমাদের? ফ্রান্সিস বলল।

—সোনার চাকতি পাবে। তারপর জাহাজে চড়ে পালাবে। রাজা বললেন।

—আমাদের যথেষ্ট সোনার চাকতি আছে। আমরা এই কাজ করতে যাবো কেন? ফ্রান্সিস বলল।

রাজা আবার হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। মন্ত্রী, অমাত্যরাও উঠে দাঁড়াল। রাজা সেনাপতির দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললেন—কয়েদখানা। রাজা বসে পড়লেন আর সবাই বসলেন। ফ্রান্সিস বুঝল এই পাগল রাজাকে কিছুই বোঝানো যাবে না। যা হচ্ছে তাই মেনে নিতে হবে।

ততক্ষণে সেনাপতি উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রহরীদের ইঙ্গিত করল। চারজন প্রহরী এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসদের হাতে দড়ি বাঁধল। সবাই রাজসভা থেকে নেমে এল। প্রহরীরা ফ্রান্সিসদের নিয়ে চলল। রাজসভার লোকজন তাকিয়ে দেখল। বোঝাই যাচ্ছে বন্দীরা বিদেশি। কেউ ভেবে পেল না পাগল রাজা ওদের বন্দী করল কেন।

ফ্রান্সিসদের সদর রাস্তায় নিয়ে আসা হল। তারপর নিয়ে চলল—কয়েদখানার দিকে। রাস্তার লোকজন ফ্রান্সিসদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। এই বিদেশিদের বন্দী করা হয়েছে কেন?

ফ্রান্সিসদের একটা পাহাড়ের নিচে আনা হল। দেখা গেল—বেশ কিছু জায়গা নিয়ে কাঁটাতারের বেড়া। তার মধ্যে কাঠ পাথরের কয়েকটা বাড়ি। একটা বাড়ি বেশ বড়। ঘেরা জায়গা জুড়ে ফুলের গাছ। দু-একটা ফ্রান্সিসদের চেনা যেমন গোলাপ টিউলিপ সান ফ্লাওয়ার—ক্রিসেনথেমাম। কিছু লোক ফুলগুলোর পরিচর্যা করছে। বোঝাই গেল কয়েদী ওরা।

সর্দার প্রহরী কাঁটাতারের পাশ দিয়ে হেঁটে দরজার কাছে এল। কার নাম ধরে ডাকল। তারপর কোমরে গোঁজা চাবিটা বের করল। ওদিকে একজন কয়েদী এগিয়ে এল। তারও হাতে চাবি। প্রথমে সর্দার প্রহরী বাইরের দিককার তালায় চাবি ঢোকাল। মোচড় দিল। মৃদু কট্ শব্দ তুলে তালাটা খুলে গেল। এবার ওপাশে কয়েদী এগিয়ে এসে চাবি দিয়ে ওপাশের তালা খুলে দিল। এইবার দরজা সম্পূর্ণ খুলে গেল। সর্দারসহ সবাই ঢুকল। ভেতর দিককার দরজায় আবার তালা লাগাল কয়েদীটি। বাইরের তালায় চাবি ঢুকিয়ে বন্দী করল।

সর্দার প্রহরী ফ্রান্সিসকে বলল—এটাই কয়েদখানা। আমরা পাহারাদার। কয়েদখানার মাঝখানে এত ফুলের সমারোহ ফ্রান্সিসরা বুঝতেও পারে নি। প্রহরীরা বড় ঘরটায় চলে গেল। সর্দার ফ্রান্সিসকে বলল—ঐ যে ঘরগুলো দেখছো— ওখানকার একটা ঘরে তোমাদের থাকতে হবে। যাও।

ফ্রান্সিসরা প্রথম ঘরটায় ঢুকল। দেখল কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি ঘরটা বেশ বড়ই। দরজায় তালাচাবির ব্যাপার নেই। ঘরে কেউ নেই। চারদিকে মাটির ওপর শুকনো ঘাস আর পাতা দিয়ে তৈরি বিছানামত।

তখনই কয়েকজন কয়েদী ঢুকল। হাতে মাটি লেগে আছে। তাহলে এরাই ফুলগাছের পরিচর্যা করছিল? একজন এগিয়ে এল। বলল—তোমরা কয়েদী হলে আমাদের মত? কী করেছিলে তোমরা? চুরি না খুন? ফ্রান্সিস বলল—আমরা একটা খবর জানার জন্যে এই রাজ্যে এসেছিলাম।

—কিন্তু তোমরা তো বিদেশি। বোধহয় ঐ জন্যেই তোমাদের কয়েদখানায় ঢোকানো হয়েছে।

—সেটা তো একটা কারণ বটেই। তা ছাড়া আরও কারণ আছে। এই কাকোয়াম্বোর সঙ্গে প্যারাইসো দেশের অল্পদিনের মধ্যেই লড়াই বাঁধবে। আমরা বিদেশি গুপ্তচর বলে সন্দেহ করে এখানকার পাগলা রাজা আরকানিয়া আমাদের কয়েদ করেছে।

—তাহলে তোমরা এখানে এলে কেন? আর একজন কয়েদী বলল।

ফ্রান্সিস বার্বারের কথা—তাঁর হীরে চুরির কথা সব বলল। তারপর বলল—আমাদের মিথ্যে বদনাম দিয়ে পাগলা রাজা আরকানিয়া আমাদের কয়েদখানায় ঢুকিয়েছে।

—রাজা আরকানিয়াকে পাগলা রাজা বলছো কেন?

—পাগলা না হলে কেউ কাঁটাতারে ঘেরা কয়েদখানা করে? কয়েদখানার মধ্যে বাগান করে? কয়েদখানার চাবি থাকে কয়েদীর কাছে।

দুতিনজন কয়েদী হেসে উঠল। একজন বলল—তাহলে তুমিও পাগলা রাজাকে চিনেছো। পাগলা রাজার আরো কাণ্ডকারখানা আছে। যাক গে—সবেমাত্র এলে। তাই রেহাই পেলে। কাল ভোর থেকেই কাজে ডেকে নিয়ে যাবে। বাগান পরিচর্যার কাজ চলছে এখন। আমাদের সঙ্গে ঐ কাজেই লাগতে হবে।

এমন সময় ঘরে ঢুকলো সর্দার প্রহরী। ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা কোথায় থাকতে চাও?

—এই ঘরেই। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে ঐ দক্ষিণ কোনায় তোমাদের বিছানা করে দেওয়া হবে। তোমরা আমার সঙ্গে এসো। সর্দার দরজার দিকে চলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো সর্দারের পেছনে পেছনে চলল।

প্রহরীদের ঘরে ঢুকল। কোনার একটা পাশে স্তূপীকৃত শুকনো ঘাস পাতা। ডাঁই করে রাখা। সর্দার বলল—এখান থেকে ঘাসপাতা নিয়ে নিজেদের বিছানা তৈরি করো।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ঘাসপাতা দফায় দফায় নিয়ে এসে বিছানা তৈরি করল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো বসে রইল।

দু'দিন কাটল। ফ্রান্সিসের এক চিন্তা—এই অদ্ভুত কয়েদখানা থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কেমন করে। সব চিন্তাভাবনা গুলিয়ে যাচ্ছে।

সেদিন সর্দার এসে বলে গেল—রাজা আরকানিয়া কয়েদখানা দেখতে আসবেন।

সকাল গেল। বিকেলও গেল। রাত হল। ফ্রান্সিসদের খুব তাড়াতাড়ি খেতে দেওয়া হল। কয়েদীরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল না। বসে রইল। ফ্রান্সিস একজন কয়েদীকে বলল—রাজা তো আর আসবে না।

—হুঁ। পাগলা রাজা নাম হয়েছে কি সাধে। ঘুমিয়ে পড়ো না। রাজা ঘুমুচ্ছে দেখলে ভীষণ রেগে যায়। বলে—আমার আসার খবর আগেই দেওয়া হয়েছে। গভীর রাতেও আসতে পারি। তোমরা শুয়ে পড়লে কেন। ওঠ। সবাই উঠে দাঁড়ায়। রাজা ইঙ্গিত করে—বসো। সবাই বসে পড়ে। কথাগুলো শাঙ্কোও শুনল। বলল—রাজাটা একেবারে বেহেড একটা। একজন কয়েদী বলছিল এসব সত্ত্বেও পাগল রাজা ভালো।

গভীর রাত তখন। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু প্রহরীদের ঘরে মশালের আলো। কয়েদীদের ঘরেই মশাল জ্বলছে।

হঠাৎ প্রহরীদের ছুটোছুটির শব্দ শোনা গেল।

রাজা আরকানিয়া ঘোড়ায় চেপে এলেন। পেছনে দুজন অশ্বারোহী। সবাই দরজার কাছে থামল। সর্দার প্রহরী ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। ঘোড়া থেকে নেমে রাজা আস্তে আস্তে দরজা পার হয়ে কয়েদীদের ঘরের সামনে এলেন।

তারপর কয়েদীদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রথমেই ফ্রান্সিসদের ঘরটা পেলেন। নিজেই ভেজানো দরজা খুলে ঢুকলেন। মশালের আলোয় দেখলেন সব কয়েদী উঠে দাঁড়িয়েছে। রাজা ফ্রান্সিসদের সামনে এসে বললেন—তোমরা গুপ্তচর। কঠিন শাস্তি হবে তোমাদের।

—আমরা নির্দোষ। আপনার দেশের কোন ক্ষতি করতে আমরা আসি নি। আমরা বিদেশি। আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই।

—আছে—আছে। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। তোমরা আমার রাজত্বে এলে কেন? রাজা বললেন।

—যদি শোনেন তাহলে বলি? ফ্রান্সিস বলল।

—বলো। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস তখন আস্তে আস্তে হীরের খণ্ড চুরির ব্যাপারটা বলল। তারপর বলল— গয়না গড়তে একখণ্ড হীরে এই বার্বারকে দিয়েছিলো কিনা। বার্বার হীরের খণ্ডটা হারিয়ে গেছে এরকম কথা বলে অন্য হীরের খণ্ড নিয়ে গিয়েছিল কিনা। শুধু এইটুকু জানতে আপনার রাজত্বে এসেছিলাম। আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

—হুঁ। বানিয়ে টানিয়ে ভালোই বললে। কিন্তু আমাকে অত সহজে বোকা বানানো যাবে না। তোমাদের বিচার হবে। রাজা বললেন, তারপর অন্য কয়েদীদের কাছে গেলেন।

আশ্চর্য! কয়েদীদের নাম ধরে ডাকলেন। কয়েদীরা একে একে রাজার কাছে আসতে লাগল। কার কী অপরাধ তাও বললেন। ক' বছরের সাজা হয়েছে তাও বললেন।

এবার রাজা প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বললেন—খুব সাবধানে পাহারা দেবে যেন কেউ পালাতে না পারে।

রাজা কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘোড়ায় উঠলেন। সঙ্গের দুজন অশ্বারোহীও ঘোড়ায় চড়ল। রাজা ঘোড়া ছোটালেন রাজবাড়ির দিকে।

পাগলা রাজা আবার এল কয়েকদিন পরে। সঙ্গে সেনাপতি আর বেশ বেঁটে একজন লোক। তালা খুলে দেওয়া হল। রাজা সেনাপতি আর বেঁটে লোকটি ঢুকলেন। প্রহরী সর্দারকে বলল—সব কয়েদীদের এখানে আসতে বল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব কয়েদী জড় হল।

রাজা সর্দার প্রহরীকে বললেন, বাগানে ফুল এত কম কেন?

—মান্যবর রাজা—এটা শীতকাল। কাজেই ফুলের সংখ্যা কম। তবে ঝরে গেলেও দক্ষিণ দিকটায় খুব ফুল ফুটেছে। রাজা বেঁটে লোকটার দিকে তাকাল। বলল— মনে হয় খুব বেশি ফুল পাবেন না।

—ঠিক আছে। যা দেখছি তাতে কাজ চলে যাবে। বেঁটে লোকটি বলল।

—তাহলে দেখুন। রাজা বললেন।

বেঁটে লোকটি একটু গলা চড়িয়ে বলল—তোমরা সবাই প্রত্যেকটি গাছ থেকে একটি করে ফুল নিয়ে খাবে। বুঝতে হবে কোন ফুল খেয়ে তোমাদের শরীরের ক্লান্তিভাব চলে গেছে। এখন অনায়াসে হেঁটে অন্য রাজ্যে চলে যেতে পারবে। মন উৎফুল্ল থাকবে। বর্শা ছুঁড়তে পারবে বেশ দূরে। লক্ষ্যভেদ করতে পারবে। এই অবস্থাটা বেশ কিছুদিন চলবে। তারপরে আবার ফুল খেতে হবে। বেঁটে ভদ্রলোকটি থামলেন। তারপরে বললেন—তোমরা ফুল খেতে থাকো। কয়েদীরা ফুল গাছের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবাই ফুল খেতে লাগল।

ফুল খাওয়া শেষ। এখন দেখা হবে কার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস ছুট লাগাল। প্রহরীদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ইশারা করল। শাঙ্কো লাফিয়ে উঠল। তারপর দুজন কয়েদীর

ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল মারামারি। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুঁষোঘুঁষি শুরু হল। বেঁটে চেঁচিয়ে বলল—থামো—থামো। শাঙ্কো থামল। বেঁটে প্রথমে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি তো দেখছি বিদেশি।

—বিদেশি বলে কি ফুল কাজ করবে না? ফ্রান্সিস বলল।

—না-না তা করবে। তুমি কোন ফুল খেয়েছিলে? বেঁটে বলল।

—সূর্যমুখী ফুল। ফ্রান্সিস বলল।

এবার বেঁটে জিজ্ঞেস করল শাঙ্কোকে—তুমি?

—চন্দ্রমল্লিকা ফুল। শাঙ্কো বলল।

রাজার দিকে তাকিয়ে বেঁটে বলল—এই দুটি ফুল অনেককে খাইয়ে দেখেছি কোন সতেজভাব হয়নি। কিন্তু এখানে হয়েছে তার কারণ মাটি। আপনার এই এলাকায় মাটি খুব ভাল। তাই অন্তত দুজনের মধ্যে দ্রুত ভালো প্রতিক্রিয়া হয়েছে। চন্দ্রমল্লিকা আর সূর্যমুখীর চাষ বাড়ান। আপনার সৈন্যদের খাওয়ান। সৈন্যরা বিদেশি সৈন্যদের সঙ্গে সিংহের মত লড়বে।

—হ্যাঁ। যা বুঝছি দুটো ফুলেরই চাষ বাড়াতে হবে। রাজা বললেন।

—ঠিক তাই। বেঁটে বলল।

রাজা, বেঁটে আর সেনাপতি ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। ফ্রান্সিস হেসে উঠল। শাঙ্কোও হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়ে অবস্থা। কয়েদীরা ঠিক বুঝল না ওদের হাসির কারণ কী।

দুদিন পরে পাগল রাজা আর বেঁটে এল। এবার মাঝরাতে না। দিনের বেলাই এল। সামনের দুটো ঘোড়ায় রাজা আর বেঁটে। আর একটি ঘোড়ায় সেনাপতি।

রাজা ও বেঁটে কাঁটাতারের প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকল। সেনাপতি বেশ জোরে বলল—মাননীয় রাজা এসেছেন। তোমরা এই দেবদারু গাছের নিচে এসে দাঁড়াও। প্রহরীরাও এসো।

কিছুক্ষণের মধ্যে সব কয়েদীরা প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল। প্রহরীরা এসেও দাঁড়াল। রাজা বলল—তোমরা সূর্যমুখী ফুল খেয়েছিলে? কয়েকজন কয়েদী মাথা কাত করে বলল খেয়েছি। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—কী করে খাবো। কে বা কারা বাগানের সব সূর্যমুখী ফুলের গাছ শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলেছে।

—সে কি। এতো সাংঘাতিক অপরাধ। রাজা বললেন।

—অবশ্যই অপরাধ। বেঁটে বলল।

রাজা সব কয়েদীদের দিকে তাকাল। সবাই চুপ। পাগলা রাজা আরো চটে গেল। বলতেই হবে কে কাণ্ডটা করেছিস্।

সবাই চুপ। সেনাপতি এগিয়ে এল। রাজাকে কানে কানে কী বলল। রাজা কান সরিয়ে বললেন—এক-এক করে এগিয়ে এসো। একজন একজন করে

এগিয়ে আসতে লাগল আর রাজা তাদের হাত দেখতে লাগলেন। একজন কয়েদীকে পেলেন। তার হাত মাটিমাখা।

রাজা বললেন—সেনাপতি এটাকে ধরুন। সেনাপতি ছুটে এসে কয়েদীটিকে সরিয়ে নিল। রাজা আবার কয়েদীদের হাত দেখতে লাগলেন। এবার ফ্রান্সিস ধরা পড়ল। রাজা চেঁচিয়ে বললেন—এই বিদেশিটার হাতে মাটি ধুলো। ফ্রান্সিস বলল— মহামান্য রাজা উপড়ে-ফেলা সূর্যমুখী পাঁচটা গাছ আমি পুঁততে পেরেছি। তাই হাতে ধুলা মাটি লেগেছে।

—খুব ভালো—খুব ভালো। পাগলা রাজা চেঁচিয়ে বলল।

আবার হাত দেখা শুরু হল। আবার একজনকে পাওয়া গেল। দুজনকে দেখিয়ে রাজা সর্দার প্রহরীকে বললেন—এদের কী শাস্তি হবে তা তো জানিস। ঐ দুটোকে সেই শাস্তি দে।

সর্দার প্রহরী এগিয়ে এল। পেছনে আরো কয়েকজন প্রহরীও এল।

ওরা দুই কয়েদীদের নিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে নিয়ে গেল। রাজা চেঁচিয়ে— ছুঁড়ে ফ্যাল্। দুজন প্রহরী ঐ কয়েদীদের দুজনকে ধরে কাঁটাতারের বেড়ার ওপর ছুঁড়ে দিল। কয়েদী দুজন উঠে এলো। আবার ধাক্কা দিয়ে ফেলল কাঁটাতারের ওপর। এইভাবে কিছুক্ষণ ছোঁড়া তোলা চলল। কয়েদী দুজন কাঁদতে লাগল। সমস্ত শরীর দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। পোশাক রক্তাক্ত।

রাজা হাত তুললেন। শাস্তি বন্ধ হল। কয়েদী দুজন আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে অন্য কয়েদীদের কাছে এল তখনও সারা গা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে।

রাজা এবার হাসলেন। বললেন—সেনাপতি।

—বলুন।

—এই শাস্তিটা কেমন বের করেছি বলুন তো? রাজা বললেন।

—তুলনা নেই। কেউ ভাবতেই পারবে না। সেনাপতি বলল।

তিনজনে কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এল। ঘোড়ায় চড়ল। রাজপ্রাসাদের দিকে চলল। রাজা যেতে যেতে বললেন—জানেন এই শাস্তির ব্যাপারটা নিয়ে ভাবি। ঘুমোবার আগে এই এক চিন্তা আমার। কেটে ফেলা হল, ফাঁসি দেওয়া হল— এসব তো আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। আমি চাই নতুন কিছু। আর কেউ যা ভাবতেই পারবে না।

—আমিও ভাবি বুঝলেন। ভাবি কী করে মানুষকে উজ্জীবিত করা যায়। নতুন নতুন সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যেমন এখন ফুল নিয়ে ভাবছি—পরে ফল নিয়ে ভাববো। বেঁটে বলল।

—ঠিক বলেছেন। রাজা হেসে বললেন।

আহত দুই কয়েদীকে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিল। আহত দুজন তখনও গোঁঙাচ্ছে। গুরুতর আহত ওরা। ফ্রান্সিস প্রহরীদের ঘরে এল। সর্দার প্রহরীকে বলল—কাটাছেঁড়ার ওষুধ আছে?

সর্দার প্রহরী বলল—আছে। কিন্তু রাজা আহতদের জন্যে ওষুধ দিতে বলে যান নি। কাজেই আমি দিতে পারবো না।

ফ্রান্সিস এক লাফে এগিয়ে সর্দার প্রহরীর গলা চেপে ধরল। সর্দার প্রহরী মাটিতে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস দাঁত চাপা স্বরে বলল, ওষুধ না দিলে তোমাকে আমি খুন করবো আর সেটা করতে গিয়ে আমি মরে যেতে রাজি। বল—কী করবে?

ঘরে আরো তিনজন প্রহরী ছিল। তিনজনই তরোয়াল খুলে এগিয়ে এল। একজন বলল—সর্দারকে ছেড়ে দাও।

—না। আহত কয়েদীর জন্য ওষুধ চেয়েছিলাম। সর্দার ওষুধ থাকা সত্ত্বেও দেবে না বলছে। ফ্রান্সিস বলল।

—কী করবো। রাজা হুকুম না দিলে আমাদের কিছু করার নেই। এক প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস সর্দারকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সর্দারও উঠল।

ফ্রান্সিস বলল—নিয়ম আছে। আবার মানবতার খাতিরে নিয়ম ভঙ্গও তো হতে পারে।

—সেটা অবশ্য আলাদা কথা। সর্দার প্রহরী বলল।

—ঐ আলাদা কথাটাই আমি বলছিলাম। কয়েদী দুজনের কী অবস্থা হয়েছে তোমরা দেখেছো। ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব আমরা অনেকদিন দেখে আসছি। একজন প্রহরী বলল।

—কখনও প্রতিবাদ করো নি। ফ্রান্সিস বলল।

—না। আমাদেরই মেরে ফেলবে। অন্য এক প্রহরী বলল।

—কিন্তু আমি প্রতিবাদ করবো। আমাকে রাজার কাছে যেতে দাও। আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাও। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাকে রাজার কাছে যেতে দেব না। তুমি রাজার কাছে গেলে প্রতিবাদ করলে মরে যেতে পারো। অন্য প্রহরী বলল।

—ঠিক আছে। আমি যাবো না। ওষুধ দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি যাও। আমি যাচ্ছি। সর্দার প্রহরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

ফ্রান্সিস ওর ঘরে এল। আহতদের একজন ফ্রান্সিসদের ঘরের। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে কয়েদীটির কাছে এল। পোশাক কিছু সরিয়ে দেখল—কী সাংঘাতিকভাবে শরীর কেটে কেটে গেছে। কয়েদীটি গোঁঙাচ্ছিল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল— সর্দার প্রহরী ওষুধ নিয়ে আসছে। একটু সহ্য করো কয়েদীটির গোঁঙানি বন্ধ হল।

তখনই সর্দার প্রহরী ঘরে ঢুকল। হাতে একদলা তুলো আর একটা বোতল। সর্দার কয়েদীটির কাছে গিয়ে বলল—ওষুধ লাগালে জ্বালাযন্ত্রণা হবে। কিছুক্ষণ। সহ্য করো।

সর্দার বোতল থেকে ওষুধ নিয়ে কয়েদীটির শরীরের কাটা জায়গাগুলিতে লাগাতে লাগল। কয়েদীটি প্রথমে জোরে গুঙিয়ে উঠল। একটু পরে শান্ত হল। সর্দার ওর সারা গায়ে ওষুধ লাগিয়ে দিল।

সর্দার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসকে বলল—ও যেন দিন দুয়েক চান না করে। কালকে আবার ওষুধ লাগিয়ে দেব। দু-তিনদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবে। সর্দার চলে গেল।

ফ্রান্সিস নিজের বিছানায় গেল। শাঙ্কো আস্তে ডাকল—ফ্রান্সিস। আহত লোকটা বাঁচবে তো?

—সর্দার তো বলল এই ওষুধেই সারবে। দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি কি পাগলা রাজাকে সত্যি কথা বলেছিলে? শাঙ্কো বলল।

—মাথা খারাপ। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি গাছগুলো নিয়ে কী করেছিলে? শাঙ্কো বলল।

—সব গোড়াশুদ্ধু তুলে একপাশে রেখে দিয়েছিলাম। ফ্রান্সিস বলল।

—প্রহরীরা দেখে নি? শাঙ্কো বলল।

—ওরা তখন নিজেদের মধ্যে তাস খেলায় মগ্ন। ফ্রান্সিস বলল।

রাত হল। খাবার সময় হল। রাঁধুনিরা খাবার নিয়ে এল। ফ্রান্সিস নিজের খাবারটা শাঙ্কোকে দেখতে বলল। নিজে আহত কয়েদীদের কাছে গেল। কয়েদীকে খাইয়ে দিল। তারপর নিজের বিছানায় এসে শাঙ্কোর হাত থেকে খাবার নিল। খেতে লাগল।

রাতে শুয়ে পড়ল। এখন শুধু এখান থেকে পালাবার চিন্তা। কিভাবে পালাবে?

কয়েকদিন কাটল। আহত কয়েদীটি সুস্থ হল। সর্দার প্রহরী ঢুকল। আহত কয়েদীটির বিছানার কাছে এল। আহত কয়েদীটিকে জিজ্ঞেস করল—কেমন আছো ভাই?

—অনেক ভালো আছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি ওষুধ না দিলে আমি মারা যেতাম।

ফ্রান্সিস বলল—ওষুধ না দিলে সর্দারকে মরতে হত।

হঠাৎই ফ্রান্সিসের মনে হল—সর্দার প্রহরী কেমন যেন দুঃখভারাক্রান্ত। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—আমার বিছানার কাছে একটু আসবে?

—চলো। দু'জনে ফ্রান্সিসের বিছানার কাছে এল। ফ্রান্সিস ইশারায় শাঙ্কোকে ডাকল।

ফ্রান্সিস সর্দার প্রহরীকে ওর বিছানায় বসতে বলল। সর্দার প্রহরী মাথা নাড়ল। দুজনে সর্দারের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—কারণ জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার মনে খুব দুঃখ-বেদনা আছে। সর্দার ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। বলল, হ্যাঁ আছে। রাজা আরকানিয়া যে কয়েদীদের কী নির্মম

শাস্তি দেয় তা কল্পনাও করতে পারবে না। ও পশুদের চেয়েও হিংস্র। রাজা ওপরে ওপরে পাগলাটে ভাব দেখায় কিন্তু আসলে ও একটা সুস্থ মানুষ। সবাইকে দেখায় ও পাগলাটে। আসলে ও খুব বুদ্ধিমান মানুষ। ওর হুকুমে কয়েদীদের ওপর কী সাংঘাতিক অত্যাচার করতে হয়েছে সে কথা ভাবলে আমার চোখে জল আসে। কিন্তু পরক্ষণেই সাবধান হয়ে যাই অন্য প্রহরীরা যেন না দেখে ফেলে। এইভাবেই দিন কাটছে আমার। কাঁদতে পারি না।

—আহত কয়েদীটিকে যে ওষুধ দিয়েছো এটা জানতে পারলে—ফ্রান্সিস বলল।

—আমার অবধারিত মৃত্যু। একটু চুপ করে থেকে ফ্রান্সিস বলল—আমরা দুজন পালাতে চাই।

—আমিও পালাতে চাই।

ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল। বুঝল না সর্দারের কথাটা সত্যি না মিথ্যে।

ফ্রান্সিস একটু হেসে বলল—তোমার পালাতে অসুবিধে কোথায়। চলে গেলেই হল।

—রাজার চোখ সবদিকে। আমি পালালে রাজা আমার পেছনে ঘাতক লেলিয়ে দেবে। ঘাতক আমাকে যেখানে পাবে হত্যা করবে। ফ্রান্সিস শাঙ্কো চুপ করে রইল।

একটু পরে ফ্রান্সিস বলল—তোমার সমস্যার কথা জানলাম। আমরা পালালে রাজা আর আমাদের নিয়ে ভাববে না। ফ্রান্সিস বলল।

—লোকটা কী নৃশংস তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।

—দেখ সর্দার আমাদের পালাতেই হবে। আজ অথবা কাল। কী করে পালাবো সেটাই বুঝতে পারছি না।

—সত্যিই পালাতে চাও?

—নিশ্চয়ই।

—ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করে দেব। শুধু ধরা পড়লে আমার কথা বলবে না।

—তাহলে তুমি আগে কোন কোন কয়েদীকে পালাতে সাহায্য করেছো।

—যদি পালাতে সাহায্য না করতাম তাহলে নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করা হতো। সর্দার বলল।

—ঠিক আছে। কবে পালাতে সাহায্য করবে? ফ্রান্সিস বলল।

—শোন—এই কাকোয়াম্বো সমুদ্রের কাছে। তাই এ সময়টায় এখানে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হয়। তেমনি এক রাতে তোমরা তৈরি থেকো! ঠিক সময় আমি ডাকবো—জাহাজী? তোমরা চলে আসবে ঘরের বাইরে। তারপর কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে পালানো।

—কাঁটাতারের বেড়া পার হবো কিভাবে? শাঙ্কো বলল।

—সে সবের ব্যবস্থা তখন দেখবে—সর্দার বলল।

—তুমি এ ভাবেই অনেককে পালাতে সাহায্য করেছো নিশ্চয়ই। ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব কথা থাক। তোমরা তৈরি? সর্দার বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

সেদিন গভীর রাতে বাইরে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি চলছে। হঠাৎ শুধু শুনল—জাহাজী।

বাইরে এসো। সর্দার প্রহরী বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো বাইরে এল। কী ঝড়ের ঝাপটা যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি। গভীর অন্ধকার বাইরে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তাতেই যা দেখা যাচ্ছে।

সর্দার প্রহরীর পেছনে পেছনে ফুল বাগানের এক কোনার দিকে এলো ওরা। সর্দার প্রহরী দুজনকে কাছে আসতে বলল। কোনার কাঁটাতারের কাছে এসে সর্দার দুহাত দিয়ে কাঁটাতারে টান দিল। কাঁটাতার আস্তে আস্তে সরে গেল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো যত তাড়াতাড়ি পারো বেড়িয়ে এসো।

দুজনে কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে গলে গেল। দুজনেরই হাতে পিঠে কাঁটাতারের খোঁচা লাগল। বেশ জোরে। কিন্তু তখন আর ওসব ভাববার সময় নেই। দেখবারও সময় নেই।

কাঁটাতার পার হয়ে ফ্রান্সিস সর্দার প্রহরীর দিকে হাত বাড়াল। সর্দার ওর বাড়ানো হাত ধরল। চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল।

দুজনে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুটল। বিদ্যুতের আলোয় ওরা একটা প্রান্তরের মতো দেখল। ছুটল তার ওপর দিয়ে। কিছুদূর এসে দেখল একটা টানা বড় রাস্তা। দুজনে রাস্তায় উঠে ছুটতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ ছোটার পর পথের দুপাশে বাড়িঘর দেখল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—শাঙ্কো—আশ্রয় চাই। আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি।

তখন বৃষ্টি একটু কমের দিকে। কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ার বিরাম নেই।

একটা বাড়ির সামনে এল। বিদ্যুতের আলোয় দেখল বেশ বড় বাড়ি। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সদর দরজার সামনে এল। জোরে দরজায় ধাক্কা দিল। ভেতরে কোন সাড়াশব্দ নেই। আবার ধাক্কা দিল। খটাস্ শব্দ তুলে দরজা খুলে গেল। একজন যুবক দাঁড়িয়ে। শাঙ্কো বলল—দেখুন—ঝড়বৃষ্টিতে আটকে পড়ে গেছি। একটু থাকবার জায়গা দেবেন?

—নিশ্চয়ই। আসুন। যুবকটি বলল।

ভেজা পোশাকে ফ্রান্সিস ও শাঙ্কো ঘরে ঢুকল। খেয়েদেয়ে ফ্রান্সিস যুবকটিকে বলল—তোমরা আমাদের যত্ন করে খেতে দিয়ে থাকতে দিয়েছো। তোমাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ রইলাম।

—না—না। এ কী বলছেন? এটা মানুষ হিসেবে আমাদের কর্তব্য। যুবকটি চলে গেল।

রাত একটু গভীর হতে দুজনে উঠে পড়ল। বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল—এখন ঠিক কর প্রথমে কোথায় যাবে?

—প্রথমে তানাকার খোঁজ করতে হবে। ওর বাবা কোথায় সেটাও জানতে হবে। শাঙ্কো বলল। দুজনে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল।

যখন তানাকা পৌঁছল তখন ভোর হয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। খুঁজে খুঁজে একটা সরাইখানা দেখল। ওরা সরাইখানায় ঢুকল। মালিক হাসিমুখে এগিয়ে এল। মালিক দুটো লাভের কথা ভাবল—এরা তো বিদেশি। খুব সহজেই জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেখাবে। এরা অন্য কোথাও যাবে না। এই সরাইখানাতেই থাকবে। থাকা খাওয়ার জন্যে বেশি অর্থ চাইবে। এরা যা দাম চাইবে তাই দেবে। এ বিষয়ে সরাইওয়ালা নিশ্চিন্ত।

সরাইওয়ালা পেছনের ঘরে এল। ফ্রান্সিসরাও চলল। ঘরটা দেখিয়ে সরাইওয়ালা বলল—এখানেই থাকবেন। আরামে থাকবেন। এখন সকালের খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সকালের খাবার খেয়ে দুজনে চলল তানাকাদের বাড়ি। সব খবরাখবর জানা যাবে।

তানাকাদের বাড়ির সামনে এল। দরজা বন্ধ। ফ্রান্সিস দরজায় ধাক্কা দিল। একজন বয়স্ক মানুষের গলা শুনল—কে?

—আমরা। তানাকার বন্ধু। দরজাটা খুলুন। শাঙ্কো বলল।

তানাকার মা বেরিয়ে এল। তানাকার মা বলল—

—তোমরা কে বাবা?

—তানাকাকে ডাকুন। ও সব বলবে। শাঙ্কো বলল।

—কিন্তু তানাকাকে যে দিন সাতআট আগে পাঁচ-ছ'জন গুণ্ডা এসে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।

—কোথায় নিয়ে গেছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—তাতো জানি না।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল—যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হয়েছে। তানাকার বন্ধু আরোনাস এবার সক্রিয় হয়েছে। তানাকাকে নিয়ে সেই বন্ধুর দল কাজে নেমেছে। ও আরো বলল—তানাকাকে কয়েদঘর থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ও এই ক'দিন বোধহয় বাড়িতেই ছিল। বাবা বার্বার কয়েদখানায়। ওকেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল। শাঙ্কো তানাকার মাকে জিজ্ঞেস করল—তাহলে তানাকাকে গুণ্ডারা কোথায় রেখেছে আপনি জানেন না।

—না।

—তানাকা এক বন্ধুর কথা আমাকে বলেছিল। কী যেন নাম—ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ করে ভাবতে ভাবতে চোখ খুলল—হ্যাঁ আরোনাস। আরোনাসের বাড়ি ওদের দোকানের কাছে। ওখানে গিয়ে খোঁজখবর করতে হবে। চল।

ওরা তানাকাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

রাস্তা ধরে চলল বাজারের দিকে। তানাকাদের দোকানে দেখল ঘরে কাচঢাকা আলো। তারই আলোতে কয়েকটা কাঠের পাটাতন দেখল। একটা বড় পাটাতনে বিছানা পাতা। বোধহয় যুবকটি এখানে শুয়েছিল। ওদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—

—দাঁড়ান—আপনাদের শুকনো পোশাক এনে দিই। যুবকটি ভেতরে চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল। দুজনেই গায়ের পোশাক খুলতে লাগল। সব ভিজে ঢোল।

কিছু পরে যুবকটি এল। হাতে শুকনো কাপড় জামা। ফ্রান্সিসরা ভেজা জামাকাপড় একটা কাঠের পাটাতনের ওপর রাখল। শুকনো পোশাক পরল। মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চুল পাট করল।

এতক্ষণে ফ্রান্সিসরা বুঝতে পারল ওরা কী পরিশ্রান্ত! যুবকটি বলল—এবার শুয়ে পড়ুন। রাত আর বেশি নেই।

ফ্রান্সিস বলল—কিন্তু আপনি জানতে চাইলেন না আমরা কোথা থেকে আসছি কোথায় যাবো।

—কী দরকার। যুবকটি হেসে বলল—আপনারা ঝড়-বৃষ্টিতে আটকা পড়েছেন। আপনাদের সাহায্য করতে হবে। ব্যস্—এর চেয়ে বেশী জেনে কী হবে?

ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে পড়ল। বলল—আমরা সবাই যদি এরকম হতাম? আমাদের কত প্রশ্ন কত অনুসন্ধিৎসা? পথিক হয়তো অনেকদূর হেঁটে এসেছে। কোথায় তাকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করবে তা নয় হাজারো প্রশ্ন—কী নাম? জাত কী? কোত্থেকে আসছেন? দেশ কোথায়? বেচারি পথিকের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

দুজনে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস অস্পষ্ট পাখির গান শুনল। তার মানে রাত শেষ হয়ে এসেছে। দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙতে বেলাই হল। ফ্রান্সিসরা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। দেখল কোনার দিকে একটা কাঠের পীপে। শাঙ্কো পীপেটার কাছে গেল। দেখল পীপে ভর্তি জল। পাশে একটা কাঠের পাত্র। শাঙ্কো জল তুলে মুখ হাত ধুল। ফ্রান্সিসও নেমে এসে হাতমুখ ধুচ্ছে তখনই যুবকটি ঘরে ঢুকল। পেছনে কাজের লোকের হাতে একটা কাঠের থালা। তাতে খাবার রাখা। কাজের লোকটি খাবারের থালা বিছানায় রাখল। ফ্রান্সিসরা তখন ক্ষুধার্ত। তাড়াতাড়ি খেতে শুরু করল।

যুবকটি ঘরে ঢুকল। হেসে বলল—মা বলছিলেন—আপনারা আজকে এখানে থাকুন। ওরকম ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এসেছেন। আপনাদের কোনো কষ্ট হবে না।

—আমাদের থাকবার উপায় নেই। তবে পোশাক তো এখনও শুকোয়নি। ঐ পোশাকের জন্যেই আমাদের আজকের দিনটা থাকতে হবে।

—তাহলে মাকে বলে আসি আপনারা থাকবেন। যুবকটি চলে গেল।

সারাটা দিন ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে কাটালো। একটু বেলায় যুবকটির মেয়ে এল। ফ্রান্সিস মেয়েটির সঙ্গে কথাটথা বলল। ফ্রান্সিস ওদের মুক্তোর সমুদ্রের গল্প ছোট্ট করে বলল। মেয়েটি খুব খুশি। আরো গল্প শুনতে চাইল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো ওকে গল্প শোনাও। অগত্যা শাঙ্কো ওকে হীরের পাহাড়ের গল্প বলল।

রাতে খাওয়ার ডাক পড়ল। এই ঘরেই পাটাতনের ওপর ফ্রান্সিসদের খেতে দেওয়া হল। দুজনেই পেট পুরে খেল। আবার কখন খাবার জুটবে কে জানে।

রাতের খাওয়া খাচ্ছে। তখনই ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো পোশাক শুকিয়ে গেছে। কাজেই আর দেরি নয়।

রাতেই চলতে শুরু করবো। আর দেরি করা ঠিক হবে না।

ওরা খাচ্ছে তখনই যুবকটি এল। বলল—রান্না কেমন হয়েছে?

—খুব ভালো। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস বলল—বলছিলাম আমরা একটু পরেই বিশ্রাম নিয়ে চলে যাবো।

—আজ রাতটা থেকে গেলে হত না। যুবকটি বলল।

—আমরা নিরুপায়। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। কত যত্ন করে খাওয়ালেন শুতে দিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

—না না। এতো মানুষ হিসেবে আমাদের কর্তব্য।

খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল দুজনে। তারপর উঠে দাঁড়াল। বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। বড় রাস্তায় উঠল। দিক ঠিক করে নিয়ে হাঁটতে লাগল। রাত শেষ হল। ভোর হল। তখনও ওরা হেঁটে চলেছে।

বেশ বেলায় এক গ্রামে এল। গ্রাম মানে গোটা পাঁচ সাতটা কাঠ আর পাথরে গাঁথা বাড়ি ঘর। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো এখানেই খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ওরা একটা বাড়ির কাছে এল। দেখল দরজা বন্ধ। অন্য একটা বাড়ির দরজা দেখল হাট করে খোলা। ফ্রান্সিস বলল—এই বাড়ির লোকেরা অতিথিবৎসল। চলো এখানেই দেখি।

দুজনে খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। একটা অল্পবয়সী ছেলে তখনই বেরিয়ে এল। শাঙ্কো বলল—তোমার বাবা-মা কোথায়?

—ভেতরে।

—বাবাকে একটু ডেকে নিয়ে এসো।

—ছেলেটা বাবা বাবা বলে ডাকতে ডাকতে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

একটু পরেই একজন রোগামত লোক বেরিয়ে এল। খোলা দরজার কাছে এল। ফ্রান্সিসদের দিকে একবার তাকিয়ে বুঝল ওরা বিদেশি। ভদ্রলোক বললেন—আপনারা তো বিদেশি? আমার কাছে কিসের দরকার?

—আমরা খুব ক্ষুধার্ত আর পরিশ্রান্ত। আমাদের কিছু খেতে দিতে পারেন? শাঙ্কো বলল।

—নিশ্চয়ই। পারবো। আপনারা অতিথি। ঘরে আসুন।

ভদ্রলোকের পেছনে পেছনে ফ্রান্সিসরা গেল। একটা ছোট ঘরে ঢুকল সবাই। দুটো জানলা বন্ধ থাকায় ঘরটা অন্ধকার অন্ধকার লাগছিল। ভদ্রলোক দুটো জানলা খুলে দিল। দেখা গেল একটা কাঠের পাটাতনে ঘাসপাতার বিছানা। ভদ্রলোক বলল—এটা আমাদের অতিথি ঘর। আত্মীয়-স্বজন বা অতিথি এলে তাদের এই ঘরেই রাখা হয়। বসুন। বিশ্রাম করুন। জলটল খান। আপনাদের জন্যে খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। ভদ্রলোক চলে গেল।

দুইহাতে দুই গ্লাশ জল নিয়ে ছেলেটা এল। জল খেয়ে ফ্রান্সিস ওকে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। ছেলেটি কিভাবে পড়াশুনো চালায়। কখন পড়তে যায়, কখন আসে। যিনি পড়ান তিনি কোথায় থাকেন—এখানে বৃষ্টি কেমন হয়— ফ্রান্সিস এমনি সব প্রশ্ন করতে লাগল। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান। খুব দ্রুত সবকিছু প্রশ্নের জবাব দিল। ফ্রান্সিস খুব খুশি হল।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকল। হেসে বলল—কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। আপনাদের জন্যে রান্না চাপানো হয়েছে।

বাকি রাস্তা পার হয়ে দুজনে বাজারে এল।

দেখল তানাকাদের দোকান সামনে। দোকানের দরজা বন্ধ। শাঙ্কো কয়েকবার দরজায় শব্দ করল। কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই।

—চল। বোঝাই যাচ্ছে বার্বারকে যেদিন ধরে নিয়ে গেল সেদিন থেকেই এই দোকান বন্ধ। পরে এখানে আসতে হবে। এখন চল।

দুজনে চলল বাজার ছাড়িয়ে।

দিন কয়েক আগের ঘটনা। সান্তিয়াগোতে তানাকা আর আরোনাস মারামারি করছিল বলে ধরা পড়েছিল। দুজনকেই তানাকার কাছে সান্তিয়াগোর প্রহরীরা দুজনকে ছেড়ে দিয়েছিল। তানাকা রাজ্যে ঢুকতে দুজনকেই বন্দী করা হল। তানাকার প্রহরীরা দুজনকেই কয়েদঘরে ঢোকাল।

সেদিন রাতে তানাকার ঘুম আসছিল না। উঠে পড়ল। মশালের আলোয় আরোনাসকে দেখল।

ওদিকে সান্তিয়াগোর কারাগার থেকে আরোনাস ছাড়া পেল। যাবার সময় তানাকা আরোনাসের সামনে এল। বলল—তুমি আমার কাছ থেকে ছাড়া পাবে না।

—যা—যা। তুই আমার কী করবি? আরোনাস খেঁকিয়ে বলে উঠল।

—সেটা দেখবি। তানাকা বলল। তানাকা আর কিছু বলল না। তানাকাদের কয়েকজনকে তানাকার কয়েদঘরে পাঠানো হচ্ছিল। ঝড়বৃষ্টিতে তানাকা পালাল। পথে সঙ্গী হিসেবে ফ্রান্সিসদের পেল। দেশে ফিরে এল।

তার পরদিনই। বেশ রাত তখন। তানাকার ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে দরজায় লাথি মারছে কে? তানাকা বিছানা ছেড়ে উঠে দরজার কাছে এল। ভেতর থেকেই বলল—আপনারা কে?

—আমি আরোনাস। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—কী কথা?

—দরজা খোল—এভাবে কথা হয়?

—কাল সকালে এসো।

—তখন বড্ড দেরি হয়ে যাবে। দরজা খোল।

—তুমি কি একা?

—হ্যাঁ।

তানাকা দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচজন লোক তানাকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তানাকাকে ধরে বাড়ির বাইরে নিয়ে এল। একজন তানাকার মুখ চেপে ধরেছিল। তানাকা মুখে একটা শব্দও করতে পারে নি।

আরোনাসের দল তানাকাকে রাস্তা দিয়ে প্রায় টেনে নিয়ে চলল।

তানাকার মুখ থেকে চেপে ধরা হাতটা গুণ্ডাটা সরিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তানাকা চিৎকার করে উঠল। ঠিক মানুষের চিৎকারের মতো না। ভাঙা গলায় চিৎকার। আরোনাস ছুটে এল। চড়া গলায় বলল—আর একটা শব্দ করলে মেরে ফেলবো। আস্তে আস্তে চল্।

—আমাকে এভাবে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? তানাকা বলল। গলা ঠোঁটে ব্যথা করছে।

—আমাদের ডেরায় তোকে নিয়ে যাচ্ছি। আরোনাস বলল।

—ওখানে কী হবে?

—তোর বাবার অনেক হীরের অলংকার আছে—আস্ত হীরের খণ্ডও আছে— সেসব আমাদের চাই। আরোনাস বলল।

—ঠিক। একজন গুণ্ডা বলে উঠল।

—কিন্তু আমাকে মেরে ফেললে কি তা পাবে? তানাকা বলল।

—তোকে এখন মারবো না। যখন দরকার পড়বে তখন মারবো। আরোনাস বলল।

—এখন যখন মারছো না তখন আমায় বাড়ি যেতে দাও। তানাকা বলল।

—সেটি হবে না। এখন এখানেই থাকতে হবে। আরোনাস বলল।

—তাতে তোমাদের কী লাভ? তানাকা বলল।

—লাভ আছে বৈকি। হীরের খণ্ড হীরের অলংকার—এসব তো মিলবে।

—সে তো দোকানের মধ্যে। একেবারে বন্ধ লোহার সিন্দুকে।

সিন্দুক ভাঙার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আমার ঠাকুর্দার আমলে ওস্তাদ কামার পেলিলি তৈরি করে দিয়েছিল। কারো ক্ষমতা নেই চাবি ছাড়া অন্য কোনোভাবে সিন্দুক খুলবে।

—দেখা যাক। আরোনাস বলল।

তানাকাকে ওরা একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিল। এই দিনের বেলাও ঘর প্রায় অন্ধকার। জানালা কাঠ দিয়ে বন্ধ করা। একটা মাত্র দরজা তালা লাগানো। ঐ ঘরেই তানাকাকে আটকে রাখা হল। দরজায় তালা লাগিয়ে আরোনাস চলে গেল।

তানাকা মেঝেয় রাখা কাঠের পাটাতনে শুয়ে পড়ল। ভাবতে লাগল কী করে পালানো যায়।

আরোনাসও ওদের ঘরে বসে ভাবছিল কী করে বার্বারের কাছ থেকে চাবিটা আদায় করা যায়।

অনেক ভেবে তানাকা ঠিক করল বাবার কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে আসবে এটা বললে আরোনাসরা ওকে মুক্তি দেবে। চাবি আদায়ের জন্যে তানাকার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। কিন্তু ও কিছুতেই চাবি হাতছাড়া করবে না। ও পালিয়ে যাবে। মধ্যরাত পর্যন্ত এইসব ভাবতে ভাবতে তানাকা ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালের খাবার খেয়ে ও আরোনাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছু পরে আরোনাস ফিরল। তানাকা আরোনাসকে ডাকল। আরোনাস ওর কাছে এল।

—কী ব্যাপার? আরোনাস বলল।

—একটা কথা বলছিলাম।

—বলো। আরোনাস বলল।

—ভাবছি কয়েদঘরে গিয়ে বাবার খোঁজ করি। তানাকা বলল।

—খুব ভালো কথা। আরোনাস বলল।

—জিজ্ঞেস করে জেনে নেব বাবা কোথায় সিন্দুকের চাবিটা রেখেছেন। তানাকা বলল।

—বাঃ। এই তো বুদ্ধি খুলেছে। আরোনাস হেসে বলল।

—এই সকালেই যেতে হবে। এ সময়েই বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে দেয়। তানাকা বলল।

—হ্যাঁ জানি। আরোনাস একটু জোর গলায় ওর একজন বন্ধুকে ডাকল। বন্ধু এল।

—চল্—কয়েদখানায় যাবো। আরোনাস বলল।

—হঠাৎ? সঙ্গীটি বলল।

—দরকার আছে। আরোনাস বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন তৈরি হল।

কয়েদঘরের সামনে এল। সর্দার প্রহরীর কাছে এল। তানাকা বলল—একটা কথা ছিল।

—বলো। সর্দার প্রহরী গোঁফ মুচড়ে বলল। সর্দার প্রহরী বলল—

—আমার বাবা। হীরের গয়না গড়াতে বাবার সমকক্ষ কেউ নেই। তানাকা বলল।

—আচ্ছা। সর্দার প্রহরী বলল।

—বাবাকে মাননীয় রাজা সাজা দিয়েছেন। বাবা এই কয়েদখানায় বন্দী হয়ে আছেন। আমি বাবার সঙ্গে একটা জরুরী বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই। এখন আপনি যদি অনুমতি দেন। সর্দার প্রহরী বলল—খুব দরকার?

—হ্যাঁ। তানাকা বলল।

—ঠিক আছে। আধ চাকতি সোনা। তোমার বাবার তো সোনা হীরে নিয়ে কারবার।

—হ্যাঁ। একটু থেমে তানাকা বলল—আমার কাছে তো এখন কিছু নেই। এই সোনার আংটিটা নিন।

—ঠিক আছে। তাই দাও। সর্দার বলল।

তানাকা আঙুল থেকে আংটি খুলে দিল। সর্দার প্রহরী একবার দেখে নিয়ে আঙুলে পরল। তারপর একজন পাহারাদারকে ইঙ্গিতে ডাকল। পাহারাদারটি এগিয়ে এল। সর্দার বলল—কয়েদীর নামটা যেন কী?

—বার্বার। তানাকা বলল।

—হ্যাঁ। বার্বারকে বারান্দায় নিয়ে আয়। সর্দার প্রহরী বলল।

পাহারাদার চলে গেল। একটু পরে বার্বার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সেনাপতি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বার্বারকে বলল—তুমি কেমন আছো বাবা?

—ঐ চলছে আর কি। বার্বার বলল।

—তুমি কবে ছাড়া পাবে? তানাকা বলল।

—কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কবে রাণির আমার ওপর রাগ কমবে। ততদিন মুক্তির কোন আশা নেই। বার্বার বললেন। একটু থেমে তানাকা বলল—একটা দরকারি কথা বলছিলাম।

—বল্। বার্বার বললেন।

—তোমার সিন্দুকের চাবিটা যদি দাও। তানাকা বলল।

—তুই চাবি নিয়ে কী করবি? বার্বার জানতে চাইল।

—সিন্দুক কতদিন পাহারা দেব। তানাকা বলল।

আরোনাসদের দেখিয়ে বার্বার বললেন—এরা কারা?

—আমার বন্ধু। তানাকা বলল।

—ও। যাক্ তো—চাবি দেব না। বার্বার বলল।

—তাহলে কোনদিন আস্ত সিন্দুকটাই চুরি হয়ে যাবে। সিন্দুক ভেঙে সব হীরের খণ্ড, হীরের অলংকার আছে সব চুরি হয়ে যাবে। তানাকা বলল।

বার্বার একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর তানাকার ডান হাতটা ধরলেন। ছেড়ে দিলেন। বললেন—আমি এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তানাকা বুঝল—বাবা চাবিটা ওর হাতে দিয়েছেন। এ জায়গায় বেশ অন্ধকার। আরোনাসরা কিছুই বুঝতে পারল না। বার্বার চলে গেল।

ওরা চলে আসছে তখনই আরোনাস বলল—তাহলে তোমার বাবা সিন্দুকের চাবিটা দেবে না।

—তাই তো বলছেন। তানাকা বলল।

—তাহলে সিন্দুকটা ভাঙতে হবে। আরোনাস বলল।

—শেষ পর্যন্ত তাই করতে হবে। তানাকা বলল।

অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে তানাকা চাবিটা কোমরের ফেট্টিতে গুঁজে নিল। ভাবল বাবা ভালো করেই জানেন আমি হীরের খণ্ড হয়তো একটা পাবো। আর হীরের অলংকার? বাবা বেশ চিন্তা করেই আরোনাসদের সামনে চাবিটা দিলেন না। ওদের দেখে বাবার ভালো লাগে নি।

তিনজনে আস্তানায় ফিরে এল। কাঠের পাটাতনে বসতে বসতে তানাকা ডাকল—আরোনাস?

—বল্।

—আমি তোমাদের বাবার কাছে নিয়ে গেছি। আমি এর বেশি আর কি করতে পারি। তানাকা বলল।

—হুঁ। আরোনাস মুখে শব্দ করল।

—তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও। তানাকা বলল।

—এবার সিন্দুকটা ভাঙবার চেষ্টা করতে হবে। আরোনাস বলল।

—তাই করো। কিন্তু আমাকে মুক্তি দাও। তানাকা বলল।

—তাই ভাবছি। আরোনাস বলল।

—তুমি তো একটা হীরের খণ্ড পেয়েছো মানে চুরি করেছো। তানাকা বলল।

—ভালো করেছি। আরোনাস বলল।

—ঠিক। তুমি যে একটা হাতকাটা চোর সেটা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমাকে দোকান খুলে ব্যবসা চালিয়ে যেতে হবে। তানাকা বলল।

—বেশ। তুই যা। আরোনাস বলল।

তানাকা ঘর থেকে বাইরে এল। ও প্রায় দৌড়ে চলল।

বাড়ি এসে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিল। মার গলা শুনল—আসছি। মা দরজা খুলতে তানাকা বাড়িতে ঢুকল। মা বলল—

—এই ক'দিন কোথায় ছিলি?

—এক বন্ধুর বাড়িতে। তানাকা বলল।

—আমাদের একটা খবর দিবি তো। মা বলল।

তানাকা কিছু বলল না। নিজের ঘরটায় ঢুকল।

সেদিন ফ্রান্সিস শাঙ্কো বাজারে কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিল। বাজারের কাছে হঠাৎ তানাকার সঙ্গে দেখা। ফ্রান্সিস বলল—তানাকা কোথায় গিয়েছিলে?

—সে অনেক কথা। তানাকা বলল।

—বলো তো শুনি। ফ্রান্সিস বলল।

তানাকা সংক্ষেপে ওর কথা বলল।

—তাহলে তোমার বাবা তোমাকে সিন্দুকের চাবি দেয়নি। ফ্রান্সিস বলল।

তানাকা একটু চুপ করে থেকে বলল—তোমাদের সত্যি কথাটা বলবো?

—বলো। তোমার যদি আপত্তি না থাকে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তানাকা বলল—আমার বন্ধুদের কাছ থেকে লুকিয়ে বাবা আমাকে চাবিটা দিয়েছে।

—তাহলে তোমার সমস্যা তো মিটে গেল। সিন্দুক খুলেছিলে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। কিছু হীরের গয়নাগাঁটি পেয়েছি।

—হীরের খণ্ড পাও নি? ফ্রান্সিস বলল।

—না। অবশ্য আমার এক চোর বন্ধু আরোনাস হীরের খণ্ড চুরি করেছিল।

ফ্রান্সিস বলল—তানাকা তোমাদের দোকানে চল। তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে।

—বেশ। আমাদের দোকানে চলুন। তানাকা বলল।

তিনজনে তানাকাদের দোকানে এল। তানাকা তালাটালা খুলল। দরজা খুলল। দুটো জানালাও খুলল। এবার দোকানের ভেতরটা ভালোই দেখা যাচ্ছে। দোকানে মাঝখানে চটের মতো মোটা কাপড় পাতা।

ফ্রান্সিসরা বসল। ফ্রান্সিস লোহার সিন্দুকটার দিকে দেখল। বেশ শক্ত সিন্দুক। সম্পূর্ণ লোহার। কাজেই বেশ ভারি।

ফ্রান্সিস বলল—তানাকা কিছু মনে করো না। তোমার বাবা সৎ মানুষ নন। আমরা ধারে কাছের সব রাজবাড়িতে খোঁজখবর নিয়েছি।

তানাকা বেশ মনক্ষুণ্ণ হল। বলল—ফ্রান্সিস আপনি বাবাকে চোর বলছেন।

—ঠিক চোর বলছি না। বলতে পারি ঠগ। প্রতারক। তবে যাদের জন্য গয়না গড়িয়েছিলেন তাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর আমরা নিয়েছি। প্রত্যেক রানী, রাজকুমারীরা একটা কথা বলেছেন, বার্বারকে তারা যে হীরের খণ্ড দিয়েছেন তাদের সবাইকেই বলেছেন—হীরের খণ্ড হারিয়ে গেছে বা চুরি হয়েছে। আমার

প্রশ্ন দু-একটা ক্ষেত্রে হয়তো হারিয়ে যেতে পারে বা চুরি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এরকম হবে কেন? একটু রাগতস্বরে তানাকা বলল—

—বেশ ধরে নিলাম বাবা হীরকখণ্ড চুরি করেছেন। তাহলে হীরের খণ্ডগুলো যাবে কোথায়?

—তোমাদের বাড়িতে এই দোকানে খোঁজ করলেই ঐ হীরকখণ্ডগুলোর হদিশ মিলবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো বাড়ি আর দোকান ভাল করে দেখতে হয়। তানাকা বলল।

—তাই করতে হবে। কিছু একটা হদিশ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে সিন্দুকটা খুলি। তানাকা বলল।

ফ্রান্সিস বলল—খোল। আমরা দেখবো।

তানাকা উঠে দাঁড়াল। সিন্দুকটার কাছে গেল। কোমরে গোঁজা চাবিটা বের করল। সিন্দুক খুলল। ফ্রান্সিস শাঙ্কো এগিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস সিন্দুকটার সামনে উবু হয়ে বসল। এক নজরে সবকিছু দেখল।

—সিন্দুকে রাখা হীরের গয়নাগুলো তুমি নিয়ে গেছ। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। তানাকা বলল।

—হীরের খণ্ড পাও নি? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না। তবে কাচের ডেলা পেয়েছি। আমার এক চোর বন্ধু আরোনাস কাচের ডেলা রেখে হীরের খণ্ড চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। তানাকা বলল।

—বুঝলাম। ফ্রান্সিস বলল। তারপরে সিন্দুকের মধ্যে হাত বাড়িয়ে হাত দিয়ে দুপাশে দেখল।

—বুঝলেন তো। আমার বাবা চোর নয়। তানাকা বলল।

—আমি এখনো বলছি তোমার বাবা সৎপথে অর্থ আয় করেন নি। কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস খোলা সিন্দুকের মধ্যে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে সব দিক দেখল কিছুই নেই।

ফ্রান্সিস এবার উঠে সিন্দুকের পিছনে গেল। সিন্দুকের পিছনে টানা লোহার মোটা পাত। ফ্রান্সিস ফিরে আসছে তখনই ভাবল—ভেতরে কোনো গোপন জায়গা থাকতে পারে।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল—একটা হাত পাঁচেকের দড়ি আনো। শাঙ্কো তানাকার কাছ থেকে দড়ি নিয়ে এল। ফ্রান্সিস সিন্দুকটা বাইরে থেকে মাপল। তারপর সিন্দুকের মধ্যে ঐভাবে মাপল। দেখল আঙুল পাঁচেক কম। ফ্রান্সিস চট করে উঠে দাঁড়াল।

তানাকা বলল—দেখলেন? সব ঠিক আছে।

—না। ঠিক নেই। সিন্দুকের মধ্যে একটা চোরা কুঠুরিও আছে।

—কোথায় চোরা কুঠুরি। সব বাজে কথা। তানাকা বলল।

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর সিন্দুকের মধ্যে আবার মুখ ঢুকিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ দেখল—পেছনে লোহার পাতে একটা ছিদ্র। ফ্রান্সিস ছিদ্রটায় আঙুল ঢোকাল। তারপর হ্যাঁচকা টান দিল। সিন্দুকের পেছনের মাঝামাঝি লোহার পাত সরে গেল।

মাথাটা একবার বের করে বলল—তানাকা আমি মিথ্যে দোষারোপ করিনি। এই দেখ। ফ্রান্সিস আবার সিন্দুক থেকে মাথা বের করল। লোহার পাতটা পকেটের মত লাগানো। ফ্রান্সিস তাতে হাত ঢোকালো—একটা হীরের খণ্ড পেল। বার করল। তানাকা বলল—আশ্চর্য। বাবা তো আমায় কখনো এই খাপের কথা বলেনি।

ফ্রান্সিস পরপর পাঁচটি হীরের খণ্ড বের করল। তানাকা হীরের খণ্ড নিতে হাত বাড়াল। ফ্রান্সিস ওকে সরিয়ে দিল। এই হীরের খণ্ডগুলোর মালিক যারা তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

—বেশ। আমিই ফিরিয়ে দেব। তানাকা বলল।

—তুমি এই মূল্যবান হীরে ফিরিয়ে দেবে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ। আমি কথা দিচ্ছি। শুধু এই ব্যাপারটা যেন পাঁচকান না হয়। পাগলা রাজা আরকানিয়ার কানে গেলে হীরের খণ্ডগুলো তো যাবেই আর চুরি করার জন্যে বাবাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। তানাকা বলল।

কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—কী করবো?

—এই হীরের খণ্ডগুলো আমরা নেবো না। তানাকার বাবা এইগুলো মিথ্যে কথা বলে চুরি করেছে। এইগুলো তো চোরাই সম্পত্তি। চোরাই সম্পত্তি হলেও এগুলো তানাকারই প্রাপ্য। ওকেই দাও। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে তানাকা তোমাকেই দিলাম। মাত্র একটা হীরের খণ্ড রেখে বাকিগুলো যার যার প্রাপ্য দিয়ে দেবে। কথা দাও।

—আমি একটা খণ্ডের জায়গায় দুটো খণ্ড চাইছি।

—বেশ তাই নাও। তোমার কথার খেলাপ হয় না যেন। ফ্রান্সিস বলল।

—না না। যীশুর দিব্যি—আপনারা যে নির্দেশ দিয়েছেন আমি তাই করবো। তানাকা বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো দোকানের বাইরে এল। তানাকা দোকান থেকে একটা চামড়ার বস্তায় হীরেগুলো রাখল। সিন্দুক বন্ধ করল। বাইরে এল। ফ্রান্সিসকে বলল। আপনারা আমার বাবাকে প্রাণে বাঁচালেন।

—তবে তোমার বাবা কিন্তু সৎ ছিলেন না। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস এবার জাহাজে যেতে হবে। একটু দ্রুত হাঁটতে হবে।

দুজনে বেশ দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। পথেই বিস্কো আর অন্য বন্ধুরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে দেখল। বিস্কো ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। বন্ধুরা ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

—তোমাদের খুঁজতে রাজবাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কয়েকদিন ধরেই আমরা তোমাদের খুঁজতে এসেছি। বিস্কো বলল।

—মারিয়া খুব রেগে গেছে—তাই না? ফ্রান্সিস বলল।

—রাজকুমারী তো মনের ভাব বেশি প্রকাশই করেন না। তবে আমরা কেউ কেউ দেখেছি—রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। বিস্কো বলল।

—আমি ফিরে এসেছি এটা দেখেই মারিয়া শান্ত হবে। চলো সব। ফ্রান্সিস বলল।

জাহাজ থেকে ফ্রান্সিসদের দেখতে পেয়ে বন্ধুরা জাহাজ থেকে ধ্বনি তুলল— ও—হো—হো।

ফ্রান্সিসরা জাহাজে উঠল। মারিয়া বিরসমুখে ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এবার দেশে ফের।

ফ্রান্সিস হেসে উঠল। বলল—কী হবে দেশে ফিরে। এই তো বেশ দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—না। আমি দেশে ফিরবো।

—ঠিক আছে। দেখা যাক।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে নিয়ে নিজেদের কেবিনঘরের দিকে চলল। বন্ধুরা কেউ কেউ ডেক-এ বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল।

—ঃ—